ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

# সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন

১

অনুবাদ: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

# সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন

## صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ

### প্রথম খণ্ড

تاليف: الدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا

نقله إلى اللغة البنغالية: محمد عبد المنعم

# সম্মানিত লেখকের দু'আ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ صَحَابَةَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْدَعَهُ الْحُبِّ وَأَعْمَقَهُ فَهَبْنِيْ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ لِأَيٍّ مِنْهُمْ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّيْ مَا أَحْبَبْتُهُمْ إِلَّا فِيْكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

'হে পরম দয়ালু ও করুণাময় আল্লাহ! আমি তোমার প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের অকৃত্রিমভাবে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালোবাসি। তুমি ভালো করেই জানো, তাঁদের প্রতি আমার এ ভালোবাসা শুধুমাত্র তোমারই নিমিত্তে। তাই কিয়ামতের সেই ভয়ঙ্কর দিনে আমাকে তাঁদের যে কোনো একজনের সাথে হাশর নসীব করো।'

ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা

# সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন

## প্রথম খণ্ড

মূল: ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা
অনুবাদ: মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম
সম্পাদনা: মাওলানা মুজাম্মিল হক

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড
www.kamiubprokashon.com

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৯

সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন (প্রথম খণ্ড) ❖ মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম ❖ প্রকাশক: মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, ৫১, ৫১/১ পুরানা পল্টন (৮ম তলা), ঢাকা ১০০০। ফোন ০৪৪৯৫০১২৪৩৮, ০১৭১১৫২৯২৬৬ ❖ © অনুবাদকের ❖ প্রচ্ছদ: হামিদুল ইসলাম ❖ মুদ্রণ: পি এ প্রিন্টার্স, ঢাকা।

SAHABIDER BIPLOBI JIBON (V0l-1) by Dr. Abdur Rahman Rafat Pasha, Translated by Mohammad Abdul Monyem, Edited by Maulana Mojammel Haque, Published by Kamiub Prokashon Ltd. 51, 51/1 Purana Paltan, Dhaka. Phone 04495012438, 01711529266.
e-mail: info@kamiubprokashon.com, kamiubbd@yahoo.com

বিক্রয়কেন্দ্র

৫১, ৫১/১ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৭
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৮
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৯
কাঁটাবন মসজিদ মার্কেট, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০১০

নির্ধারিত মূল্য : একশত চল্লিশ টাকা মাত্র

# প্রকাশকের কথা

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরেবাণীতে 'সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন' বইখানা প্রকাশিত হলো। এ মূল্যবান গ্রন্থটি আরবী ভাষায় সাত খণ্ডে প্রকাশিত হলেও বাংলা অনুবাদ দু খণ্ডে সমাপ্ত করা হয়েছে।

এটি সাধারণ নিয়মে রচিত সাহাবীদের কোনো জীবনীগ্রন্থ নয়; এতে আটান্নজন সাহাবীর (রা) ঈমানের উপর ইস্পাতকঠিন দৃঢ়তা, কর্মে ত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, রাসূলের (স) প্রতি মহব্বতের পরম পরাকাষ্ঠা, আনুগত্যের অনুপম নিদর্শন, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সুমহান আদর্শসহ জীবনের এমনসব চমকপ্রদ স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে, যা একজন পাঠকের ঈমানী চেতনাকে উজ্জীবিত করবে।

এ গ্রন্থের অনুবাদকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন, পরম শ্রদ্ধাভাজন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, ভাষাসৈনিক, মুহতারাম অধ্যাপক গোলাম আযম। অনুবাদক শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম এ বইটির শুধু অনুবাদই করেননি; জটিল রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বই প্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কাজ তিনি নিজেই আঞ্জাম দিয়েছিলেন। কম্পিউটারের বড় পর্দায় শব্দে শব্দে প্রুফ দেখেছেন, সম্পাদনা করেছেন। এমনকি কিছু অংশ প্রকাশও করেছিলেন। তবে নিজের এত বড় খিদমতের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখে যেতে পারেননি। তিনি ২ আগস্ট ২০০৬ তারিখে ইন্তিকাল করেন। মুমূর্ষু অবস্থায় হাসপাতালে দেখতে গেলে আমার সামনে তিনি তাঁর সহধর্মিণীকে পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন, 'এ বই কামিয়াব প্রকাশন থেকেই বের হবে।' আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বইখানা দু খণ্ডে বিন্যাসের সুবিধার্থে প্রথম খণ্ডের শেষাংশে ও দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুর দিকে কয়েকজন সাহাবীর আলোচনা আগে-পরে করা হয়েছে। বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্রেও আমরা কিছু বিষয় সংযোজন করেছি।

আমার বেশ কয়েকজন ঘনিষ্ঠ শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি বইখানা প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে উৎসাহিত করেছেন এবং তাগিদ দিয়েছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও সংগঠক জনাব মকবুল আহমদ, ইসলামী ব্যাংক-এর ডিরেক্টর প্রফেসর মুহাম্মদ নজরুল ইসলাম এবং জনাব নাজমুল হক। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বইখানা ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর ঐসব প্রিয় বান্দার সুমহান আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার তাওফীক দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন

# অনুবাদকের কথা

সাহাবীদের জীবনীর ওপর লিখিত মিসরের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আবদুর রহমান রা'ফাত পাশা'র صُوَرٌ مِّنْ حَيَاةِ الصَّحَابَةِ বইটি আরব দেশসমূহের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। সৌদি আরবসহ অন্যান্য আরব দেশ এ বইটি তাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত করেছে। বইখানা ইতোমধ্যেই আরবী ভাষা-ভাষীদের চাহিদা পূরণ করে বিশ্বের অনেক ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে।

বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের খেদমতে বইখানা পেশ করার জন্য ১৯৯২ সালে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ড. আহমদ তুতুনজীর উদ্যোগে অনুবাদে হাত দেই। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এর ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়।

নানাবিধ প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তা আমার অনুবাদ কাজে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। প্রতিকূলতার এ ঝড়-ঝাপটা উপেক্ষা করেই এর অনুবাদ অব্যাহত রাখি। আল্লাহর মেহেরবানীতে ২০০০ সালের রমযান মাসে অবশিষ্ট ছয় খণ্ডের অনুবাদই সমাপ্ত হয়। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ, পর্যালোচনা ও অন্যান্য খণ্ডের সম্পাদনা, কম্পোজসহ আনুষঙ্গিক কাজগুলোর পর্যায় অতিক্রম করার পূর্বেই আমি অসুস্থ হয়ে লেখাপড়া করার অযোগ্য হয়ে পড়ি। যে কারণে দেড় বছরকাল এর পাণ্ডুলিপিগুলো পড়ে থাকে।

আল্লাহর রহমতে একটু আরোগ্য লাভ করলে পুনরায় এ কাজে আত্মনিয়োগ করি। আমার এ কাজে সহযোগিতা করার লক্ষে শ্রদ্ধেয় বড় ভাই প্রখ্যাত কলামিস্ট সালেহ উদ্দীন আহমদ জহুরী নিঃস্বার্থভাবে আমার পাণ্ডুলিপিগুলো দেখে দেন। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষক অধ্যক্ষ মাওলানা মুহাম্মদ মুজাম্মিল হক তাঁর গবেষণা ও অন্যান্য সম্পাদনার কাজ ফেলে রেখে দ্রুত বইখানার তরজমা মিলিয়ে দেখেন এবং তা সম্পাদনা করে আমাকে চিরকৃতজ্ঞতায় আবদ্ধ করেন।

রিয়াদের ইমাম মুহাম্মদ বিন সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রফেসর, সুসাহিত্যিক ড. আব্দুর রহমান রা'ফাত পাশার এই বইখানা আরব বিশ্বের কিশোর-কিশোরী, ছাত্র-ছাত্রীদের ইসলামী জীবন গঠনে সহায়ক একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। একইভাবে ওলামা-মাশায়েখ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের পাঠক-পাঠিকাদের নিকটও বইটি বিশেষভাবে সমাদৃত। কলুষিত ও ব্যাধিগ্রস্ত ঘুণে ধরা সেই জাহেলী সমাজের আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ জাতিকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে তুলে কীভাবে কলুষমুক্ত পরশ পাথরে পরিণত করা হয়েছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত

ফুটে উঠেছে 'সাহাবীদের বিপ্লবী জীবন'-এ। বইটি একেকজন সাহাবীর জীবনের একেক ধরনের স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত।

লেখক অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের আরবী ভাষায় আটান্ন জন সাহাবীর জীবনী সম্বলিত এ বইটি সাত খণ্ডে সমাপ্ত করেন। আরবী ভাষার গভীরতা, মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও ভাবের সমন্বয়কে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করার জন্য বইটির হুবহু অনুবাদের আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও শাব্দিক অর্থের সীমারেখা পেরিয়ে ভাবার্থের আশ্রয়ও নিতে হয়েছে। কিছু সংখ্যক সাহাবীর ইসলামপূর্ব বিদ্রোহী জীবনীর সাথে পরবর্তী ইসলামী জীবনের তুলনামূলক চিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁদেরকে লেখক যেভাবে সম্বোধন করেছেন, অনুবাদেও সেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথেই তাঁদেরকে রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু বলে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সহৃদয় পাঠকবৃন্দের নজরে যদি অনুবাদ সংক্রান্ত কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তা আমাদেরকে অবগত করালে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের আন্তরিক চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে, যে কথাটি উল্লেখ না করলেই নয় তা হলো, ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করা মাত্রই প্রতিটি নর-নারীর দৃষ্টি রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সেই সোনালী সমাজের প্রতি নিবদ্ধ হয়। এ বইয়ে উল্লিখিত আটান্নজন সাহাবীই রাসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বর্ণযুগের সদস্য। যাঁদেরকে তিনি শারীরিক ও মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক, ঈমানী এবং জিহাদী চিন্তা-চেতনায় বলীয়ান করে সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠাকরত সর্বযুগের মানুষের জন্য অনুকরণযোগ্য করে গড়ে তুলেছিলেন।

সারা পৃথিবীতেই আজ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম দানা বেঁধে উঠেছে। এ পথের সংগ্রামী প্রতিটি তরুণ-তরুণী, এমনকি ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যও সাহাবীদের জীবনী ও চিন্তা-চেতনার অনুকরণ একান্ত আবশ্যক। ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্য আদর্শ কর্মী বাহিনী তৈরির কাজে যদি আমার এ পরিশ্রম সামান্যতম কাজেও আসে তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করব।

আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর প্রিয় নবীর সাহাবীদের মত জীবন যাপন করার তাওফীক দিন এবং তাদের সাথেই আমাদের হাশর নসীব করুন। আমীন!

৫ রবিউস সান, ১৪২৪ হিজরী
৬ জুন, ২০০৩ ঈসায়ী

মোহাম্মদ আব্দুল মোনয়েম

## সূচিপত্র

# বিষয়ভিত্তিক সূচিপত্র

(বর্ণক্রমিক বিন্যাস)

# সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী (রা)

*'সাঈদ ইবনে আমের এমন মহান ব্যক্তি, যিনি দুনিয়ার বিনিময়ে আখেরাত ক্রয় করে নিয়েছেন। সমস্ত লোভ-লালসা এবং অন্য সবকিছুর চাইতে তিনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।'*

*- ঐতিহাসিকদের মন্তব্য*

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্যতম সাহাবী খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মক্কার কুরাইশ নেতারা বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে বন্দী করে তানঈম নামক স্থানে নিয়ে গিয়ে অত্যন্ত নির্মম ও অমানুষিক অত্যাচারের মাধ্যমে হত্যা করে। সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী ছিল মক্কার সেইসব যুবকদের অন্যতম, যারা কুরাইশ নেতাদের আহবানে এই নির্মম ফাঁসির দৃশ্য দেখতে গিয়েছিল। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েও তাঁকে ইসলাম থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। পরিশেষে তারা তাঁকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে নির্মমভাবে হত্যার মাধ্যমে বদর যুদ্ধের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তারুণ্যে উচ্ছল সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী নারী পুরুষদের প্রচণ্ড ভিড় ঠেলে আবু সুফিয়ান ও সাফওয়ান ইবনে উমাইরের মতো কুরাইশ নেতৃবৃন্দের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়। খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের দৃশ্য ছিল অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও মর্মস্পর্শী। খুবাইব রাদিয়াল্লাহু

তাআলা আনহুর হাত পা শিকলে বেঁধে ফাঁসির মঞ্চের দিকে অগ্রসর হওয়ার কালে মক্কার নারী-পুরুষ, শিশু ও যুবকের দল তাঁকে ধাক্কা দিতে দিতে ফাঁসির মঞ্চে নিয়ে যেতে থাকে। উপস্থিত নির্মম জনতা করতালি দিয়ে এ হত্যাকাণ্ডে উৎসাহ দিচ্ছিল। সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী একটি উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে এ নির্মম দৃশ্য দেখছিল। নির্মম কুরাইশরা আজ এ হত্যার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাদের সীমাহীন হিংসা-জিঘাংসা চরিতার্থ করছে এবং বদরের যুদ্ধে তাদের নিহতদের হত্যার প্রতিশোধ নিচ্ছে।

ইতোমধ্যেই তারা খুবাইব ইবনে আদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফাঁসির মঞ্চে উপস্থিত করেছে। কাফিরদের জিঘাংসার মন খুবাইবের খুনের নেশায় উন্মাদ হয়ে উঠল। চারদিকে কাফিররা তুমুল হর্ষধ্বনি দিয়ে হিংস্র ও বর্বর উল্লাসে ফেটে পড়ল। আল্লাহর রাহে নিবেদিত, মযবুত ঈমানী চেতনায় বলীয়ান খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যাওয়ার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কাফিরদের এ নির্মম নির্যাতনে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। প্রচণ্ড শোরগোলের মাঝে হঠাৎ সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী শুনল যে, খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কণ্ঠ থেকে একটি শান্ত ও ধীরস্থির, খোদায়ী শক্তিতে বলীয়ান এক তেজোদীপ্ত আওয়ায বের হলো :

اِنْ شِئْتُمْ اَنْ تَتْرُكُوْنِىْ اَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ مَصْرَعِىْ فَافْعَلُوْا ...

'তোমরা অনুমতি দিলে ফাঁসি দেওয়ার আগে আমি দু'রাকাআত নফল নামায আদায় করতে চাই।'

সাঈদ এ আওয়াজ শোনামাত্রই প্রবল আগ্রহে ফাঁসির মঞ্চের দিকে তাকাল এবং দেখতে পেল খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কিবলামুখী হয়ে দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কী সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক তাঁর সেই নামায! ধীর স্থিরভাবে স্বল্প পরিসরে তিনি দু'রাকায়াত নামায আদায় করে উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

وَاللّٰهِ لَوْلَا اَنْ تَظُنُّوْا اَنِّىْ اَطَلْتُ الصَّلٰوةَ جَزَعًا مِنَ الْمَوْتِ
لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الصَّلٰوةِ ...

'আল্লাহর শপথ! আমি মৃত্যুর ভয়ে নামায দীর্ঘায়িত করছি, তোমরা এ ধারণা করবে বলে মনে না হলে আমি আমার নামায আরো দীর্ঘ করে পড়তাম।'

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই দীপ্ত ঘোষণার পরই কালবিলম্ব না করে মক্কার কাফিরেরা তাঁর ওপর আবার সেই পৈশাচিক ও অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে দিল। মানুষতো দূরের কথা, একটি নির্বোধ পশুকেও কোনো নির্মম পাষণ্ড জীবিত অবস্থায় তার দেহ থেকে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একের পর এক কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করার মতো নির্মমতা প্রদর্শন করতে সাহস পাবে না। অথচ তৎকালীন মানুষরূপী সেই ইসলামের দুশমনরা জীবিত অবস্থায়ই খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরীর থেকে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো একের পর এক কেটে কেটে বিচ্ছিন্ন করতে থাকে আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে বলতে থাকে :

'তুমি কি রাজি আছো? যদি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমারই উপস্থিতিতে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি?'

রাসূলপ্রেমিক খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শরীর থেকে তখন ভীষণভাবে রক্তপাত হচ্ছিল; কিন্তু শত পৈশাচিক নির্যাতন ও নিপীড়ন সত্ত্বেও আল্লাহর নির্ভীক সৈনিক, রাসূলপ্রেমিক মর্দে মুজাহিদ খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলিষ্ঠ ঈমানী দীপ্ত চেতনায় অনড় এবং অটল। তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উত্তর দিলেন :

'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার বিনিময়ে আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট নিরাপদে ফিরে যাওয়া তো দূরের কথা, পথে হেঁটে যেতে তাঁর পায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক তাও আমি সহ্য করতে পারব না। মুনাফিকী জীবন থেকে শহীদি মৃত্যু আমার কাছে অনেক উত্তম।'

তাঁর এই ঈমানী চেতনাদীপ্ত দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শুনে আগুনে ঘৃতাহুতি দিলে যেমন হয় তেমনি উচ্ছৃংখল কাফিরেরা ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠল এবং চিৎকার করে বলতে শুরু করল :

'তাকে হত্যা করো, তাকে হত্যা করো।'

সাথে সাথে ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডায়মান জান্নাতের পথযাত্রী খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপরে হিংস্র হায়েনার মতো সদলবলে ঝাঁপিয়ে পড়ল কাফিররা। তীর, বর্শা আর খঞ্জরের আঘাতে তারা তাঁর গোটা দেহকেও ক্ষত-বিক্ষত করে ফেলল। এদিকে আল্লাহর পথের যাত্রী খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আকাশের দিকে

তাঁকিয়ে দৃপ্ত কণ্ঠে কালেমায়ে শাহাদাত উচ্চারণ করছেন এবং ফাঁকে ফাঁকে বলছেন :

'হে আল্লাহ! তুমি এদের দেখে রেখো, এদের শক্তি ও প্রতিপত্তিকে ধ্বংস করে দাও, কাউকে ক্ষমা করো না। এক এক করে এদের সবাইকে শেষ করো।'

এ কথাগুলো বলতে বলতে তিনি শাহাদাতের পাক-পেয়ালা পান করে মহান প্রভুর দরবারে চলে গেলেন।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমানী চেতনা, আল্লাহর প্রতি তাঁর দৃঢ় মনোবল, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি প্রাণাধিক ভালোবাসা এবং শাহাদাতের এই নির্মম দৃশ্য কাফিরদের পাষাণ হৃদয়ে কোনো রেখাপাত করেনি; বরং তারা আত্ম-অহংকার ও খোদাদ্রোহিতার পথেই ইসলামের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করার জন্য অন্ধভাবে অপচেষ্টা চালাচ্ছিল। কিন্তু খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের নির্মম দৃশ্য যুবক সাঈদের অন্তরে অত্যন্ত গভীরভাবে রেখাপাত করে। মুহূর্তের জন্যেও সে তা ভুলতে পারেনি। সে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নে এবং জাগ্রত অবস্থায় কল্পনার চোখে তাঁকে দেখতে থাকে। সে যেন দেখতে পায় তার সামনে দাঁড়িয়ে ধীর ও প্রশান্তচিত্তে ফাঁসিকাষ্ঠের সামনে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দু'রাকাআত নামায আদায় করছেন। কুরাইশদের বিরুদ্ধে যে বদদো'আ তিনি করেছিলেন তা যেন তার কর্ণকুহরে ভেসে আসছে। তার মনে হতো যেন আসমান থেকে কোনো বিকট বজ্রধ্বনি কিংবা প্রকাণ্ড পাথর তার ওপর নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাই সে মাঝে মাঝে ভয়ে আঁৎকে উঠত।

খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের ঘটনা সাঈদের হৃদয়ে এমন একটি বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল, যা ইতঃপূর্বে সে কখনো অনুভব করেনি। সে বুঝতে পেরেছিল, যেন শাহাদাত বরণের মাধ্যমে তিনি সাঈদকে এ শিক্ষাই দিয়ে গেলেন যে, জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অগাধ প্রেম ও ভালোবাসাই হলো মু'মিন জীবনের প্রকৃত সার্থকতা। সে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কুরবানী থেকে এটাই বুঝতে পারল যে, মযবুত ঈমানী চেতনাই মু'মিন জীবনে অলৌকিক ও আশ্চর্যজনক ঘটনা সংঘটিত করতে সক্ষম করে তোলে। তার অন্তর বার বার এও সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, যাঁর অনুসারীগণ নিজেদের জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিয়েও তাঁদের নবীকে ভালোবাসে, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যিকার রাসূল না হয়ে পারেন না।

সাঈদের হৃদয়ে যখন এসব চিন্তা বিপ্লবী ঝড় সৃষ্টি করেছিল তখন আল্লাহ্ তাকে ইসলামের জন্য কবুল করলেন। সাঈদ মুশরিকী জিন্দেগীতে আর এক মুহূর্তও অতিবাহিত করা পছন্দ করল না। সাথে সাথে ছুটে গেল কুরাইশদের অনুষ্ঠানে। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে সে মানুষের হাতে গড়া মূর্তি, দেবতা আর কুরাইশদের পৌত্তলিকতার সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা করে ইসলাম কবুলের কথা দৃপ্তকণ্ঠে জানিয়ে দিল।

ইসলাম গ্রহণ করার কারণে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপরও নেমে এল জুলুম নির্যাতন। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তিনি অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় মদীনায় হিজরত করতে বাধ্য হন। মদীনায় এসে সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিজেকে কুরবান করেন। তিনি সর্বদাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিয়োজিত থাকতেন। খায়বার থেকে শুরু করে সকল জিহাদে তিনি হুজুরের সাথে সাথে ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। হুজুরের ওফাতের পরও সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মু'মিনীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফত আমলে সার্বক্ষণিক জিহাদে রত ছিলেন। খালীফাতুল মুসলিমীনদ্বয় তাঁর তাকওয়া ও খোদাভীতি সম্পর্কে খুব ভালো করে জ্ঞাত ছিলেন এবং তাঁর পরামর্শাদি গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করতেন।

উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখন খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁবে পরামর্শ দেন :

> 'হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি যে, মানুষের অধিকার আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করাকে ভয় করুন। আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে গিয়ে কাউকে ভয় করবেন না। সাবধান! কথা ও কাজে বৈপরীত্য রাখবেন না। কথা অনুযায়ী যে কাজ করা হয়, তা-ই উত্তম কাজ। আমীরুল মুমিনীন! মানুষের কল্যাণের জন্য আপনাকে খলীফা নিযুক্ত করা হয়েছে। তাই তাদের সামগ্রিক অগ্রগতির জন্য নিজেকে কুরবান করুন। আপনি ও আপনার পরিবারের জন্য যা পছন্দ করেন, তাদের জন্যও

তা পছন্দ করুন। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করেন, তাদের জন্যও তা অপছন্দ করুন। বাধার পাহাড় অতিক্রম করতে হলেও সত্যের পথে প্রতিষ্ঠিত থাকুন। আল্লাহর জন্যে কারও সমালোচনাকে ভয় করবেন না।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং এ পরামর্শে অত্যন্ত খুশি হয়ে বললেন :

'হে সাঈদ! এ গুরুদায়িত্ব আমার মতো ব্যক্তির পক্ষে কি পালন করা সম্ভব?'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বললেন :

'অবশ্যই সম্ভব। আপনার মতো মহান ব্যক্তিত্ব যাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উম্মতে মুহাম্মদীর নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব দান করেছেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাহায্য থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না। আপনার খোদাভীতির জন্যে আল্লাহ আপনাকে এ কাজ আঞ্জাম দিতে সরাসরি সাহায্য করবেন।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খোদাভীতি, মেধা, প্রতিভা ও যোগ্যতা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অত্যন্ত উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর প্রতি মুগ্ধ ছিলেন। তাই রাষ্ট্র পরিচালনায় তাঁর মতো যোগ্য ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের সহযোগিতার প্রত্যাশায় তাঁকে হিমসের গভর্নর নিযুক্ত করতে মনস্থ করলেন। কয়েকদিন পরে তিনি সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর দরবারে ডেকে এনে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন। হিমসের গভর্নর পদের প্রস্তাব পেয়ে সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই বিব্রত বোধ করলেন এবং বললেন :

'হে আমীরুল মু'মিনীন! আল্লাহর শপথ! এ কঠিন কাজের মাধ্যমে আপনি আমাকে পরীক্ষায় ফেলবেন না।'

এ কথা শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু রাগান্বিত হয়ে বললেন :

وَيْحَكُمْ وَضَعْتُمْ هٰذَا الْأَمْرَ فِىْ عُنُقِىْ ثُمَّ تَخَلَّيْتُمْ عَنِّىْ وَاللّٰهُ لَا أَدْعُكَ .

'কী আশ্চর্য! তোমরা আমাকে খিলাফতের এই কঠিন দায়িত্ব অর্পণ করে নিজেরা ঝামেলামুক্ত থাকতে চাচ্ছ? আল্লাহর শপথ! আমি এক মুহূর্তের জন্যেও তোমাকে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে পারি না।'

অতঃপর তিনি সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আনুষ্ঠানিকভাবে 'হিমসের' গভর্নর নিযুক্ত করেন।

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমীরুল মু'মিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সিদ্ধান্তের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করলেন। হিমসের গভর্নরের দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জন্যে কিছু মাসিক ভাতা নির্ধারণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ কথা শুনে বললেন :

'হে আমীরুল মুমিনীন, সাধারণ নাগরিক হিসেবে আমি যে ভাতা পাচ্ছি, তা-ই আমার জন্যে যথেষ্ট। এর বেশি কিছু দিয়ে আমি কী করব?'

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত সুচারুরূপে এবং দক্ষতার সাথে হিমসের গভর্নরের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। কিছুদিন পর সেখানকার একটি বিশ্বস্ত প্রতিনিধিদল উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে মদীনায় সাক্ষাৎ করেন। আমীরুল মু'মিনীনের সাথে তাদের গুরুত্বপূর্ণ আলাপ-আলোচনা হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিনিধিদলের কাছে হিমসের অভাবগ্রস্ত লোকেদের একটি তালিকা চান, যাতে তাদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা দান এবং সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। প্রতিনিধিদল খলীফার নির্দেশমতো একটি তালিকা প্রস্তুত করে তাঁর নিকট পেশ করেন। এ তালিকায় সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নামও অন্তর্ভুক্ত ছিল। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাঈদ ইবনে আমেরের নাম দেখে প্রশ্ন করলেন :

'কে এই সাঈদ ইবনে আমের?'

উত্তরে তাঁরা বললেন :

'তিনি আমাদের গভর্নর।'

এ কথা শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং আবার প্রশ্ন করলেন :

'আপনাদের গভর্নর কি অভাবী?'

তারা বললেন :

'নিশ্চয়ই। আল্লাহর শপথ! আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের গভর্নরের পরিবারে দিনের পর দিন এমনও অতিবাহিত হয়, যখন তাদের রান্না করার কিছুই থাকে না এবং চুলায় আগুনও জ্বলে না।'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ অবস্থার কথা শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কান্নায় ভেঙে পড়লেন। চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি মোবারক পর্যন্ত ভিজে গেল।

অতঃপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য এক হাজার স্বর্ণমুদ্রার একটি থলে এই প্রতিনিধি দলের নিকট হস্তান্তর করে বললেন :

'সাঈদকে আমার সালাম পৌছাবেন এবং বলবেন যে, আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আপনার পরিবারের প্রয়োজন পূরণের জন্যে বিশেষভাবে এগুলো পাঠানো হয়েছে।'

প্রতিনিধি দল হিমসে প্রত্যাবর্তন করে গভর্নর সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং আমীরুল মুমিনীনের দেয়া দিনারগুলো তাঁর সামনে পেশ করলেন। সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বর্ণমুদ্রাগুলো দেখে আতঙ্কিত হলেন এবং অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে বললেন :

'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন।'

আমীরুল মু'মিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপঢৌকন যেন সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর বজ্রপাতের মতো মনে হলো।

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অবস্থা দেখে তাঁর স্ত্রী খুবই চিন্তিত হলেন এবং জানতে চাইলেন :

'আপনার কী হয়েছে? মদীনা থেকে আগত প্রতিনিধি দলটি কি আমীরুল মু'মিনীনের মৃত্যু-সংবাদ নিয়ে এসেছে?'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :
'তার চেয়েও ভয়াবহ।'

তাঁর স্ত্রী জানতে চাইলেন :

'তাহলে কি মুসলমানদের কোনো যুদ্ধ পরাজয়ের সংবাদ এসেছে?

তিনি উত্তর দিলেন :

'তার চেয়েও ভয়ানক।'

তাঁর স্ত্রী বললেন :

'তাহলে সেই বিপজ্জনক ও ভয়াবহ সংবাদটি কী? '

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

دَخَلَتْ عَلَىَّ الدُّنْيَا لِتُفْسِدَ اٰخِرَتِىْ، وَحَلَّتِ الْفِتْنَةُ فِىْ بَيْتِىْ.

'আখিরাতকে বরবাদ করার জন্য দুনিয়া আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে এবং আমার পরিবারকে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছে।'

তাঁর স্ত্রী প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানার আগ্রহ প্রকাশ না করেই বললেন :

'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ মুসীবত থেকে নিজেকে মুক্ত করুন।'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্ত্রীকে বললেন :

'এ ব্যাপাারে তুমি কি আমাকে সাহায্য করবে?'

উত্তরে তিনি বললেন :

'নিশ্চয়ই, আমি আপনাকে সহযোগিতা করব।'

অতঃপর সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রতিনিধি দলের নিকট হতে স্বর্ণমুদ্রাগুলো গ্রহণ করে তার সবগুলো হিমসের অভাবগ্রস্ত ও দুঃস্থ মানুষের মাঝে বিতরণ করে দিলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হিমসের মুসলমানদের অবস্থা সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করার জন্য সিরিয়া যাওয়ার পথে হিমসে যাত্রা বিরতি করেন। হিমসের জনগণ পূর্ব থেকেই স্বভাবগতভাবে শাসকবর্গের বিরুদ্ধে অপ্রয়োজনীয় অভিযোগ উত্থাপনে অভ্যস্ত ছিল। যে কারণে হিমসকে 'ছোট কুফা' বলে অভিহিত করা হতো। হিমসে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই শুভাগমনে সেখানকার অধিবাসীগণ তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানায়। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখানকার জনগণের কাছে তাদের নতুন

গভর্নর সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা স্বভাবসুলভ কারণে গভর্নরের বিরুদ্ধে এমন চারটি অভিযোগ পেশ করে, যার প্রত্যেকটি অপরটির চেয়ে গুরুতর।

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুবই উচ্চধারণা পোষণ করতেন এবং তাঁর খোদাভীতি ও দীনদারী সম্পর্কেও তিনি পরিষ্কার ধারণা রাখতেন; কিন্তু এর পরেও তাঁর বিরুদ্ধে উত্থাপিত এ চারটি গুরুতর অভিযোগ শুনে তিনি হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

একদিকে জনগণের অর্পিত দায়িত্বের প্রতি নিরপেক্ষতা, অপর দিকে সাঈদ বিন আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি ব্যক্তিগত আস্থা ও মহব্বত আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিচলিত করে তুলল। পরস্পরবিরোধী এ উভয়বিধ সংকটের মোকাবেলায় আমীরুল মুমিনীন ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কী ভূমিকা গ্রহণ করলেন, নিম্নে তা তাঁর যবানীতেই প্রদত্ত হলো :

যেহেতু আমি সাঈদ সম্পর্কে খুবই আস্থাশীল, তাই আল্লাহর দরবারে এই বলে প্রার্থনা করি :

> 'হে আল্লাহ! তুমি সাঈদের ব্যাপারে আমার উচ্চধারণাকে বিলীন করে দিও না।'

অতঃপর আমি গভর্নর এবং হিমসবাসীদের একত্র করে তাদের অভিযোগ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম :

> 'গভর্নর সম্পর্কে তোমাদের প্রথম অভিযোগটি কী?'

তারা বলল :

> 'তিনি প্রত্যহ তাঁর দফতরে বিলম্বে আসেন।'

আমি এ অভিযোগের জওয়াব দানের জন্যে গভর্নর সাঈদকে আহ্বান জানালাম।

সাঈদ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল :

> 'আমি এর উত্তর দেওয়া পছন্দ করছি না এই জন্যে যে, এটি একান্তভাবেই আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আপনার নির্দেশের কারণেই আমাকে বাধ্য হয়ে তা বলতে হচ্ছে।'

এরপর সাঈদ তাঁর অফিসে বিলম্বে আসার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলল :

'আমার ঘরে কাজের কোনো খাদেম বা চাকরাণী নেই। তাই আমি প্রত্যহ সকালে পরিবারের সদস্যদের জন্যে প্রথমে রুটির জন্য আটা দিয়ে খামির তৈরি করি, তারপর তা কিছু সময় রেখে দিতে হয় রুটি তৈরির উপযোগী করার জন্যে। এরপর রুটি বানিয়ে রেখেই ওযূ-গোসল করে প্রস্তুত হয়ে দফতরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। এ কারণে অফিসে আসতে আমার সামান্য বিলম্ব ঘটে।'

অতঃপর আমি জনগণকে উদ্দেশ্য করে বললাম :

'তোমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ কী?'

তারা বলল :

'আমাদের দ্বিতীয় অভিযোগ হলো, রাতের বেলা কোনো প্রয়োজনে গভর্নরকে ডাকা হলে তিনি আমাদের ডাকে সাড়া দেন না।'

এ অভিযোগ শুনে গভর্নর সাঈদের উদ্দেশে বললাম :

'হে সাঈদ! এ ব্যাপারে তোমার বক্তব্য কী?'

সাঈদ বলল :

'এটিও আমার একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার, যা আমি জনসমক্ষে প্রকাশ করা মোটেই পছন্দ করি না। এতদসত্ত্বেও আপনার নির্দেশ পালনার্থে আমাকে বলতে হচ্ছে।'

এরপর গভর্নর সাঈদ বলতে শুরু করে :

'আমি দিনকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও জনসাধারণের খিদমতের জন্যে এবং রাতকে আল্লাহর ইবাদতের জন্যে নির্দিষ্ট করে নিয়েছি। তাই রাত্রি বেলা তাদের প্রয়োজনে আমি সাড়া দিতে পারি না বলে দুঃখিত।'

এরপর আমি তাদের নিকট তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

তারা বলল :

'সাঈদ বিন আমের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাসে একদিন তাঁর কার্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন।'

আমি এই অভিযোগের উত্তর দেওয়ার জন্যে গভর্নর সাঈদের প্রতি আহ্বান জানালাম।

গভর্নর সাঈদ উত্তরে বলল :

'আমীরুল মুমিনীন! আমার ঘরে কোনো কাজের লোক না থাকায় মাসে একবার আমাকে বাজার করতে হয়। এ ছাড়া পরনের এই পোশাক ছাড়া আমার অন্য কোনো পোশাক না থাকায় মাসে যেদিন বাজার করি সে দিনই বাজার শেষে এ পোশাক পরিষ্কার করি এবং তা শুকানো পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হয়। তাই মাসে একদিন কার্যালয়ে অনুপস্থিত থাকা ছাড়া আমার উপায় থাকে না।'

এবার আমি সাঈদ সম্পর্কে জনগণের কাছে তাদের সর্বশেষ অভিযোগটি সম্পর্কে জানতে চাইলাম।

তারা বলল :

'মাঝে মাঝে আমাদের গভর্নর এমনভাবে অজ্ঞান ও বেহুশ হয়ে পড়েন যেন তাঁর পার্শ্বে উপবিষ্ট লোকদেরও তিনি চিনতে পারেন না।'

এবারও আমি সাঈদকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলাম :

'কী ব্যাপার সাঈদ! জনগণ তোমার ব্যাপারে এসব কী বলছে?'

গভর্নর সাঈদ উত্তরে বলল :

'হে আমীরুল মুমিনীন! মুশরিক থাকা অবস্থায় আমি মক্কার এক জনসমুদ্রের মাঝে খুবাইব ইবনে আদি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের নির্মম দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছি। কুরাইশরা জীবিত অবস্থায় তাঁর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তরবারির আঘাতে টুকরো টুকরো করছিল আর বলছিল :

'তুমি কি রাজি আছ? যদি তোমাকে ছেড়ে দিয়ে তোমারই উপস্থিতিতে তোমার পরিবর্তে মুহাম্মদকে হত্যা করি?'

উত্তরে খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলছিলেন :

'আল্লাহর শপথ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার বিনিময়ে আমি মুক্তি পেয়ে আমার পরিবার-পরিজনের নিকট নিরাপদে ফিরে যাওয়া

তো দূরের কথা, পথে হেটে যেতে তাঁর পায়ে একটি কাঁটার আঁচড় লাগুক তাও আমি সহ্য করতে পারব না। মুনাফিকী জীবন থেকে শহীদি মৃত্যু আমার কাছে অনেক উত্তম।'

পুনরায় সাঈদ বলল :

'এ করুণ দৃশ্যের কথা স্মরণ হলেই আমার মনে প্রশ্ন জাগে, কেন আমি সেদিন খুবাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাহায্য করিনি? আল্লাহ ও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার এই অপরাধকে ক্ষমা করবেন না। এই ভয়ে আমি মাঝে মধ্যে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি এবং সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলি।'

গভর্নর সাঈদের এই উত্তর শুনে আমরা অত্যন্ত মুগ্ধ হলাম। সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্যে যিনি সাঈদের প্রতি আমার সুধারণাকে আরো একবার সত্যে পরিণত করেছেন।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনা প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পর সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আর্থিক সাহায্যস্বরূপ পুনরায় এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠালেন। হিমসে সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট এই সাহায্য পৌঁছার পর তা দেখে তাঁর স্ত্রী অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি উৎফুল্ল হয়ে স্বামীকে বললেন :

'আপনার এই খিদমতের জন্য আল্লাহ আমাদের যে অর্থনৈতিক প্রাচুর্য দান করেছেন সে জন্য তাঁর প্রতি অশেষ শুকরিয়া জানাই। অনেক বিলম্বে হলেও এখন অন্তত আমাদের জন্যে কিছু প্রয়োজনীয় খাদ্য-দ্রব্যাদি ও পানাহারের সামগ্রী মজুদ করুন এবং পরিবারের কাজের জন্য একজন কর্মচারী নিয়োগ করুন।'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর স্ত্রীকে বললেন :

'এর চেয়েও উত্তম কোনো জিনিস তুমি কি পেতে চাও?'

স্ত্রী জানতে চাইলেন :

'তা কী?'

তিনি বললেন :

'এগুলো অভাবগ্রস্তদের মাঝে বিলিয়ে দাও। খাদ্য দ্রবাদি ও কর্মচারীর চেয়েও অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আমাদের দরকার।'

স্ত্রী বললেন :

'তা কী?'

তিনি বললেন :

'আমরা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দান করতে চাই।'

স্ত্রী বললেন :

'হ্যা, তা-ই করুন। এতে নিঃসন্দেহে আমরা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত হবো।'

সাঈদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর কার্যালয় ত্যাগ করার পূর্বেই এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো ভিন্ন ভিন্ন থলিতে ভাগ করে পরিবারের একজনকে দায়িত্ব দিয়ে বললেন :

'এগুলো অমুক গোত্রের বিধবাদের, অমুক গোত্রের ইয়াতীম সন্তানদের, অমুক বংশের দুঃস্থ ব্যক্তিদের এবং অমুক বংশের ফকীর-মিসকিনের মাঝে বিতরণ করে দাও।'

---

সাঈদ ইবনে আমের আল জুমাহী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. তাহযীব আত্ তাহযীব -৪র্থ খণ্ড, ৫১ পৃ.।
২. ইবনু আছাকির- ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৪৫-১৪৭ পৃ.।
৩. সিফাতুস সাফওয়া -১ম খণ্ড, ২৭৩ পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আওলীয়া -১ম খণ্ড,২৪৪ পৃ.।
৫. তারিখুল ইসলাম - ২ য়খণ্ড, ৩৫ পৃ.।
৬. আল ইসাবাহ- ৩য় খন্ড , ৩২৬ পৃ.।
৭. নছবে কুরাইশ- ৩৯৯ পৃ.।

# তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী (রা)

*হে আল্লাহ, তোফাইল বিন আমর আদ'দাউসীকে তার উদ্দিষ্ট কল্যাণকর কাজে নিদর্শন দ্বারা সাহায্য করো।*

*–রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ*

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবের ঐতিহ্যবাহী দাউস বংশের অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। সমগ্র আরবে যে ক'জন উচ্চ নৈতিক গুণাবলি সম্পন্ন সম্ভ্রান্ত নেতার পরিচয় পাওয়া যায় তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আরব বিশ্বের প্রখ্যাত দানবীর। তাঁর বাড়িতে মেহমানদের জন্যে সর্বক্ষণ রান্নাবান্না হতো। কোনো আগন্তুক তাঁর দরবার থেকে বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে গিয়েছেন এমন কোনো নজির পাওয়া যায় না। ক্ষুধার্তকে অন্নদান, ভীতসন্ত্রস্তের নিরাপত্তা বিধান এবং অসহায় ও নিরাশ্রয়কে পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে তাঁর সুখ্যাতি ছিল সবার শীর্ষে। তিনি শুধু একজন দানবীরই ছিলেন না; অত্যন্ত তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, অনলবর্ষী বক্তা, সুসাহিত্যিক ও খ্যাতনামা কবিও ছিলেন। তাঁর বক্তৃতা ও কবিতার ছন্দে ছিল এক বিস্ময়কর জাদুকরী আকর্ষণ। শ্রোতাদের দেহ-মন এসবের আকর্ষণে হয়ে উঠত উদ্বেলিত। তিনি ছিলেন কাব্য ও ভাষাশিল্পের একচ্ছত্র সম্রাট। এর ভালো-মন্দ বিচারে পারদর্শী, সূক্ষ্মতম ত্রুটিও তাঁর নজর এড়িয়ে যেতে পারত না।

ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য তাঁকে জাহেলী যুগেও পবিত্র খানায়ে কাবার তাওয়াফ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সে সময়ের প্রচলিত প্রথানুযায়ী ওমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর জন্মভূমি লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চল 'তিহামা' থেকে মক্কায় আগমন করেন। এ সময় মক্কায় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও কাফির কুরাইশদের মধ্যে পারস্পরিক শক্তি ও জনসমর্থন বৃদ্ধির চরম এক প্রতিযোগিতা চলছিল। উভয় পক্ষই নিজ নিজ অনুসারী বৃদ্ধির জন্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান পরিচালনা করছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিকে যেমন তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি ঈমান আনার জন্য লোকেদের আহ্বান জানাচ্ছিলেন, অন্যদিকে কুরাইশরাও পৌত্তলিকতাকে আঁকড়ে ধরে জনগণকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বান থেকে দূরে রাখার জন্য সর্বাত্মক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছিল।

এ অবস্থায় তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী তাঁর মনের অগোচরেই উভয় পক্ষের লক্ষ্যে পরিণত হন। তাঁকে নিয়ে উভয় পক্ষের লোকজনের মধ্যে এক চরম স্নায়ুযুদ্ধ শুরু হয়। তোফাইল আদ দাউসী তা বুঝতে পেরে একদিকে যেমন কুরাইশদের দল ভারী করার প্রতি আন্তরিকতা পোষণ করতেন না, অন্যদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতে সাড়া দেওয়ার মানসিকতাও তাঁর গড়ে উঠেনি। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থেকে ওমরাহ্ পালন করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করা।

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিয়ে এই আদর্শিক দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটে মক্কায় যে টানাপোড়েন শুরু হয়েছিল, সে ঘটনা ছিল অত্যন্ত চমৎকার ও আকর্ষণীয়। তোফাইল আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাষায় :

> 'আমি যখন ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় পৌছলাম, তখন কুরাইশ নেতৃবর্গ আমাকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায় এবং তারা আমাকে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় ভূষিত করে। অতঃপর আমাকে কেন্দ্র করে কুরাইশ বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ একটি বিশেষ সভার আয়োজন করে। উক্ত সভায়

তারা অত্যন্ত সম্মানের সাথে আমাকে উদ্দেশ্য করে বলে :

'তোফাইল আদ দাউসী! মক্কা শহরে আপনার আগমনে আমরা আনন্দিত ও গর্বিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আপনাকে অবগত না করে পারছি না যে, আমাদেরই এক ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করেছে। সে তার তৎপরতার মাধ্যমে আমাদের সমাজকাঠামোর ওপর এক প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে, আমাদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়েছে এবং পরস্পরের মাঝে ভুল বোঝাবুঝি ও পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছে। আমরা আশঙ্কা করছি, সে আপনার মতো জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপরও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে। এমনকি সে আপনার নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের মধ্যেও ভাঙন সৃষ্টি করতে পারে। হতে পারে এমন যে, আপনার অধীনস্থ ও অনুগত ব্যক্তিদেরও সে ধোঁকায় ফেলবে। তাই আপনার প্রতি আমাদের একান্ত পরামর্শ হলো, মক্কায় অবস্থানকালে আপনি তার সাথে কোনো কথা বলবেন না এবং তার কোনো কথা বা আলোচনা শুনবেন না। কারণ, তার কথার মধ্যে এক ধরনের জাদুকরী শক্তি রয়েছে, যা দিয়ে সে পিতা-পুত্র, ভাই-বোন এমনকি স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেও ফাটল ধরাতে সক্ষম।'

কুরাইশ বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এ ছাড়া আরও অনেক আজগুবি কথাবার্তা ও নানা প্রকার আশ্চর্যজনক ঘটনাবলি আমাকে শোনাল। ফলে, তাঁর জাদুকরী কার্যকলাপ সম্পর্কে আমি ও আমার জাতির লোকজনের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তা-চেতনা রক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম। অতঃপর দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিলাম :

'আমি তাঁর সাথে কোনো কথা বলব না এবং তাঁর কোনো কথা শুনব না।'

পৌত্তলিক প্রথানুযায়ী হজ্জের সময় আমরা যেভাবে দেবতাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও খানায়ে কাবা তওয়াফ করে থাকি, পরদিন ঠিক তদ্রূপ তাওয়াফের উদ্দেশ্যে যখন রওয়ানা হই, তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা যেন আমার কানে না পৌঁছে সেজন্য দু'কানের মধ্যে খুব ভালো করে তুলা গুঁজে দেই।

বায়তুল্লাহ শরীফে প্রবেশ করে দেখতে পাই, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করছেন। কিন্তু তাঁর এ নামায আমাদের পৌত্তলিক প্রথার নামায থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তিনি ইবাদত করছেন; কিন্তু তাঁর ইবাদত আমাদের ইবাদতের নিয়ম-পদ্ধতি থেকে ভিন্ন ধরনের। তাঁর ইবাদতের একাগ্রতার দৃশ্য আমাকে মুগ্ধ করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদতের আন্তরিকতা ও বিনয়ভাব এবং আমাদের প্রদর্শনীমূলক ও অন্তঃসারশূন্য ইবাদতের সাথে তুলনা করতে গিয়ে আমি বরং তাঁর দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। এমনকি পূর্ব সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আমি অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে তাঁর নিকটে চলে আসি। আল্লাহর মহিমা! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিলাওয়াতের কিছু অংশ আমার কানে এসে পৌঁছে। কী অপূর্ব! হৃদয়গ্রাহী, মনোমুগ্ধকর ও অর্থবহ সে তিলাওয়াত! যা শুনে আমি নিজের প্রতি ধিক্কার দিয়ে বলছিলাম :

'তোফাইল, তোমার মা তোমাকে কতইনা হতভাগা সন্তান হিসেবে জন্ম দিয়েছিল! তুমি একজন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তি, খ্যাতনামা কবি, বিচক্ষণ বুদ্ধিজীবী ও জ্ঞান সম্রাট, ভাষার ভালো ও মন্দের পার্থক্য নির্ণয়ে তুমি অতুলনীয় ব্যক্তিত্ব। কে তোমাকে মুহাম্মদের কথা শ্রবণে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছে? তিনি যদি কোনো উত্তম কথা বলেন, তাহলে তা গ্রহণ করতে তোমার আপত্তি কিসের? আর যদি তিনি অকারণে কিছু বলেন, তাহলে তা প্রত্যাখ্যান করতেই বা বাধা কী?'

এসব কথা ভেবে ভেবে পরিশেষে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদত ও তাওয়াফ সেরে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিলাম। অতঃপর তিনি যখন তাঁর বাড়ির দিকে ফিরলেন, আমি তাঁকে অনুসরণ করে চললাম এবং তাঁর সাথেই গৃহের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এরপর আমি তাঁর খিদমতে আরয করলাম :

'হে মুহাম্মদ! আপনার জাতির লোকেরা আমাকে আপনার সম্পর্কে নানা ধরনের ভুল ধারণা দিয়েছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তারা আপনার সম্পর্কে আমার মধ্যে প্রচণ্ড ভীতির সৃষ্টি করে দিয়েছে। আমি যেন আপনার কথা না শুনতে পাই, সেজন্যে কানে ভালো করে তুলা গুঁজে

দিয়েছিলাম; কিন্তু আল্লাহর কী কুদরত! এ সত্ত্বেও আপনার তিলাওয়াতের একটি অংশ আমি শুনতে পাই, যা আমার কাছে অত্যন্ত ভালো লেগেছে। তাই আমি আপনার খিদমতে আরয করছি যে, আপনার দাওয়াত সম্পর্কে আমাকে অবগত করুন।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে অবহিত করলেন এবং সূরা ফালাক ও সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করে শোনালেন।

আহ! কি মনোমুগ্ধকর মধুর সে বাণী! এর চেয়ে সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী কথা আমি আর কখনো শুনিনি। এর চেয়ে উত্তম বাস্তবধর্মী নির্দেশাবলি সম্পর্কে কখনো অবগত হইনি। অতঃপর কালবিলম্ব না করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করি :

وَشَهِدْتُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ، وَدَخَلْتُ فِى الْاِسْلَامِ -

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর রাসূল।'

কালেমায়ে শাহাদাতের এ ঘোষণার মাধ্যমেই আমি ইসলামের সুমহান ছায়াতলে আশ্রয় নিই। ইসলাম গ্রহণের পর দীর্ঘদিন আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভের প্রত্যাশায় মক্কায় অবস্থান করি। সে সুবাদে আমি ইসলামের মহান শিক্ষালাভ ও পবিত্র কুরআনে কারীম হিফয করতে থাকি। অতঃপর যখন আমি দেশে ফেরার ইচ্ছা করি তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করি, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার গোত্রের আমি একমাত্র নেতা। আমি এখন তাদের কাছে ফিরে গিয়ে ইসলামের দাওয়াত দিতে চাই। আল্লাহর কাছে দু'আ করুন, তিনি যেন আমাকে এমন কোনো নিদর্শন দান করেন, যাতে মুগ্ধ হয়ে তারা আমার দাওয়াতে সাড়া দেয়। এ কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করেন :

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ لَّهٗ اٰيَةً -

'হে আল্লাহ! তুমি তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসীকে একটি নিদর্শন দান কর।'

এরপর আমি আমার জাতির লোকেদের কাছে ফিরে আসি। বাড়ি থেকে অনতিদূরে একটি উঁচু টিলায় এসে পৌঁছতে না পৌঁছতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর নিদর্শনস্বরূপ আমার কপালে ও দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে একটি নূর প্রজ্বলিত হতে শুরু করল। সে যেন একটি সার্চ লাইট! আমি তা দেখে আল্লাহর কাছে দু'আ করলাম :

'হে আল্লাহ! নিদর্শনস্বরূপ আপনি আমার কপালে যে নূর দান করেছেন, একে দয়া করে অন্যত্র সরিয়ে দিন। কারণ, আমি আশঙ্কা করছি যে, আমার জাতির লোকেরা এটা ধারণা না করে যে, পৈত্রিক ধর্ম ত্যাগ করে ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার পরিণামে আমার কপালে আগুন লেগেছে।'

অতঃপর আল্লাহ এ নূরকে আমার কপাল থেকে সরিয়ে আমার চিবুকের বাটে প্রজ্বলিত করেন। লোকজন আমার এই নিদর্শনকে প্রজ্বলিত ঝুলন্ত প্রদীপের মতো দেখতে পেত। এবার আমি আশ্বস্ত হলাম ও টিলা থেকে বাড়ির দিকে আসতে লাগলাম। বাড়িতে আসতে প্রথমে আমার বৃদ্ধ পিতা আমাকে স্বাগত জানালেন।

আমি তাঁকে বললাম :

'হে আব্বা! আমি আপনার খিদমতে কিছু কথা আরয করতে চাই। হে আমার পিতা! আমি আপনার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হয়ে গেছি এবং আপনিও আমার হতে ভিন্ন হয়ে গেছেন।'

পিতা বললেন :

'কী হয়েছে বৎস? কীভাবে তুমি আমার থেকে আলাদা হলে?'

আমি বললাম :

'আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছি।'

এ কথা শুনে পিতা বললেন :

'প্রিয় পুত্র আমার! এখন থেকে আমিও ইসলামকে নিজের দীন হিসেবে গ্রহণ করলাম।'

আমি তখন পিতাকে বললাম :

> 'হে আব্বা! আপনি গোসল করে, পাক-পবিত্র কাপড় পরিধান করে আসুন এবং আমি যেভাবে ইসলামে দীক্ষিত হয়েছি, সে নিয়মে আপনাকেও ইসলামে দীক্ষিত করি।'

অতঃপর তিনি গোসল করে, পাক কাপড় পরিধান করে এলে, আমি ইসলামের মহান দাওয়াত তার সামনে তুলে ধরি। তিনি বিনা দ্বিধায় কালেমায়ে শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করে ইসলামে দীক্ষিত হন।

অতঃপর আমার স্ত্রী আমাকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে আসে। আমি তাকেও বলি, তোমার সাথে একটু কথা আছে, তা হলো :

> 'তুমি এখন আর আমার নেই এবং আমিও আর তোমার নেই।'

স্ত্রী বলল :

> 'তা কীভাবে? আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, আপনি কি আমার প্রতি রাগ করেছেন?'

উত্তরে আমি বললাম :

> 'ইসলাম তোমার এবং আমার মাঝে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিয়েছে। কারণ, আমি ইসলাম গ্রহণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছি।

এ কথা শুনে স্ত্রী বলল :

> 'আমিও আপনার সাথে ইসলামে দীক্ষিত হলাম।'

অতঃপর আমি তাকে বললাম :

> 'দাউস গোত্রের দেবতার মূর্তির পাশ ঘেঁষে পাহাড় হতে যে ঝর্না প্রবাহিত হচ্ছে, সেখানকার স্বচ্ছ পানিতে গোসল করে এসো।'

স্ত্রী উত্তরে বলল :

> 'আমার পিতামাতা আপনার জন্যে কুরবান হোক, যেখানে আমাকে গোসল করতে পাঠাচ্ছেন, না জানি, ধর্মচ্যুত হওয়ার কারণে আমি যু-শারাহ বা ঝর্নাদেবীর অভিশাপে নিপতিত হই।'

আমি বললাম :

'তোমার দেবতা ধ্বংস হোক এবং তোমার কুচিন্তা দূর হোক! আমি এ জন্যে বলেছি যে, লোকজনের ভিড়ের আড়ালে একটু দূরে গিয়ে ভালো করে গোসল করে আসতে। আমি তোমাকে এই নিশ্চয়তা দিচ্ছি যে, এই পাথরের মূর্তি তোমার কোনো ক্ষতিই করতে পারবে না।'

অতঃপর সে সেখান থেকে গোসল করে এলে, আমি তার কাছে ইসলামের সুমহান দাওয়াত পেশ করি এবং সে কালেমা শাহাদাতের বাণী উচ্চারণের মাধ্যমে ইসলামে দীক্ষিত হয়। অতঃপর আমি আমার দাউস সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাই। কিন্তু একমাত্র আবূ হোরায়রা ব্যতীত তাৎক্ষণিকভাবে আর কেউ আমার এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তারা ইসলাম গ্রহণে বড়ই মন্থর গতি অবলম্বন করে। দীর্ঘদিন দাওয়াতী কাজ অব্যাহত রাখার পর আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাথে নিয়ে আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্যে মক্কায় আসি। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন :

'হে তোফাইল! তোমার দাওয়াতী কাজের অবস্থা কী? আল্লাহর ডাকে কেউ কি সাড়া দিয়েছে?'

উত্তরে আমি আরয করি :

'ইসলামের প্রতি তাদের অন্তর হিংসা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ, তারা কুফরী ও শিরকের মধ্যে ভীষণভাবে নিমজ্জিত। খোদাদ্রোহিতা, নাফরমানী ও শঠতা তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত নিরাশ।'

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনায় বলেন :

'আমার থেকে দাওয়াতী কাজের এই হতাশাব্যঞ্জক সংবাদ শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো মন্তব্য না করে উঠে এসে ওযূ করে দু'রাকাআত নামায আদায় করলেন। নামাযশেষে আকাশ পানে দু'হাত তুলে মুনাজাত করতে থাকলেন।'

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দৃশ্য দেখে ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, তিনি হয়তবা দাউস সম্প্রদায়কে ইসলাম গ্রহণ না করার কারণে বদদু'আ করবেন এবং যার ফলে সমগ্র দাউস সম্প্রদায় আল্লাহর গজবে পতিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

আবূ হোরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে মনে আফসোস করে বলতে লাগলেন :

'হায়! কতইনা দুর্ভাগা এই দাউস সম্প্রদায়, যারা নিজেদের হঠকারিতার জন্যে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হচ্ছে!'

কিন্তু কী আশ্চর্য! রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে দু'হাত তুলে বদদু'আর পরিবর্তে বলতে লাগলেন :

"اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ... اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا ... اَللّٰهُمَّ اهْدِ دَوْسًا۔

'হে আল্লাহ! তুমি দাউস সম্প্রদায়কে হেদায়াত দান করো। হে আল্লাহ! তুমি তোফায়েলের গোত্র দাউস সম্প্রদায়কে হোদায়াতের পথ গ্রহণ করার তৌফিক দান করো...। হে আল্লাহ! তোমার দীনের জন্যে তাদের কবুল করো।'

অতঃপর তিনি আমাকে সম্বোধন করে বলেন :

'আমি প্রাণ খুলে তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্যে দু'আ করেছি–

اِرْجِعْ اِلٰى قَوْمِكَ وَارْفِقْ بِهِمْ وَادْعُهُمْ إِلٰى الْاِسْلَامِ ـ

'তুমি তোমার সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে যাও এবং পুনরায় তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাও। নিরাশ না হয়ে দৃঢ়তার সাথে সেখানে তাদের মাঝেই অবস্থান করো এবং হিকমত ও ধৈর্যের সাথে ইসলামের দিকে তাদের আহ্বান জানাতে থাকো।'

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে নিজেকে ধন্য করে প্রবল আধ্যাত্মিক চেতনা ও উদ্দীপনা নিয়ে স্বগোত্রে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ণোদ্যমে পুনরায়

দাওয়াতী কাজ আরম্ভ করেন। তাঁর ভাষায় :

'এবার আমি অবিশ্রান্তভাবে আমার জাতিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার কাজ আরম্ভ করে দিলাম। ইতোমধ্যেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে চলে যান। বদর, ওহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও এ সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়ে যায়। খায়বর যুদ্ধের প্রাক্কালে আমি আবার রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে মদীনায় গিয়ে উপস্থিত হই।

'এবার আমার সাথে শুধু আবূ হোরায়রা একাই নন, আল্লাহর মেহেরবানীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আয় দাউস সম্প্রদায়ের নবদীক্ষিত ৮০টি পরিবারের সদস্যরাও রয়েছে। যারা ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার জন্য নিবেদিত। আমাদের দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশি হলেন এবং আমাদের খায়বর বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য করে গণীমতের অংশ প্রদান করলেন। আমরা সকলেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আরয করলাম : 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বিগত জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারিনি, তা সত্ত্বেও আপনি আমাদের গনীমতের সম্পদ দানে ধন্য করেছেন। এখন থেকে আমরা নিজেদের জিহাদের জন্যে আপনার কাছে পেশ করছি। প্রত্যেকটি জিহাদেই আপনার ডান পাশের বিশেষ বাহিনী হিসেবে আমাদের গ্রহণ করুন এবং আমাদের জন্যে একটি নির্দিষ্ট প্রতীক নির্ধারণ করুন।'

তুফাইল বিন আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরো বলেন :

'মক্কা বিজয় পর্যন্ত আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে মদীনায় অবস্থান করি। মক্কা বিজয়ের পর আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে নিবেদন করি, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমর বিন হামামার 'যুলকাফিন' নামে যে মূর্তিটি অদ্যাবধি দাউস সম্প্রদায়ের দেবতা হিসেবে গণ্য হয়ে আসছে, আমাকে যদি অনুমতি দিতেন তাহলে আমি ঐ মূর্তিটিকে জ্বালিয়ে দিয়ে জাহিলিয়াতের সমস্ত কুসংস্কারের

মূল্যোৎপাটন করে ফেলতাম। কারণ, নবদীক্ষিত মুসলমানরা এখনও এর প্রতি একটা বিশেষ ধারণা পোষণ করে যাচ্ছে।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সে অনুমতি দিলেন। অনুমতি পেয়ে তিনি স্বগোত্রীয় একটি গ্রুপ নিয়ে মূর্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যুগ যুগ ধরে চলে আসা বিভিন্ন কুসংস্কারের কেন্দ্রবিন্দু, মিথ্যা প্রত্যাশার প্রতীক, শিরকের এই বীজকে সমূলে উৎপাটন করার জন্যে তিনি যখন প্রস্তুতি নেন তখন লোকালয়ের নারী-পুরুষ, শিশু-কিশোর এ দৃশ্য অবলোকনের জন্যে চতুর্দিকে প্রচণ্ড ভীড় জমায়। তারা সবাই আশঙ্কা করছিল যে, এই দেবতাকে জ্বালাতে গিয়ে 'যুল কাফিনের' অভিশাপে তোফাইল ও তাঁর সাথীরা এই বুঝি আসমানী কোনো বজ্রপাতে নিপতিত হয়; কিন্তু তোফাইল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়ে চারপার্শ্বের হাজার হাজার অনুসারী ও উৎসুক জনতার চোখের সামনে 'যুলকাফিনের' মূর্তির গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন। আগুন প্রজ্বলনকালে তোফাইল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাব্যিক ছন্দে বলেন :

يَاذَاالْكَفَيْنِ لَسْتُ مِنْ عُبَّادِكَا

مِيْلَادُنَا اَقْدَمُ مِنْ مِيْلَادِكَا

إِنِّيْ حَشَوْتُ النَّارَ فِيْ فُؤَادِكَا

'রে যুলকাফিন, আমরা তোর অনুসারী নই,
আমাদের জন্ম তোর জন্মের অনেক পূর্বে,
অতঃএব আমি তোর মিথ্যা অস্তিত্বে আগুন ধরাচ্ছি,
যদি তোর কোনো শক্তি থাকে তাহলে প্রতিহত কর।'

দাউস সম্প্রদায়ের নবদীক্ষিত মুসলমানদের হৃদয়ে 'যুলকাফিন' সম্পর্কে যে যৎসামান্য সংশয় ও ইতস্ততা ছিল, শিরকের সর্বশেষ যে ছোঁয়া অন্তরে ছিল, মূর্তি ভস্মীভূত হওয়ার সাথে সাথে তা শেষ হয়ে যায়। অতএব, যখন লোকেরা বাস্তবিকই বুঝতে পারল, এই যে মূর্তি, যাকে তারা গোটা জীবন শ্রদ্ধাভরে

দেবতার মর্যাদা দিয়ে আসছিল, প্রকৃতপক্ষে তা একটি কাষ্ঠখণ্ড ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ফলে অবশিষ্ট লোকেরাও ইসলামে দীক্ষিত হয়ে এর ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার জন্যে নিজেদের জীবন ও সম্পদ কুরবান করার জন্যে এগিয়ে এল।

অতঃপর তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণ শিরকমুক্ত করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে নিয়ে আসার পর বাকী জীবন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থেকে সার্বক্ষণিকভাবে জিহাদে অংশগ্রহণের নিমিত্তে মদীনায় চলে আসেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তিনি তাঁকে ছায়ার মতো অনুসরণ করতেন।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে তিনি ও তাঁর ছেলে আমর সার্বক্ষণিক জিহাদে রত থাকেন। তাঁর শাসনামলে ভণ্ডনবী ও ইসলামত্যাগী মুরতাদদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ যখন চরমে তখন ভণ্ড নবী 'মুসায়লামাতুল কাযযাবে'র সাথে রোমহর্ষক সংঘর্ষে তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর ছেলে আমর প্রবল বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়েন। যুদ্ধযাত্রার পথে তোফাইল ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক আশ্চর্যজনক স্বপ্ন দেখেন। তিনি উপস্থিত সাহাবাদের কাছে এর তাবীর জানতে চেয়ে বলেন :

'আমি এক আশ্চর্য স্বপ্ন দেখেছি।'

সাহাবাগণ জানতে চাইলেন :

'কী আশ্চর্যজনক স্বপ্ন?'

উত্তরে তিনি বললেন :

'আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার মাথা মুণ্ডন করা হয়েছে এবং আমার মুখের ভিতর থেকে একটি পাখি বেরিয়ে উড়ে গেছে এবং একজন মহিলা আমাকে তার পেটের ভিতর ঢুকিয়ে ফেলেছে এবং আমার ছেলে আমর আমাকে উদ্ধারের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে; কিন্তু আমার এবং তার মাঝে এক প্রতিবন্ধকতা আমাকে তার কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।'

উপস্থিত সাহাবীগণ এই স্বপ্নের বর্ণনা শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক থাকলেন, অতঃপর বললেন :

'আল্লাহ্ আপনার ভালো করুন।'

অতঃপর তিনি নিজেই তাঁর স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন :

'আমি নিজেই আমার স্বপ্নের একটি তাবীর সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েছি যে, আমার মাথা মুড়ানো থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আমি এ জিহাদে শহীদ হয়ে যাব। আর সেই পাখিটি যা আমার মুখের ভিতর দিয়ে বের হয়ে উড়ে গেছে, তা হবে আমার আত্মা, যা তার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে আরশে মু'আল্লার দিকে উড্ডীয়মান হবে এবং যে মহিলা আমাকে তার পেটের ভিতরে ঢুকিয়ে ফেলেছে, সেটা হবে সেই যুদ্ধ ক্ষেত্রের কবরস্থান যেখানে আমার লাশ দাফন করা হবে। আর আমি অবশ্যই আশা করছি যে, এ যুদ্ধে আল্লাহ্ তাআলা আমাকে শাহাদাত দান করবেন। আমার ছেলে যে আমাকে পাবার জন্যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল তা হলো, সেও আমার মতো শাহাদাতের সৌভাগ্য অর্জনের জন্যে যুদ্ধে প্রাণ বাজি রেখে লড়াই করবে; কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন তাকে এ যুদ্ধে শাহাদাতের সৌভাগ্য দানের পরিবর্তে অন্য আর একটি জিহাদ পর্যন্ত গাজী হিসেবে তাঁকে বাঁচিয়ে রাখবেন।'

ইয়ামামার প্রান্তরে 'মুসায়লামাতুল কাযযাবে'র সাথে ইসলামের ইতিহাসের প্রচণ্ডতম রক্তক্ষয়ী এ যুদ্ধে তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঈমানী চেতনা ও শাহাদাতের বাসনায় উদ্বেলিত হয়ে সিংহের ন্যায় খোদাদ্রোহী নাস্তিক ও মুরতাদদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর তরবারির আঘাতে একের পর এক দুশমনদের দুর্ভেদ্য প্রাচীর যেন ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছিল। তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রতিরোধ করার জন্যে চতুর্দিক থেকে তাঁকে ঘিরে ফেলা হলো। তলোয়ারের সাথে তলোয়ারের ঝংকারে অগ্নিস্ফুলিংগ তাঁর চতুর্পাশ আলোকিত করে তুলছিল। হঠাৎ কোনো এক শত্রুর আঘাত তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধরায় লুটিয়ে দিল। তিনি কালেমা শাহাদাতের বাণী উচ্চারণ করতে করতে শাহাদাতের পেয়ালা পান করলেন।

এদিকে তাঁর পুত্র আমর পিতার চেয়েও অধিক বিক্রমে তাঁর চারপাশের মুশরিকদের ধরাশায়ী করে সম্মুখের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। প্রবল বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনলেন। কিন্তু এই গৌরবোজ্জ্বল বিজয়ে আমর তাঁর পিতা তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে তার ডান হাতের একটি কবজিও আল্লাহর পথে কুরবান করলেন। ইয়ামামার ময়দানে তাঁর পিতা এবং নিজ হাতের কবজীকে দাফন করে বিজয়ীর বেশে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন।

আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে আমর বিন তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা কোনো এক প্রয়োজনে এমন এক সময়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হন, যখন রাষ্ট্রীয় মেহমানদের সম্মানে এক ভোজসভা অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে আমর বিন তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও অংশগ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়; কিন্তু তিনি এ মহতী ব্যক্তিবর্গের সাথে বাম হাতে কিভাবে খানা গ্রহণ করবেন তা ভেবে খুবই সংকোচ বোধ করছিলেন। তাঁর এই সংকোচ বোধ লক্ষ্য করে আমীরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বলেন :

> 'কী হয়েছে? তুমি কেন আমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে চাচ্ছ না? তোমাকে বাম হাতে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে এ জন্যে?'

উত্তরে তিনি বললেন :

> 'আমীরুল মু'মিনীন আপনি ঠিকই বলেছেন।'

তাঁর এই উত্তর শুনে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত আবেগজড়িত কণ্ঠে বলে উঠলেন :

> وَاللّٰهِ لَا اَذُوْقُ هٰذَا الطَّعَامَ حَتّٰى تَخْلِطَهُ بِيَدِكَ الْمَقْطُوْعَةِ... وَاللّٰهِ مَا فِى الْقَوْمِ اَحَدٌ بَعْضُهُ فِى الْجَنَّةِ اِلَّا اَنْتَ .

> 'আমর! আল্লাহর শপথ করে বলছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি এ খাদ্য গ্রহণ করব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি তোমার কর্তিত হাতের এই অবশিষ্ট অংশ দ্বারা

এই খাদ্য ঘেঁটে দেবে। আমি শপথ করে বলছি, আমাদের এ উপস্থিতির মধ্যে তোমার মতো দ্বিতীয় এমন কোনো ব্যক্তি কি আছে? যিনি তার জীবদ্দশায় দেহের একটি অংশকে জান্নাতে পাঠিয়ে দিতে পেরেছে?'

আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শাহাদাতের পর থেকে তিনি পিতার শপথ অনুসরণে শাহাদাতের মৃত্যুর বাসনায় ব্যাকুল হয়ে উঠেন। আখিরাতমুখী জীবন তাঁর এই নশ্বর জগতের সব ধরনের মোহ ও চাকচিক্যকে পরাভূত করে। জান্নাতের অনন্ত শান্তির প্রত্যাশায় তাঁকে ব্যাকুল করে তুলে। শুধু এই শাহাদাতের মৃত্যুটাই যেন এই চাওয়া-পাওয়ার মাঝে ছিল একমাত্র অন্তরায়।

পনেরো হিজরীতে বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি রোমান সাম্রাজ্যের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রের যে ঐতিহাসিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে যুদ্ধে তিনি রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। এই রক্তক্ষয়ী প্রচণ্ড সম্মুখ যুদ্ধে যেসব মুসলিম মুজাহিদ শত্রুপক্ষের দুর্ভেদ্য প্রাচীরকে তাদের শাণিত তরবারির আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলেন, আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম। এ যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অত্যন্ত বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করার এক পর্যায়ে কাফিরদের চতুর্মুখী হামলায় শাহাদাত বরণ করে পিতার স্বপ্নের বাস্তব সাক্ষ্য দিয়ে জান্নাতুল ফিরদাউসের অনন্ত জীবনে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমর ইবনে তোফাইল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার প্রতি অশেষ রহমত বর্ষণ করুন এবং পিতা ও পুত্র উভয়কে শাহাদাতের সুমহান পুরস্কারে ভূষিত করুন। আমীন!

---

তোফাইল ইবনে আমর আদ দাউসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. আল ইসাবা ফি তামিজ আস্ সাহাবা-৩য় খণ্ড, ২৮৬-২৮৮ পৃ.।

২. আল ইসতিয়াব, হায়দরাবাদ সংস্করণ-১ম খণ্ড, ২১১-২১৩।

৩. উছুদুল গাবা-৩য় খণ্ড, ৫৪-৫৫ পৃ.।

৪. ছেফাতুছ ছাফওয়া-১ম খণ্ড, ২৪৫-২৪৬ পৃ.।

৫. ছিয়ার আ'লামুন নুবালা-১ম খণ্ড, ২৪৮-২৫০ পৃ.।

৬. মুখতাছার তারিখি দামেস্ক-৭ম খণ্ড, ৫৯-৬৪ পৃ.।

৭. আল বিদায়া ওয়া আন্ নিহায়া-৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৩৭ পৃ.।

৮. শুহাদা'উল ইসলাম-১৩৮-১৪৩ পৃ.।

৯. সিরাতু বাতাল-লি মুহাম্মদ যায়দান, (দারুস সাউদীয়া) ১৩৮৬ হি.।

# আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী (রা)

*'প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত, আবদুল্লাহ বিন হুযাফা (রা)-এর মাথায় চুম্বন করা আমি সর্বপ্রথম এ কাজ শুরু করছি।'*

*– উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)*

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসিদ্ধ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কিছু অবিস্মরণীয় ঘটনা নিয়েই এই আলোচনা :

তৎকালীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দুই পরাশক্তি, রোমান সম্রাট কায়সার এবং পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দূত হিসেবে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করে, তিনি তৎকালীন যুগে ইতিহাস সৃষ্টিকারী অনেক ব্যক্তিত্বের তুলনায় অধিক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। অন্যথায়, হাজারো আরব সন্তানের মতো তিনিও অতীতের পাতায় অপরিচিত হয়ে থাকতেন। কে স্মরণ করতো তার নাম? জীবনের চরম ঝুঁকি নিয়ে বিপদ সংকুল পথ পাড়ি দিয়ে দুই পরাশক্তির কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর ঘটনা তাঁকে রোজ কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় করে রাখবে।

তখন ৬ষ্ঠ হিজরী। আরবের ভৌগোলিক সীমার বাইরে অর্থাৎ বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল সাহাবীকে মনোনীত করলেন। তাঁদের দায়িত্ব ছিল, বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে ইসলামের দাওয়াতপত্র পৌঁছিয়ে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করা। এই প্রতিনিধি প্রেরণের কাজটি ছিল যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

এমনসব দেশে প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো, যেসব দেশের সাথে নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রের কোনো রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল না। ফলে এই প্রতিনিধি দলের সদস্যদের জানমালের ন্যূনতম নিরাপত্তা সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব ছিল না।

উপরন্তু, প্রতিনিধি দলের যেমন ছিল না সংশ্লিষ্ট কাজের কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা, তেমনি সেসব দেশের রাজা-বাদশাহদের মন-মানসিকতা সম্পর্কেও তারা ছিলেন না ওয়াকিফহাল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন উদ্যোগ নেওয়ার অর্থ, জেনে-শুনে কাউকে যেন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা। তাছাড়া সেসব দেশ থেকে এই দূতদের সহী-সালামতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনেরও কোনো নিশ্চয়তা ছিল না।

একদিকে বহির্বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার ব্যাকুলতা, অপরদিকে দূতের নিরাপত্তা চিন্তা এবং অকল্পনীয় কোনো নাজুক পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা– এসব চিন্তায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাকুল হয়ে পড়লেন।

তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাহাবীদের মন-মানসিকতা গঠনের লক্ষ্যে একটি সাধারণ সভা আহ্বান করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সর্বস্তরের সাহাবীগণ এ সভায় ছুটে আসলেন। যথাসময়ে সভার কাজ আরম্ভ হলো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হাম্‌দ ও ছানা পেশ করার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার আবশ্যকতার ওপর এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখলেন।

তিনি বললেন :

> 'বিশ্বের সকল দেশের শাসকবর্গের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে আমি একদল প্রতিনিধি প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মদীনার সীমানা পেরিয়ে ইসলামের দাওয়াত সমগ্র বিশ্বে সম্প্রসারণ করা যে অতীব জরুরি, আশা করি তোমরাও আমার সাথে এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করবে। আমি এও আশা করি যে, ঈসা আলাইহিস সালামের সাথে বনী ইসরাইলরা যেরূপ টালবাহানা ও মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছিল, তোমরা তেমন কোনো আচরণ করবে না বরং বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে এ কাজে অংশগ্রহণ করবে।'

উপস্থিত সাহাবীগণ সমস্বরে বলে উঠলেন :

> 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার দ্বারা অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালনে আমরা সদা প্রস্তুত এবং বদ্ধপরিকর। পৃথিবীর যে প্রান্তে আপনি আমাদের পাঠাতে ইচ্ছা করেন, নির্দ্বিধায় আমরা সেখানে যেতে প্রস্তুত।'

সাহাবীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এ উদ্দেশ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি তাঁর রিসালাতের দাওয়াত বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে পৌছানোর জন্যে ছয়জন বিশিষ্ট সাহাবীকে মনোনীত করলেন। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠি পৌছানোর দায়িত্ব অর্পিত হলো তাঁরই ওপর।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের সৈনিক ঈমানী চেতনায় বলীয়ান, প্রজ্ঞাবান আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সফরের জন্য তৈরি হলেন। পরিবারের সকল সদস্য এবং বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলেন। সেখান থেকে পারস্য সম্রাট কিসরার উদ্দেশে লেখা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র নিয়ে বালুকাময় মরুভূমি ও দুর্গম পাহাড়ি পথ ধরে সুদূর পারস্যের উদ্দেশ্যে

যাত্রা শুরু করলেন তিনি। আল্লাহর সাহায্যের ওপর ভরসা করে এই মর্দে মুজাহিদ আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একাকী দীর্ঘ এই বিপদসংকুল পথ অতিক্রম করে অবশেষে পারস্য সম্রাটের দরবারে গিয়ে উপস্থিত হলেন। অতঃপর রাজ-দরবারের পারিষদবর্গকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব বুঝিয়ে সম্রাটের সাথে তিনি সাক্ষাতের অনুমতি লাভ করলেন।

এদিকে পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দূত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আগমনের খবর পৌঁছলে সে ভাবল, অন্যান্য ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যের মতো নবপ্রতিষ্ঠিত এই ইসলামী রাষ্ট্রও হয়তো আনুগত্যের অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর দ্বারস্থ হচ্ছে। এই মনে করে সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে তার দরবারকে সুসজ্জিত করার নির্দেশ দিল। উচ্চপদস্থ ও গণ্যমান্য সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিবর্গকে দরবারে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দিল। দোভাষীদেরও উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করা হলো। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাক্ষাতের জন্যে সম্রাট ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দিল।

পাতলা আরবী জুববা এবং ঐতিহ্যবাহী সাধারণ আরবী পোশাক 'আবা' বা গাউন পরিহিত দৃঢ় মনোবলের অধিকারী এবং ঈমানী চেতনায় উদ্দীপ্ত আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত বীরোচিত ও ভাবগম্ভীর মেজাজে নির্ধারিত সময়ে দরবারে উপস্থিত হলেন। তাঁর নূরানী চেহারায় ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা প্রতিফলিত হচ্ছিল।

রাষ্ট্রীয় প্রথানুযায়ী সম্রাট তার নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে দূত থেকে চিঠি গ্রহণের নির্দেশ দিল। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

> 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ চিঠিখানা আমাকে স্বহস্তে সম্রাটের হাতে প্রদানের জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব তাঁর নির্দেশের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে আমি সরাসরি সম্রাটের হাতেই চিঠিখানা হস্তান্তর করতে চাই।'

একথা শুনে সম্রাট কিসরা তার কাছে দূতকে আসার অনুমতি দিল এবং স্বহস্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চিঠিখানা গ্রহণ করল।

অতঃপর সম্রাট ইরাক নিবাসী আল-হিরার একজন প্রখ্যাত দোভাষীকে চিঠিখানা খুলে পাঠ করে তা পারস্যের ভাষায় তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই ঐতিহাসিক পত্রখানার সম্বোধন ছিল নিম্নরূপ :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُوْلِ اللّٰهِ اِلٰى كِسْرٰى عَظِيْمِ فَارِس.

"سَلَامٌ عَلٰى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى وَاٰمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ، وَاَدْعُوْكَ بِدَعَايَةِ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ، فَاِنِّى رَسُوْلَ اللّٰهِ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً، لِاُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِيْنَ، وَاَسْلِمْ تُسْلِمْ، فَاِنْ تَوَلَّيْتَ فَاِنَّ اِثْمَ الْمَجُوْسِ عَلَيْكَ".

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম

আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ-এর পক্ষ থেকে পারস্য সম্রাট কিসরা'র প্রতি–

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনে হেদায়াতের অনুসরণ করেছে, তাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাকে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাচ্ছি।

জেনে রাখো, আমি সমস্ত মানবকূলের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল হিসেবে প্রেরিত হয়েছি, যেন জীবিতদেরকে ঈমান গ্রহণ না করার পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করি এবং অস্বীকারকারীদের উপর তাঁর সাজার নির্দেশ যথার্থভাবে পরিগণিত হয়।

অতএব, তুমি ইসলাম গ্রহণ করে আনুগত্য স্বীকার করো, ইহকালে পূর্ণ নিরাপত্তা ও পরকালে শান্তির নিশ্চয়তা পাবে।

জেনে রাখো! যদি এ আহ্বানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন ও এটিকে প্রত্যাখ্যান করো তাহলে অগ্নিপূজক 'মাজুস' জাতির সমস্ত গুনাহর দায়-দায়িত্ব তোমাকেই বহন করতে হবে।'

চিঠির এই ক'টি বাক্য শোনার সাথে সাথেই সম্রাট কিসরা হিংসা, অহংকার ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে। হিংস্রতায় তার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। চিৎকার করে বলতে লাগল :

> 'কী স্পর্ধা! মহামান্য সম্রাট কিসরার নামে পত্র লেখা শুরু না করে 'বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলে শুরু করেছে? তা ছাড়াও আমার নামের পূর্বে মুহাম্মদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?'

এই বলে সম্রাট ক্রোধে দোভাষী থেকে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে ফেলল। আর বলল :

> 'এ ভাষায় চিঠি লেখা কি তার পক্ষে শোভন? সে আমার অধীনস্থ একজন ব্যক্তিমাত্র।'

অতঃপর সম্রাট কিসরা আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর দরবার থেকে বের করে দেওয়ার নির্দেশ দিল। নির্দেশমতো তাকে সেখান থেকে বেরও করে দেওয়া হলো।

হিংস্র হায়েনার মতো বদ মেজাজী ও আত্ম-অহমিকায় বিভোর, ক্রোধে কম্পমান পারস্য সম্রাট কিসরার দরবার থেকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেরিয়ে গিয়ে এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে তৎক্ষণাৎই মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র সম্রাট কিসরার নিকট পৌঁছানোর পর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অর্পিত দায়িত্ব পালনে পূর্ণ সফলকাম হলেও এ আশংকা ছিল যে, সম্রাটের হিংস্র মেজাজ যে কোনো ভয়ংকর দিকে মোড় নিতে পারে। সুতরাং এ দেশে আর থাকা যায় না। এই চিন্তা করেই তিনি দ্রুত মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

পারস্য সম্রাট কিসরার মেজাজ যখন একটু শান্ত হলো, তখন সে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আরো কিছু তথ্য জানার জন্যে তাঁকে আবার দরবারে নিয়ে আসতে কর্তব্যরত ব্যক্তিদের নির্দেশ দিল। নির্দেশমতো লোকজন চতুর্দিকে তাঁকে খুঁজতে শুরু করে। দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করেও তাঁর কোনো সন্ধান পাওয়া গেল না। অবশেষে অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তলব করা হলো এবং তাদের প্রতি নির্দেশ দেওয়া হলো, জাজিরাতুল আরবের যে

কোনো স্থানে তাঁকে পাওয়া গেলে জীবিত অবস্থায় সম্রাটের কাছে হাজির করতে হবে। কিন্তু অশ্বারোহী বাহিনী তীব্র গতিতে ছুটে গিয়ে শেষ সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেও তারা হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোনো সন্ধান পেল না। বেদুইনদের থেকে তারা জানতে পারল, তিনি ইতোমধ্যে পারস্যের সীমানা অতিক্রম করে মদীনায় পৌঁছে গেছেন।

এদিকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিরাপদেই মদীনা পৌঁছতে সমর্থ হলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পারস্য সম্রাট কিসরার সাথে ঘটে যাওয়া সমস্ত ঘটনা তুলে ধরার সাথে তাঁর পবিত্র চিঠিখানা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করার বর্ণনাও তিনি দিলেন। একথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবান থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে এল :

"مَزِّقْ اللّٰهُ مُلْكَهُ" 'আল্লাহ, কিসরার সাম্রাজ্যকেও টুকরো টুকরো করে দিন।'

বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে আসা সৈন্যদের ব্যর্থতার গ্লানিতে কিসরা প্রতিহিংসার অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছিল। বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি শাহানশাহ কিসরা সামান্য একজন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে না পারায় নিজেকে অত্যন্ত হেয় ও অপমানিত বোধ করল।

সম্রাট কিসরা হতাশাগ্রস্ত ও দিশেহারা হয়ে পরিশেষে পারস্যের করদ রাজ্য ইয়ামেনের বাদশাহ 'বাজানে'র কাছে ফরমান জারি করল :

'নির্দেশ পাওয়ামাত্র আপনার পক্ষ থেকে দু'জন শক্তিশালী চতুর এবং সাহসী ব্যক্তিকে হেজাজের নবী দাবিদার মুহাম্মদের কাছে পাঠাবেন, তারা যেন মুহাম্মদকে আমার কাছে ধরে নিয়ে আসে।'

শাহানশাহ কিসরার নির্দেশ 'বাজান'কে পালন করতেই হবে। তাই তৎক্ষণাৎ সে দু'জন চতুর ও সাহসী ব্যক্তিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি লিখিত ফরমানসহ হেজাজে পাঠাল। ফরমানে উল্লেখ করা হলো :

'কালবিলম্ব না করে সে যেন এই দু'ব্যক্তির সাথে পারস্য-সম্রাট কিসরার দরবারে গিয়ে হাজির হয়।'

'বাজান' এই দু'ব্যক্তিকে আরও নির্দেশ দিল, তারা যেন মুহাম্মদের নবুওয়াত সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করে ও তার কার্যাবলি পর্যবেক্ষণ করে এর একটি রিপোর্ট তার কাছে পেশ করে।

শাহী ফরমান পালনের সৌভাগ্য লাভে ধন্য হয়ে পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি সহকারে উৎফুল্লচিত্তে এই দু'ব্যক্তি হেজাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। তায়েফে পৌঁছার পর কুরাইশ সম্প্রদায়ের দু'জন পৌত্তলিক ব্যবসায়ীর সাথে তাদের সাক্ষাৎ ঘটল। ব্যবসায়ীদ্বয়ের মাধ্যমে তারা জানতে পারল, মুহাম্মদ হিজরত করে মক্কা থেকে মদীনায় চলে গেছেন এবং দু'ব্যক্তি থেকে ব্যবসায়ীদ্বয় জানতে পারল, ইয়ামেনের বাদশাহ 'বাজানের' মাধ্যমে পারস্য সম্রাট কিসরা মুহাম্মদের প্রতি গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। খবর শুনে খুশিতে আত্মহারা হয়ে তারা মক্কাবাসীর কাছে এ আনন্দ-সংবাদ দ্রুত পৌঁছানোর জন্যে ছুটে এল। তারা কুরাইশদের কাছে পৌঁছে বলল :

> 'আপনারা ধন্য হোন, আপনাদের জন্যে আমরা এক চিত্তাকর্ষক শুভসংবাদ নিয়ে এসেছি। মহামান্য পারস্য সম্রাট কিসরা মুহাম্মদকে নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। সুতরাং মুহাম্মদকে আপনাদের ভয় করার আর কোনো কারণ নেই। তার মোকাবেলার জন্যে পারস্য সম্রাটই যথেষ্ট।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী 'বাজান' প্রেরিত ব্যক্তিদ্বয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসন্ধানের জন্যে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। তারা মদীনায় পৌঁছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁর নিকট 'বাজান' প্রেরিত পরোয়ানা হস্তান্তর করল। তারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল :

> 'শাহানশাহ কিসরা ইয়ামেনের বাদশাহ 'বাজানের' কাছে এই মর্মে পত্র লিখেছেন যে, তিনি যেন তাঁর দরবারে আপনাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দু'জন লোক পাঠান। আমরা সে উদ্দেশ্যে এসেছি, যেন আপনাকে কিসরার দরবারে উপস্থিত করতে পারি। আপনি যদি কালবিলম্ব না করে আমাদের সাথে তাঁর দরবারে যেতে সম্মত হন তাহলে আমরা আপনার জন্য সম্রাটের

কাছে এমনভাবে সুপারিশ করব, যাতে আপনার ওপর নির্যাতনের মাত্রা কম হয়। এ কথাগুলো একান্তভাবেই আপনার মঙ্গলের জন্যে বলছি। অন্যথায়, যদি আপনি সেখানে যেতে সম্মত না হন তাহলে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, পরাক্রমশালী পারস্য সম্রাট কিসরা ও তাঁর সৈন্যবাহিনীর ক্রোধের হাত থেকে কোনো শক্তিই আপনাকে ও আপনার জনবলকে রক্ষা করতে পারবে না।'

এ কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটুখানি মুচকি হেসে বললেন :

'আজ তোমরা স্বস্থানে গিয়ে বিশ্রাম কর। আগামীকাল কথা হবে।'

পরের দিন উক্ত দু'ব্যক্তি নির্দিষ্ট সময়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল :

'আপনি কি আমাদের সাথে কিসরার দরবারে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি নিয়েছেন?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জবাব দিলেন :

'তোমরা যে শক্তিধর কিসরার কথা বলছ, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ আর তোমাদের ভাগ্যে নেই। ইতোমধ্যে আল্লাহর গজবে সে ধ্বংস হয়ে গেছে।'

তিনি মাস, তারিখ ও সময়ের উল্লেখ করে বললেন :

'সম্রাট কিসরা তার পুত্র সিরওয়াই কর্তৃক এক রক্তাক্ত অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে এবং নিজের পুত্রের হাতেই নিহত হয়েছে।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে এ কথা শুনে তারা উভয়েই হতভম্ব হয়ে অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। নিমিষেই তাদের চেহারার মধ্যে ভীতির ভাব পরিলক্ষিত হলো। আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায় তারা বলল :

'আমরা কি এ খবর ইয়ামেনের বাদশাহ 'বাজানের' কাছে পৌঁছে দেব?'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'হ্যাঁ, অবশ্যই। তাকে আরো জানিয়ে দাও যে, অচিরেই সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্যে ইসলামের বিস্তার লাভ ঘটবে এবং সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে

তাহলে তাকে ক্ষমতাচ্যুত না করে আমার পক্ষ থেকে ইয়ামেনের বাদশাহ নিযুক্ত করা হবে।'

শক্তিধর পারস্য সম্রাট কিসরার নির্দেশে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জীবিত অবস্থায় ধরে নিতে এসে আশ্চর্যজনকভাবে মানসিক পরিবর্তন নিয়ে উল্টো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতে রূপান্তরিত হয়ে আগন্তুকদ্বয় ইয়ামেনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল।

ইয়ামেনের বাদশাহ 'বাজানের' কাছে উপস্থিত হয়ে তারা তাদের মিশন ব্যর্থ হওয়ার বিস্তারিত কারণসমূহ উপস্থাপন করল। ঘটনাবলি শুনে বাদশাহ বাজান বলল :

'মুহাম্মদের কথা যদি বাস্তবিকই ঠিক হয়ে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি আল্লাহর নবী। আর যদি তা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব।'

কয়েক দিনের এই আলাপচারিতার রেশ কাটতে না কাটতেই পারস্য সম্রাট কিসরার পুত্র সিরওয়াইয়ের বিশেষ দূত এসে ইয়ামেনের বাদশাহর দরবারে উপস্থিত হলো। দূতের মাধ্যমে সিরওয়াই বাদশা 'বাজানের' কাছে তার পিতা কিসরার ক্ষমতাচ্যুতির কথা উল্লেখ করে লিখেছে :

'পারস্যে আমার নেতৃত্বে সাফল্যজনক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করার কারণে আমি সম্রাট কিসরাকে হত্যা করেছি। সে ক্ষমতার অপব্যবহার করে জাতির সম্মানিত গুণীজন, নিষ্পাপ শিশু ও নারীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে চলেছিল। নিরীহ জনগণের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করছিল। এসব কারণে তাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমার এ ফরমান পাওয়ামাত্রই আপনি ও আপনার রাজ-দরবারের সব ব্যক্তি আমার সরকারের আনুগত্য ও বশ্যতা স্বীকারের হলফ নিন।'

ইয়ামেনের বাদশাহ 'বাজান' যখন নবুওয়াতের সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্যে অধীর আগ্রহে পারস্য সম্রাট কিসরার সংবাদ জানার জন্যে অপেক্ষায় ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে অভ্যুত্থানের মাধ্যমে কিসরার হত্যার সংবাদ শুনে সিরওয়াইয়ের প্রতি আনুগত্যের শপথের পরিবর্তে তার মধ্যে এক প্রবল ঈমানী চেতনার সৃষ্টি হলো।

সিরওয়াইয়ের প্রতি আনুগত্যের ফরমান তার সুপ্ত ঈমানী চেতনাকে যেন আগ্নেয়গিরির উদ্‌গীরণে রূপান্তরিত করল। কালবিলম্ব না করে সে স্বতস্ফূর্তভাবে কালেমা শাহাদাতের ঘোষণা দিল :

> 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহূ।'

সাথে সাথে রাজ-দরবারে উপস্থিত ইয়ামেন ও পারস্যের কর্মকর্তারা সমস্বরে কালেমা শাহাদাতের ঘোষণা উচ্চারণ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

অসংখ্য সাহাবীর মধ্য থেকে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্য সম্রাট কিসরাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। ঠিক এমনিভাবে তিনি তদানীন্তন অপর এক শ্রেষ্ঠ পরাশক্তি রোম সম্রাট কায়সারের কাছে ইসলামের ঝাণ্ডাকে বুলন্দ করতে গিয়ে ঈমানের সর্বোচ্চ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার গৌরবে গৌরবান্বিত হয়েছিলেন।

সে ঘটনাটি ঘটে হিজরী উনিশ সালে। আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং কায়সারের মোকাবেলার জন্যে সর্বস্তরের মুসলমানকে আহ্বান জানান। এ আহবানে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও সাড়া দিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

মুসলিম সৈন্যদের ঈমানী চেতনা, দৃঢ় মনোবল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে জীবন বিলিয়ে দেওয়ার প্রচণ্ড জযবার সংবাদ রোমান সম্রাট পূর্ব থেকেই অবহিত হয়েছিলেন। সে তার সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিল :

> 'এই যুদ্ধে একজন মুসলিম সৈন্যকেও যদি বন্দী করা যায় তাহলে তাকে যেন জীবিত অবস্থায় আমার দরবারে উপস্থিত করা হয়।'

ঘটনাক্রমে এ যুদ্ধে অন্যান্য মুসলিম যোদ্ধার সাথে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রোমান সৈন্যদের হাতে বন্দী হন। যুদ্ধের

ময়দান থেকে রোমান সেনাপতি তার সম্রাটের কাছে বিশেষ দূতের মাধ্যমে এ সংবাদ প্রেরণ করে :

'মুহাম্মদের প্রথম যুগের অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অন্যতম বীর যোদ্ধা আবদুল্লাহ বিন হুযাফাকে মহামান্য সম্রাটের দরবারে যুদ্ধবন্দী হিসেবে পাঠাচ্ছি এবং এ জন্যে নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

বিশেষ একটি স্কোয়াডের মাধ্যমে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রোমান সম্রাট কায়সারের দরবারে হাজির করা হয়। সম্রাট তার দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা পূরণের জন্যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমানী দৃঢ়তা পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিল। সম্রাট কায়সার প্রথমেই আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নূরানী চেহারার দিকে বিস্ময়ের সাথে দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে থাকল। এরপর সম্রাট তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন :

'আমি আপনার সমীপে একটি প্রস্তাব রাখতে চাই।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'কী সেই প্রস্তাব?'

সম্রাট কায়সার বলল :

'আমি আশা করি, আপনি ইসলাম পরিত্যাগ করে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবেন। যদি আপনি এ প্রস্তাবে সম্মত হন, তাহলে আপনাকে এখনই মুক্ত করে দেব এবং সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করব।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে উত্তর দিলেন :

'আপনি যে প্রস্তাব করেছেন, এর চেয়ে বরং মৃত্যুকেই আমি হাজার বার মোবারকবাদ জানাই।'

এ কথা শুনে সম্রাট কায়সার বললেন :

'আমি আপনাকে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি মনে করি। আপনি আবার গভীরভাবে ভেবে দেখুন। যদি আপনি আমার আহ্বানে সাড়া দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন, তাহলে আপনাকে আমার ক্ষমতার অংশীদার বানাব এবং আমার সাম্রাজ্যের অর্ধেক আপনাকে দান করব।'

যুদ্ধবন্দী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটু মৃদু হেসে বললেন :

'আল্লাহর শপথ! খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের বিনিময়ে যদি সমগ্র রোমান সাম্রাজ্য এবং এই সাথে সমগ্র আরব বিশ্ব আর তাদের সমস্ত ধনভাণ্ডারও আমার হাতে তুলে দেওয়া হয় তবুও এক পলকের জন্যেও আমি ইসলাম পরিত্যাগ করতে পারি না।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ হতে এরূপ বলিষ্ঠ জওয়াব শুনে সম্রাট কায়সার আশ্চর্য হলো।

প্রলোভন দেখিয়ে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধর্মচ্যুত করতে ব্যর্থ হয়ে চিরাচরিত নির্মম প্রথায় সম্রাট কায়সার তাঁকে প্রাণদণ্ডের হুমকি দিয়ে রাগান্বিত হয়ে বলল :

'এরপরও যদি তুমি ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ না কর তাহলে তোমাকে হত্যা করা হবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আপনার যা ইচ্ছা হয় তা-ই করতে পারেন; কিন্তু আমি এক মুহূর্তের জন্যেও ইসলাম ত্যাগ করতে পারবো না।'

অতঃপর সম্রাট তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানোর নির্দেশ দিল। নির্দেশ মতো আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করানো হলো। এবার সম্রাট তাঁকে ভীতি প্রদর্শনের জন্যে জল্লাদকে রোমান ভাষায় মৃদুস্বরে বলে দিল :

'আসামির হাতের কাছাকাছি একটি তীর যেন নিক্ষেপ করা হয়।'

জল্লাদ তার স্বভাবসুলভ মেজাজে হুংকার ছেড়ে তীব্র গতিতে একটি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি ক্ষীপ্র গতিতে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতের কব্জির পাশ দিয়ে পিছনের কাষ্ঠফলকে গিয়ে বিদ্ধ হলো।

এরপর সম্রাট পুনরায় তাঁকে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানাল; কিন্তু ফাঁসিকাষ্ঠে দণ্ডায়মান আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আগের মতোই নির্ভয়ে এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট এবারও আঞ্চলিক ভাষায় জল্লাদকে পায়ের কাছে তীর নিক্ষেপ করার জন্য নির্দেশ দিল। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি যেন ভীত হয়ে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন।

জল্লাদ এবার পূর্বের তুলনায় অধিক তর্জন-গর্জন করে হুংকার ছেড়ে একটি তীর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে নিক্ষেপ করল। পূর্বের মতো এবারও তীরটি তাঁর পায়ের পাশ ঘেঁষে দূরে গিয়ে বিদ্ধ হলো।

সম্রাট শেষবারের মতো তাঁকে ইসলাম ত্যাগ করার জন্যে আহ্বান জানাল। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পূর্বের মতো এ প্রস্তাবও প্রত্যাখ্যান করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমানী দৃঢ়তা দেখে সম্রাট বিস্মিত ও হতাশ হলো এবং তাঁকে কঠিনতর পরীক্ষার সম্মুখীন করার পরিকল্পনা নিলো। সম্রাট তাঁকে ফাঁসির মঞ্চ হতে নামিয়ে আনার নির্দেশ দিল। অতঃপর বিশালাকার একটি ডেকচি এনে তাতে তেল ফোটাতে বলল। ডেকচিতে ফুটন্ত তেল যখন সাঁ সাঁ আওয়াজ করছিল, তখন সম্রাট দু'জন মুসলিম যুদ্ধবন্দীকে এনে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখের সামনে তাদের একজনকে সেই ফুটন্ত ডেকচিতে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দিল। জল্লাদেরা নির্দেশানুযায়ী তাদের একজনকে এর মধ্যে নিক্ষেপ করল। সাথে সাথে তাঁর সমস্ত শরীর সিদ্ধ হয়ে হাড় থেকে গোশত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে লাগল। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ পৈশাচিক নিষ্ঠুরতম দৃশ্য স্বচক্ষে অবলোকন করলেন।

এবার সম্রাট পুনরায় তাঁকে স্বধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানাল এবং বলল :

'তা যদি করা না হয় তাহলে তোমাকেও এই চরম পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পূর্বের চেয়ে আরও দৃঢ়তার সাথে অত্যন্ত ঘৃণাভরে সম্রাটের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

সম্রাট যখন সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েও আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইসলাম ত্যাগে রাজি করাতে ব্যর্থ হলো, তখন সে হতাশা ও ক্রোধে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও তার দুই সাথী যুদ্ধবন্দীর মতো সেই উত্তপ্ত ডেকচিতে নিক্ষেপের নির্দেশ দিল। জল্লাদেরা যখন তাঁকে ডেকচির দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চোখ থেকে দু'ফোটা অশ্রু নির্গত হলো। এ দেখে তারা দৌড়ে গিয়ে সম্রাট কায়সারকে বলল :

'এবার সে মৃত্যুর ভয়ে কেঁদে ফেলেছে।'

সম্রাট মনে করল, এই দুর্বল মুহূর্তে যদি তাঁকে ধর্মত্যাগের আহ্বান জানানো হয়, তাহলে সে রাজি হতে পারে। তাই সম্রাট তাঁকে পুনরায় তার নিকট নিয়ে আসার জন্যে নির্দেশ দিলেন। পরক্ষণেই আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হলো।

সম্রাট পুনরায় তাকে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার আহ্বান জানাল। শিকল পরিহিত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত মৃত্যু পথযাত্রী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবারও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে সম্রাটের প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করলেন। এরপর সম্রাট বলল :

'ধিক্কার তোমার প্রতি, তুমি যদি মৃত্যুকেই ভয় না পেতে তাহলে কাঁদলে কেন?'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'দেখুন, আমি মৃত্যুর ভয়ে চোখের পানি ফেলিনি; বরং এই একটি মাত্র ডেকচির ফুটন্ত তেলের মাঝে আমাকে নিক্ষেপ করতে চাচ্ছেন, অথচ আমি আশা করেছিলাম যে, আমার শরীরে যতগুলো লোমকূপ রয়েছে ততগুলোই

যদি আমার জীবন হতো এবং এক এক করে সবক'টিকে জলন্ত ডেকচিতে নিক্ষেপের মাধ্যমে আল্লাহর পথে শহীদ হতে পারতাম, তবে আমি হতাম শাহাদাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী। আফসোস! এই মর্যাদা লাভে ব্যর্থ হতে যাচ্ছি মনে করেই আমি চোখের পানি ফেলেছি।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ঈমানী দৃঢ়তা, আল্লাহ ও রাসূলের পথে অবিচল মনোবল প্রত্যক্ষ করে সম্রাট আশ্চর্য হলো। কিন্তু সে তার স্বভাবসুলভ অহঙ্কারের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে অত্যন্ত ক্রোধের সাথে বলল :

'কী স্পর্ধা! আমার গৌরব ও মর্যাদার প্রতি তোমার বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা নেই।'

এদিকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথীদের ত্যাগ ও কুরবানীর যে বর্ণনা সম্রাট পূর্বে শুনেছিল, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আচরণে সম্রাটের কাছে তা বাস্তব প্রমাণিত হলো। অপরদিকে সামান্য একজন যুদ্ধবন্দীর কাছে সম্রাটের শত আবেদন-নিবেদন ও কৌশল সব ব্যর্থ। সম্রাটের জন্যে এটা ছিল আত্মমর্যাদা রক্ষার প্রশ্ন। তাই সম্রাট আত্মমর্যাদা শেষ রক্ষার জন্যে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে সর্বশেষ প্রস্তাব দিল :

'তুমি আমার কোনো প্রস্তাবই গ্রহণ করলে না। যদি তুমি আরবী প্রথা অনুযায়ী সম্মানার্থে আমার মাথায় শুধু একটি চুম্বন দিতে পার তাহলেও আমি তোমাকে মুক্তি দিতে পারি।'

কুটনৈতিক প্রজ্ঞাসম্পন্ন ও বিচক্ষণতার অধিকারী আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ প্রস্তাব শোনামাত্রই একটি শর্ত আরোপ করে বললেন :

'এর বিনিময়ে সম্রাট যদি সকল যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দেন তাহলে এ প্রস্তাব আমি বিবেচনা করে দেখতে পারি।'

সম্রাট তাঁর মর্যাদা রক্ষার শেষ সুযোগটি আর হাতছাড়া করল না। সে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মানিত সাহাবীর বিচক্ষণতা ও কূটনৈতিক প্রজ্ঞায় মুগ্ধ হয়ে বলল :

'হ্যাঁ, তার বিনিময়ে আপনিসহ সকল মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে যথাযথ মর্যাদার সাথে মুক্ত করে দেওয়া হবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'আমি মনে মনে ভাবলাম, আল্লাহর এই দুশমনের মাথায় একটি চুম্বনের বিনিময়ে যদি আমি সমস্ত মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে মুক্ত করিয়ে নিতে পারি তাহলে এতে লজ্জারই বা কী আছে?'

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরবী প্রথানুযায়ী রোমান সম্রাট কায়সারের মাথায় একটি চুম্বন করলেন।

সম্রাট হাফ ছেড়ে বাঁচল। কোনোমতে যেন তার ইজ্জত রক্ষা পেল। হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কূটনৈতিক মর্যাদায় ভূষিত করা হলো। আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সমস্ত মুসলমান যুদ্ধবন্দীকে মর্যাদার সাথে মুক্ত করে আমিরুল মু'মিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দরবারে এসে পৌঁছলেন।

রোমান-সম্রাট কায়সারের দরবারে সংঘটিত নজীরবিহীন ঘটনাবলির বর্ণনা আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবাইকে শোনালেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে এই আশ্চর্যজনক বর্ণনা শুনে এবং তাঁর বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে সদ্যমুক্ত সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন :

حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة وأنا أبْدأُ بذلك ... ثم قام وقبل رأسَهُ... .

'প্রত্যেক মুসলমানেরই উচিত, আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা আস্ সাহামীর মাথায় চুম্বন করা এবং আমি সর্বপ্রথম তাঁর মাথায় চুম্বন করে এ কাজ শুরু করছি............।'

অতঃপর আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাথায় সম্মানসূচক চুম্বন করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবা ফী তামিয আস সাহাবা, ইবনে হাজর, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৮৮ (তুবয়াতু মুহাম্মদ মোস্তফা)।
২. সিরাত ইবনে হিশাম (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৩. হায়াতুস সাহাবা, মুহাম্মদ ইউসুফ আল কান্দাহলোভী, ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৪. তাহজীব আত্ তাহজীব, ৫ম খণ্ড, ১৮৫ পৃ.।
৫. এম তাউল আসমা, ১ম খণ্ড, ৩০৮-৪৪৪ পৃ.।
৬. হুসনুস সাহাবা, ৩০৫ পৃ.।
৭. আল্ মুহাববার, ৭৭ পৃ.।
৮. তারিখুল ইসলাম লিয্ যাহাবী, ২য় খণ্ড, ৮৮ পৃ.।

# উমায়ের ইবনে ওয়াহাব (রা)

*'রাসূলে কারীম (স)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে উমায়ের যখন মসজিদে নববীতে প্রবেশ করছিল, তখন সে আমার নিকট একটি শূকরের চেয়েও ঘৃণিত ছিল। আর ইসলাম গ্রহণের পর সে আজ আমার নিকট আমার কোনো কোনো সন্তানের চেয়েও প্রিয় হয়ে গেল।'*

*–উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু*

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একই জীবনের মধ্যে ছিল দু'টি ধারা। একটি ছিল ইসলাম গ্রহণের পূর্ব-জীবন আর অন্যটি ছিল ইসলাম গ্রহণের পরের জীবন।

তার ইসলাম গ্রহণের পূর্ব-জীবন ছিল অত্যন্ত রোমাঞ্চকর। বদর যুদ্ধে সে ইসলামের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিল; কিন্তু তার তরবারি তাকে মোটেই সাহায্য করতে পারেনি; বরং সে এক পর্যায়ে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল। আল্লাহ তাআলা তাকে ইসলামের জন্যে কবুল করে নিয়েছিলেন বলে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে সে রক্ষা পায়। এ জন্যে সে মক্কায় ফিরে আসতে সমর্থ হয়; কিন্তু তার ছেলে ওয়াহাব মুসলমানদের হাতে বন্দী অবস্থায় মদীনায়ই রয়ে যায়। উমায়ের ইবনে ওয়াহাব আশঙ্কা করেছিল যে, মক্কায় মুহাম্মদের উপর যেমন নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো হয়েছিল, তার ছেলেকে আটকাবস্থায় নির্মম নির্যাতন চালিয়ে তার কৃত অপরাধের প্রতিশোধ নেবে মুসলমানরা। এ দুশ্চিন্তায় উমায়ের ইবনে ওয়াহাব অত্যন্ত অস্থির হয়ে পড়ে।

কোনো এক দুপুরে ছেলের মুক্তির জন্যে প্রার্থনা করার উদ্দেশ্যে সে দেবতাদের জন্যে কিছু ভোগসামগ্রী নিয়ে কাবাগৃহে হাজির হয়। এ সময়ে কুরাইশ সরদার সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া বাইতুল্লাহর সন্নিকটস্থ হাজের নামক স্থানে উপবিষ্ট ছিল, তার সঙ্গে উমায়েরের সাক্ষাৎ ঘটে। তারা পরস্পরে কুশলবিনিময় করে। সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া তখন উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে বলল :

> 'বসো ভাই! কিছু সুখ-দুঃখের কথা বলি, সময় আর কাটছে না। আমাদের কলিজার টুকরাদের মদীনায় বন্দী রেখে মোটেও শান্তিতে ঘুমাতে পারছি না।'

অতঃপর তারা একে অপরের মুখোমুখি বসে বদর যুদ্ধের বিভিন্ন বিভীষিকাময় ঘটনার আলোচনা শুরু করে। আলাপচারিতায় তারা কখনো মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গীদের হাতে যুদ্ধবন্দী কুরাইশদের সংখ্যা নির্ণয় করছিল, আবার কখনো মুসলমানদের তরবারির আঘাতে তাদের নিহত নেতৃবৃন্দের কথা স্মরণ করে ভয়ে শিউরে উঠছিল। যাদের লাশ দিয়ে বদরের পুরানো ডোবাগুলো ভরাট করা হয়েছিল। আলোচনার এক পর্যায়ে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বলল :

> 'আজ আমাদের নেতারা মুসলমানদের হাতে নিহত, যুবকরা তাদের হাতে বন্দী। আল্লাহর কসম! আমাদের বেঁচে থাকার আর কি কোনো সার্থকতা আছে?'

এ কথা শুনে উমায়ের তার কথায় সায় দিয়ে বলল :

> 'তুমি যথার্থই বলেছ। সত্যিই, আমাদের বেঁচে থাকার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই।'

এরপর কিছুক্ষণ নীরব থেকে পুনরায় সে বলল :

> 'এই কাবার মালিকের কসম! আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হতাম অথবা আজ আমার ঋণ পরিশোধ করার মতো কোনো ব্যবস্থা থাকত অথবা আমার অনুপস্থিতিতে সন্তান-সন্ততির অনাহারে মৃত্যুবরণ করার আশঙ্কা না করতাম তাহলে নিশ্চয়ই আমি মদীনায় গিয়ে মুহাম্মদকে এ দুনিয়া থেকে চিরতরে বিদায় করে দিতাম এবং তাঁর মিশনকে স্তব্ধ করে দিয়ে আরববাসীকে এ অত্যাচার হতে মুক্ত করতাম।'

এরপর সে মৃদুস্বরে বলল :

'আমি যদি মদীনায় মুহাম্মদকে হত্যা করতে যাই, তাহলে কেউ আমাকে সন্দেহ করবে না যে, আমি তাঁকে হত্যা করতে এসেছি; বরং সবাই ভাববে যে, আমি আমার বন্দী ছেলের মুক্তির জন্যে তদবির করতে এসেছি।'

সাফওয়ান কালবিলম্ব না করে উমায়েরের ভাবাবেগকে লুফে নিয়ে বলল :

'হে উমায়ের! তোমার সমস্ত ঋণের বোঝা আমার উপর ছেড়ে দাও। পাহাড়সম ঋণকেও আমি পরিশোধ করতে প্রস্তুত। আর তোমার সমস্ত পরিবার-পরিজনকে আজই আমি আমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত করে নিচ্ছি। যতদিন আমি বেঁচে থাকবো ততদিন আমার অর্থ ও ধন- সম্পদের প্রাচুর্য তোমার পরিবারের জন্যে ব্যয়িত হবে।'

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া'র এই তেজোদ্দীপ্ত প্রতিশ্রুতি শুনে উমায়েরের মধ্যকার হিংস্র পশুশক্তি গর্জন করে উঠল। সে সাফওয়ানকে বলল :

'তাহলে আমাদের দু'জনের মধ্যকার এ চুক্তির কথা আর করো কাছে প্রকাশ করো না। আমি আমার কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে বদ্ধপরিকর।'

রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি উমায়েরের হৃদয়ে হিংসার যে আগুন জ্বলছিল, সাফওয়ানের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রতিশ্রুতি তা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। সে অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে কাবাঘর থেকে বাড়ি ফিরল এবং পরিকল্পনাকে সামনে নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ শুরু করল।

যেহেতু কুরাইশদের প্রায় প্রতিটি ঘরের কোনো না কোনো লোক মুসলমানদের হাতে যুদ্ধবন্দী হিসেবে মদীনায় ছিল, সেহেতু কয়েদিদের আত্মীয়-স্বজন সব সময়ই তাদের মুক্ত করার ব্যাপারে মদীনায় আসা-যাওয়া করত। তাই উমায়েরের মদীনা যাওয়াকে মুসলমানেরা কেউই সন্দেহের চোখে দেখবে না বলেই তার বিশ্বাস ছিল।

উমায়ের ইবনে ওয়াহাব পূর্ণ মানসিক প্রস্তুতি সহকারে মদীনা রওয়ানা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল এবং স্বীয় তরবারি আরও শাণিত করে তাতে বিষ মেখে নিলো। অবশেষে সফর সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেল। তাকে বহনকারী উট যতই মদীনার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, উমায়েরের হিংসার আগুন ততই দাউ দাউ করে জ্বলছিল। দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এক পর্যায়ে উটটি মদীনায় মসজিদে নববীর কাছে এসে পৌছল। উমায়ের সেখানে অবতরণ করে তার

বিষাক্ত তরবারি নিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোঁজার জন্যে মসজিদে নববীতে প্রবেশ করল।

এদিকে উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মসজিদে নববীর দরজার নিকট বসে কিছুসংখ্যক সাহাবীর সাথে বদরের যুদ্ধবন্দী ও মৃত কুরাইশদের নেতৃত্বের পরাজয়ের ঘটনাবলি, মুসলমানদের সাহসিকতা ও বীরত্বের বর্ণনা এবং আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ মুখ ফেরাতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, অস্ত্রসজ্জিত উমায়ের ইবনে ওয়াহাব মসজিদে নববীতে প্রবেশ করছে। তিনি চমকে উঠলেন এবং তার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে চিৎকার করে বলে উঠলেন :

> 'আল্লাহর দুশমন, উমায়ের ইবনে ওয়াহাব। নিশ্চয়ই কোনো খারাপ মতলব নিয়ে এ মসজিদে প্রবেশ করছে। এই সেই ব্যক্তি, যে মক্কায় আমাদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের লেলিয়ে দিয়েছিল এবং বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে গুপ্তচরবৃত্তির কাজে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। সে কোনো মহৎ উদ্দেশ্যে এখানে আসতে পারে না।'

এই বলে তিনি উপস্থিত সাহাবীদের তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারদিকে অবস্থান গ্রহণ করার নির্দেশ দিলেন এবং ঐ ব্যক্তির নাশকতামূলক কাজ সম্পর্কে সবাইকে সতর্ক থাকার জন্যে বললেন।

অতঃপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বললেন :

> 'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর দুশমন উমায়ের ইবনে ওয়াহাব অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করেছে। নিশ্চয়ই তার কোনো কুমতলব রয়েছে।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

> 'তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ আদেশ শোনার পর উমায়েরের কাছে ফিরে গিয়ে এক হাতে উমায়েরের তরবারি এবং অন্য হাতে তার জামার কলার ধরে টেনে-হেঁচড়ে নিয়ে এলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দৃশ্য দেখে উমায়েরকে ছেড়ে দিয়ে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়াতে বললেন।

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উমায়ের ইবনে ওয়াহাবকে নিকটে ডাকলেন। উমায়ের এসে জাহিলী নিয়মে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

'শোনো উমায়ের, আল্লাহ আমাকে তোমাদের সালামের চেয়ে আরও উত্তম সালাম দিয়ে সম্মানিত করেছেন। এ সালাম হলো বেহেশতের সালাম, আস্সালামু আলাইকুম।'

উমায়ের বলল :

'কই, খুব বেশি পার্থক্য তো মনে হচ্ছে না; কিছুদিন আগেও তো এটাই ছিল আপনার সালাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'উমায়ের! কী উদ্দেশ্যে তুমি এখানে এসেছ?'

উমায়ের বলল :

'যুদ্ধবন্দীদের মুক্ত করার জন্যে এসেছি। আশা করি, এ ব্যাপারে আপনি আমাকে সার্বিক সহযোগিতা দান করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'বন্দীমুক্তির উদ্দেশ্যেই যদি এসে থাকো, তাহলে অস্ত্রসজ্জিত অবস্থায় কেন?'

উমায়ের বলল :

'আল্লাহ এ তলোয়ারকে ধ্বংস করুন! বদরে এ তলোয়ার কি আমাদের কোনো কাজে এসেছে?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'উমায়ের! সত্যি করে বলো, কী উদ্দেশ্যে তুমি এসেছ?'

উমায়ের বলল :

'বিশ্বাস করুন, দ্বিতীয় কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আমি এখানে আসিনি।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'উমায়ের! তুমি এবং সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া খানায়ে কাবার হাজের নামক স্থানে বসে বদর যুদ্ধের পরাজয় সম্পর্কে কি কখনো আলোচনা করছিলে? তখন কি তুমি বলনি যে,

'আমি যদি ঋণগ্রস্ত না হতাম, অথবা সন্তান-সন্ততি আমার উপর নির্ভরশীল না হতো, তাহলে আমি মুহাম্মদকে হত্যার উদ্দেশ্যে অবশ্যই মদীনায় রওয়ানা হতাম।'

তোমার এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে সাফওয়ান ইবনে উমায়ের আমার হত্যার বিনিময়ে তোমার ঋণ এবং সন্তান-সন্ততির সব দায়-দায়িত্ব কি গ্রহণ করেনি? তোমরা দু'জন হয়তো মনে করেছিলে যে, তোমরা ব্যতীত এ কথাগুলো আর কেউ শোনেনি। অথচ তোমাদের উভয়ের মাঝে আল্লাহ বিদ্যমান ছিলেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ থেকে এ কথা শুনে উমায়ের হতভম্ব হয়ে গেল এবং নির্বিকারে তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল :

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আল্লাহর পক্ষ হতে যে পয়গাম নিয়ে এসেছেন, আমরা তাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম; কিন্তু আমার এবং সাফওয়ানের মাঝে যে কথোপকথন হয়েছিল, তা আমরা দু'জন ব্যতীত আর কেউই জানত না। আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই আল্লাহ আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেছেন। আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি কোনো না কোনোভাবে আমাকে আপনার কাছে এনে ইসলামের আলো দিয়ে আলোকিত করেছেন। আমি এখন আর আপনার দুশমন উমায়ের ইবনে ওয়াহাব নই; বরং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 'আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

এ ঘোষণার মাধ্যমেই উমায়ের ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। তৎক্ষণাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের এই বলে নির্দেশ দিলেন :

"فَقِّهُوْا أَخَاكُمْ فِىْ دِيْنِهِ ، وَعَلِّمُوْهُ الْقُرْاٰنَ ، وَاَطْلِقُوْا أَسِيْرَهُ".

'তোমাদের এই ভাইকে দীন সম্পর্কে জ্ঞান দাও, তাকে কুরআন শিক্ষা দাও এবং তার বন্দীদের মুক্ত করে দাও।'

উমায়েরের ইসলাম গ্রহণের সংবাদে মদীনার মুসলমানদের মধ্যে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এমনকি উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেই ফেললেন :

لَخِنْزِيْرٌ كَانَ أَحَبَّ اِلَىَّ مِنْ عُمَيْرِ بْنِ وَهْبٍ حِيْنَ قَدِمَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ الْيَوْمَ اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ بَعْضِ اَبْنَائِىْ .

'ইসলাম গ্রহণের পূর্বে উমায়ের ইবনে ওহাব আমার নিকট একটি শূকরের চেয়েও ঘৃণিত ছিল; কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর সে আমার নিকট আজ আমার কোনো কোনো সন্তানের চেয়েও অধিকতর প্রিয়।'

উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যে এ বিপ্লবী পরিবর্তনের পর থেকে তিনি ইসলামী শিক্ষায় নিজেকে পরিশুদ্ধ করার সর্বাত্মক চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। আল কুরআনের আলোকে তাঁর জীবনকে আলোকিত করতে থাকেন। আল্লাহ ও রাসূলের (স) ভালোবাসায় তিনি এতই নিমগ্ন হয়ে যান যে, মক্কায় রেখে আসা তাঁর প্রিয় সন্তান-সন্ততির মায়াও ভুলে গেলেন।

এদিকে সাফওয়ান বিন উমাইয়া কুরাইশদের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগল এবং বলতে শুরু করল :

'হে কুরাইশরা অপেক্ষা করো, সেদিন আর বেশি দূরে নয়, যেদিন আমি তোমাদের এমন একটি শুভসংবাদ শোনাবো, যা তোমাদের বদরের পরাজয়ের গ্লানি ভুলিয়ে দেবে।'

সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া উমায়েরের হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হত্যার খবর শোনার জন্যে অধীর আগ্রহে মদীনার পানে চাতকপাখির মতো তাকিয়ে রইল। যতই দিন যাচ্ছিল, এ সংবাদ শোনার জন্য সাফওয়ান ততই অস্থির হয়ে উঠছিল। তার উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা ছিল সীমাহীন। কবে শুনবে সে সংবাদ, যা শোনার জন্যে সে পাঠিয়েছে উমায়েরকে মদীনায়। মদীনা হতে আগন্তুকদের কাছে উমায়ের ইবনে ওয়াহাব সম্পর্কে জানার জন্যে সাফওয়ান উদগ্রীব হয়ে উঠল। কিন্তু কেউই তাকে উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে কোনো খবর দিতে পারছিল না। পরিশেষে, কোনো এক আগন্তুক সাফওয়ান ইবনে উমাইয়াকে সংবাদ পৌঁছে দিল :

'তুমি যার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছো, সেই উমায়ের ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে।'

এ সংবাদ সাফওয়ানের মাথায় বজ্রপাতের মতো মনে হলো। তার ধারণা ছিল :

'পৃথিবীর সকল মানুষ ইসলাম গ্রহণ করলেও উমায়ের ইবনে ওয়াহাব তা গ্রহণ করতে পারে না।'

উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এদিকে দীনের জ্ঞান ও পবিত্র কালামে পাকের হিফয করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন।

একদা তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি জীবনের দীর্ঘ সময় আল্লাহর নূরকে নির্বাপিত করতে এবং ইসলাম গ্রহণকারীদের উপর কঠিন নির্যাতন ও অত্যাচারের কাজে ব্যয় করেছি। আপনি আমাকে অনুমতি দিলে আমি মক্কায় গিয়ে কুরাইশদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে আহ্বান জানাব। তারা যদি আমার দাওয়াত কবুল করে তাহলে তাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি তারা তা প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আমি তাদের দীন সম্পর্কে এমন উচিত শিক্ষা দেব, যেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের তারা দিয়েছিল।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কায় গিয়ে ইসলামের দাওয়াত প্রচারের অনুমতি দিলেন। উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কায় গিয়ে সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার ঘরে প্রবেশ করে বললেন :

'হে সাফওয়ান, তুমি মক্কার নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে অন্যতম নেতা এবং কুরাইশদের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অন্যতম বুদ্ধিজীবী। তোমরা পাথরপূজা ও পাথরের মূর্তির জন্যে যা করে থাকো, সবই ধোঁকা। কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি কি এটাকে দীন বলে বিশ্বাস করতে পারে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নেই আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল।'

উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কায় এসে আল্লাহর পথে মক্কাবাসীকে দাওয়াত দিতে আরম্ভ করলেন। তাঁর হাতে অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন উমায়ের রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উত্তম পুরস্কার দান করুন এবং তাঁর কবর নূর দ্বারা আলোকিত করুন। আমীন।

---

উমায়ের বিন ওয়াহাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. হায়াতুস সাহাবা -৪র্থ খণ্ড সূচিপত্র দ্র:।
২. সীরাতে ইবনে হিশাম -সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৩. আল ইছাবা -৬০৬০ নং জীবনী।
৪. তাবাকাত ইবনে সা'দ-৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৪৬।

# বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী (রা)

*'বারা''আ বিন মালেককে যেন কখনো মুসলিম বাহিনীর কোনো সালারের দায়িত্বে নিয়োগ না করা হয়। কেননা সে তার দ্রুতগামী পদক্ষেপ দ্বারা তাঁর বাহিনীকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দিতে পারে।'*

*–খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারুক (রা)*

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ খাদেম, জালীলুল কদর সাহাবী আনাস বিন্ মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছোট ভাই ছিলেন বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী। তিনি অত্যন্ত হালকা-পাতলা গড়নের ছিমছাম চেহারাবিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। মাথায় ছিল কোঁকড়ানো চুল। অদম্য সাহসী ও অগ্রাভিমুখী দ্রুতগামী আক্রমণে অভ্যস্ত বীর যোদ্ধা। এই যুবক সাহাবী ছিলেন। এতোই হালকা-পাতলা, দেখলে মনে হতো খুবই দুর্বল অথচ তাঁর বুদ্ধিমত্তা, অদম্য সাহসিকতা, প্রবল ঈমানী চেতনা ও অসাধারণ সমরকৌশল, যা মানুষকে তাক লাগিয়ে দিয়ে রীতিমতো ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে আছে।

এই ক্ষীণ দেহের অধিকারী বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী কেবল মল্লযুদ্ধেই শতাধিক মুশরিক যোদ্ধাকে জাহান্নামে প্রেরণ করেন। তিনি মল্লযুদ্ধ ছাড়াও সম্মুখ সমরে যে কত কাফির ও মুশরিককে জাহান্নামে পাঠিয়ে ইসলামের বিজয়কে ছিনিয়ে এনেছেন তার ইয়ত্তা নেই। যুদ্ধের দামামা তাঁর রক্তে এমন

ক্ষিপ্রতা ও তেজস্বিতার সৃষ্টি করত যে, তিনি নিজ দল-বল পিছনে রেখে একাই শত্রুপক্ষের প্রাচীর ভেদ করে সম্মুখপানে দু'মুখো তলোয়ার দিয়ে ক্ষিপ্র গতিতে এগিয়ে যেতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁর এই ব্যাকুল অগ্রগামিতা লক্ষ্য করে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর প্রতি এক বিশেষ বিধি-নিষেধ আরোপ করেন। তিনি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের গভর্নরদের কাছে এই বলে ফরমান জারি করেন :

"أَلَّا يُوَلُّوْهُ عَلٰى جَيْشٍ مِّنْ جُيُوْشِ الْمُسْلِمِيْنَ، خَوْفًا مِنْ أَنْ يُّهْلِكَهُمْ بِإِقْدَامِهٖ".

'বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে কোনো বাহিনীর দায়িত্ব যেন দেওয়া না হয়। কারণ আমি আশংকা করি যে, শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারীর যুদ্ধ করার যে মানসিকতা রয়েছে, যার ফলে তার অধীনস্থ সমগ্র বাহিনীই শত্রু বাহিনীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে সমূহ বিপদের সম্মুখীন হতে পারে।'

বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইতিহাস সৃষ্টিকারী অসংখ্য ঘটনাবলির মধ্যে একটিমাত্র ঘটনা প্রিয় পাঠকদের খিদমতে পেশ করা হচ্ছে :

বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাহসিকতার পরিচয় ফুটে উঠে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর। যখন নবদীক্ষিত মুসলমানরা যেভাবে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন সেভাবেই না বুঝে দলে দলে ভণ্ডনবীদের দলে শামিল হচ্ছিল। ইসলামের এই চরম দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ যাদের দৃঢ় মনোবল এবং ঈমানী মযবুতি দান করেছিলেন, শুধু তারা ব্যতীত অন্য সকলেই মুরতাদদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। তায়েফ, মক্কা ও মদীনাসহ এর পার্শ্ববর্তী বিক্ষিপ্ত কিছু গোত্র ছাড়া বাকি সর্বত্রই এই ফিতনা ব্যাপকভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল।

এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইসলামের হেফাযতের জন্যে আমীরুল মুমিনীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চতুর্মুখী ফিতনা মোকাবেলার যোগ্যতা ও দৃঢ়তা দান করেন। তিনি পাহাড়সম অটল হয়ে

একাধারে যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের এবং ভণ্ড নবী ও তাদের অনুসারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। আনসার এবং মুহাজিরদের সমন্বয়ে তিনি সশস্ত্র এগারোটি বিশেষ বাহিনী তৈরী করে প্রত্যেক বাহিনীর জন্যে আলাদা আলাদা ঝাণ্ডা নির্ধারণ করলেন। ভণ্ড নবীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে বিপথগামী ও ধর্মত্যাগী মুরতাদদের ইসলামে প্রত্যাবর্তনের জন্যে এসব বাহিনীকে আরব বিশ্বের চতুর্দিকে প্রেরণ করেন।

ভণ্ড নবী ও তাদের অনুসারী মুরতাদদের সবচেয়ে শক্তিশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দল ছিল বনূ হানীফা সম্প্রদায়ের মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের। মুসায়লামাতুল কায্‌যাব তার নিজস্ব গোত্র এবং সন্ধিতে আবদ্ধ সম্প্রদায়সমূহের সুদক্ষ চল্লিশ হাজার যোদ্ধার এক বিশাল বাহিনী গড়ে তুলেছিল। এই বাহিনী ইসলামের জন্য বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যাদের অধিকাংশই ছিল সংকীর্ণ ভৌগোলিক ও বংশীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। যারা ইসলামী শিক্ষা ও মূল্যবোধের পরিবর্তে গোত্রীয় গোঁড়ামি, সংকীর্ণতা ও আঞ্চলিকতার শিকারে পরিণত হয়েছিল। তাদের মতে, অনেকের ভাষ্য ছিল :

"أَشْهَدُ أَنَّ مُسَيْلَمَةَ كَذَّابٌ، وَمُحَمَّدًا صَادِقٌ ... لَكِنَّ كَذَّابَ رَبِيعَةَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ صَادِقِ مُضَرَ".

'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিঃসন্দেহে মুসায়লামাতুল কায্‌যাব একজন ভণ্ড নবী এবং মুহাম্মদ সত্য নবী; কিন্তু আমাদের কাছে কুরাইশ বংশের সত্য নবীর চেয়ে স্বগোত্রীয় ভণ্ডনবী ও মিথ্যাবাদী মুসায়লামাতুল কায্‌যাবই ভালো।'

আমীরুল মু'মিনীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের মোকাবেলা করার জন্যে আবূ জাহলের ছেলে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে যে বাহিনী পাঠিয়েছিলেন, প্রচণ্ড হামলার মুখে তারা পরাজিত হয়ে পশ্চাদপসরণ করতে বাধ্য হয়। অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খালিদ বিন্ ওয়ালিদের নেতৃত্বে আনসার এবং মুহাজির সাহাবাদের মধ্যে বিশিষ্ট যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত যে বাহিনী প্রেরণ করেন, তাদের মধ্যে বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কায্‌যাব এবং তার অনুসারীদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে পুনরায় ইসলামে দীক্ষিত করার জন্যে সাহাবী যোদ্ধাদের নেতৃত্বে এই বিশেষ বাহিনী নিয়ে দ্রুতগতিতে নাজদের 'ইয়ামামা' নামক প্রান্তরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মুহূর্তের মধ্যেই উভয় পক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হলো। যুদ্ধ শুরুর প্রায় সাথে সাথেই মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের বিশাল বাহিনী মুসলিম বাহিনীকে কাবু করে ফেলে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, সুশৃঙ্খল মুসলিম বাহিনীর পায়ের নিচের মাটি যেন ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছিল। নিজেদের অবস্থান থেকে ক্রমেই তারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছিল। এই নাজুক মুহূর্তে মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের বাহিনী অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি খালিদ বিন্ ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তাঁবুতে হামলা করে তাঁবুর খুঁটি উপড়ে ফেলে। এমনকি সেখানে অবস্থানরত খালিদ বিন্ ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রীকে হত্যার জন্যে উদ্যত হলে মুসায়লামাতুল কায্‌যাব বাহিনীরই একজন যোদ্ধা জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী 'যুদ্ধক্ষেত্রে শিশু ও নারীদের হত্যা করা কাপুরুষোচিত ও গর্হিত কাজ'– এ কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে নিরাপত্তা দিয়ে রক্ষা করে।

এ চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় মুসলিম যোদ্ধারা নিশ্চিত পরাজয়ের আশঙ্কায় ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা এ কথা মনে করছিলেন যে, মুসায়লামাতুল কায্‌যাবের কাছে আজ পরাজয়ের পর এই আরব বিশ্বে ইসলামের নাম উচ্চারণ করার মতো আর কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট থাকবে না। শিরকমুক্ত এই জাযীরাতুল আরবে তাওহীদের বাণী উচ্চারণ ও আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আর কেউ সাহস করবে না।

সেনাপতি খালিদ বিন্ ওয়ালিদের নিজের তাঁবু আক্রান্ত হওয়ার পর এই চরম নাজুক মুহূর্তে খালিদ বিন্ ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিক্ষিপ্ত মুসলিম বাহিনীকে তৎক্ষণাৎ পুনর্গঠিত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সাথে সাথে তিনি মুহাজির, আনসার, শহরবাসী ও মরুবাসী বেদুইন যোদ্ধাদের ভিন্ন ভিন্ন রেজিমেন্টে বিভক্ত করে প্রত্যেক রেজিমেন্টের জন্যে স্বগোত্রীয় উপ-সেনাপতি ও ভিন্ন ভিন্ন ঝাণ্ডা নির্ধারণ করেন। যেন প্রত্যেক বাহিনী স্বীয় অস্তিত্বের স্বার্থেই শত্রু বাহিনীর মোকাবেলায় মরণপণ চেষ্টা চালায় এবং কোন্ সেক্টর থেকে দুর্বলতা প্রকাশ পায় তাও চিহ্নিত করা সহজ হয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই উভয় বাহিনীর মাঝে পুনরায় প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে গেল। ভয়াবহ সে যুদ্ধ! মুসলিম যোদ্ধারা এর পূর্বে এমন মারাত্মক কোনো সংঘর্ষ কখনও প্রত্যক্ষ করেননি। এবার বীর বিক্রমে মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারা মুসায়লামাতুল কায্যাব বাহিনীর যোদ্ধাদের ধরাশায়ী করে ইয়ামামার ময়দান লাশের স্তূপে পরিণত করে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। অপরপক্ষে, মুসায়লামাতুল কায্যাবের বাহিনী তাদের এই মারাত্মক ক্ষয়-ক্ষতি প্রত্যক্ষ করেও যুদ্ধ ময়দানে তখনও পাহাড়ের মতো অটল হয়ে মুসলমানদের মোকাবেলা অব্যাহত রাখল। মুসলিম যোদ্ধারা ঈমানী চেতনায় বলীয়ান হয়ে যুদ্ধের ক্ষিপ্রতাকে আরও তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলছিল।

ছাবিত বিন্ কায়েস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম যোদ্ধাদের মধ্যে আনসার বাহিনীর ঝাণ্ডাবরদার (পতাকাবাহক) ছিলেন। তিনি যুদ্ধের এই তীব্রতা লক্ষ্য করে তার পরিচালিত বাহিনীর এই ঝাণ্ডাকে পিছনে সরিয়ে নিতে হতে পারে, তা আঁচ করে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ ময়দানে তাঁর দু'পায়ের হাঁটু পর্যন্ত মাটির নিচে গেড়ে ফেললেন। মুহূর্তেই শত্রু সৈন্যরা তার বহনকৃত ঝাণ্ডাকে ভূলুণ্ঠিত করার জন্যে তার ওপর আঘাত হানতে শুরু করল। তিনি একহাতে ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রেখে অন্যহাতে তরবারি চালনা করে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে করতে এক পর্যায়ে দুশমনের তরবারির আঘাতে দ্বিখণ্ডিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

যুদ্ধের এই তীব্রতা ও প্রচণ্ডতার মাঝে মুহাজির বাহিনীর মধ্য হতে আমিরুল মু'মিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই যায়েদ ইবনুল খাত্তাব দুশমনের উপর আরও তীব্র গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে মোহাজিরদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলছিলেন :

"أَيُّهَا النَّاسُ! عَضُّوْا عَلَى أَضْرَاسِكُمْ ، وَاضْرِبُوْا فِيْ عَدُوِّكُمْ وَامْضُوْا قُدُمًا ... أَيُّهَا النَّاسُ! وَاللّٰهِ، لَا أَتَكَلَّمُ بَعْدَ هٰذِهِ الْكَلِمَةِ أَبَدًا حَتّٰى يُهْزَمَ مُسَيْلَمَةُ أَوْ أَلْقَى اللّٰهَ فَأُدْلِيَ إِلَيْهِ بِحُجَّتِيْ...".

'হে মুসলিম যোদ্ধারা! আরও ক্ষীপ্র গতিতে আঘাত হানো, সম্মুখপানে অগ্রসর হও, শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো, হে যোদ্ধারা জেনে রাখো, এটাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ আহ্বান। হয় আজ মুসায়লামাতুল কায্যাবকে

নিশ্চিহ্ন করবো অথবা শহীদ হয়ে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে নিজের অপারগতা পেশ করবো।'

এ আহ্বানের সাথে সাথেই সমস্ত মুসলিম মুজাহিদ নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে শুরু করল। যায়েদ বিন্ খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দু'হাতে তরবারি চালাতে চালাতে ক্ষীপ্রগতিতে দুশমনদের মাঝে ঢুকে পড়লেন। অসংখ্য মুরতাদদের ধরাশায়ী করার এক পর্যায়ে শত্রুর আঘাতে তিনি শাহাদাতের কোলে ঢলে পড়ে তার কৃত ওয়াদাকে বাস্তবে প্রমাণিত করেন।

আবূ হুযায়ফার কৃতদাস সালেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উপর মুহাজির বাহিনীর ঝাণ্ডা বহন করার দায়িত্ব অর্পিত হয়। মুহাজিরদের অনেকেই তার প্রতি আশঙ্কা পোষণ করছিলেন যে, যুদ্ধের ভয়াবহতার কারণে তিনি সন্ত্রস্তবোধ করবেন। তারা তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'আমরা আশঙ্কা করছি যে, তুমি যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় ভীত হয়ে পশ্চাদপসরণ না করে বসো।' এবং এই সুযোগে শত্রুবাহিনী আমাদের ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা না করুক।

প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন :

'আমি যদি এ যুদ্ধে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করি তাহলে আমার চেয়ে নিকৃষ্টতম হাফেযে কুরআন আর কে হতে পারে?'

অতঃপর তিনি বীর বিক্রমে দুশমনদের প্রতি আঘাত হানতে হানতে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুরতাদদের তরবারির আঘাতের পর আঘাতে তার গোটা শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে যায়; কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি ইসলামের ঝাণ্ডাকে এক মুহূর্তের জন্যে ভূলুণ্ঠিত হতে দেননি।

কিন্তু এ যুদ্ধে বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বীরত্বের কাছে এসব ঘটনা একেবারে নগণ্য বলে মনে হবে। খালিদ বিন্ ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উভয় পক্ষের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এই প্রচণ্ডতার মধ্যে চূড়ান্ত আঘাতের মাধ্যমে ইসলামের বিজয় ছিনিয়ে আনার জন্যে বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উদ্দেশ্য করে বলেন :

'দুশমনদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ো হে আনসার যুবক .... '।

খালিদ ইবনে ওয়ালিদের এই নির্দেশ পেয়ে বারা'আ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীর যোদ্ধাদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন :

يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ! لَا يُفَكِّرَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِالرُّجُوْعِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَا مَدِيْنَةَ لَكُمْ بَعْدَ الْيَوْمِ ... وَإِنَّمَا هُوَ اللّٰهُ وَحْدَهُ ... ثُمَّ الْجَنَّةُ.

'হে আনসার ভাইয়েরা! কখনো আপনারা মদীনায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা করবেন না। এ মুহূর্ত হতেই আপনাদের জন্যে আর মদীনা নয়; আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তাওহীদের বাণীকে চিরসমুন্নত করে জান্নাতের দিকে অগ্রসর হোন।'

এই বলে তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বারা'আ ইবনে মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দক্ষতার সাথে দু'ধারী তরবারি চালিয়ে তাঁর দু'পার্শ্বের দুশমনদের ধরাশায়ী করে সম্মুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। মুসায়লামাতুল কায্যাবের যোদ্ধাদের শিরশ্ছেদ করতে করতে তিনি এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস সৃষ্টি করলেন। এ আঘাতে মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তাঁর বাহিনীর মধ্যে হঠাৎ ভীতি ও ত্রাসের সৃষ্টি হলো। অবস্থা বেগতিক দেখে তারা যুদ্ধ ময়দান সংলগ্ন বাগানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হলো। যে বাগানটি পরবর্তী সময়ে অগণিত মৃতদেহের স্তূপের কারণে 'হাদীকাতুল মাউত' বা 'লাশের বাগান' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নানাবিধ ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে বাগানটি উঁচু ও প্রশস্ত দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত ছিল। যুদ্ধে নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে প্রাণ রক্ষার জন্যে মুসায়লামাতুল কায্যাব ও তাঁর অনুসারী যোদ্ধারা এ বাগানে আশ্রয় নিয়ে দ্রুত এর একমাত্র গেটটি বন্ধ করে দেয়। এভাবে নিজেরা নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে তার ভিতর থেকে মুসলমান বাহিনীর উপর বৃষ্টির মতো তীর বর্ষণ শুরু করে। এতে মুসলমানদের নিশ্চিত বিজয় আবার অনিশ্চয়তার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়। মুসলিম যোদ্ধাদের পক্ষে তাদের মোকাবেলা করার সমস্ত পথ যেন রুদ্ধ হয়ে আসে। এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর অন্যতম বীর সিপাহসালার বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধের কৌশল পরিবর্তনের মাধ্যমে শত্রুদের প্রতি এক চরম ও শেষ আঘাত হানার জন্যে পরিকল্পনা নেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একটি ঢাল সংগ্রহ করে তাঁর বাহিনীর লোকদের

উদ্দেশ্য করে বললেন :

> 'আমি এ ঢালের উপরে বসে পড়ি, তোমরা আমাকে উঁচুতে উঠিয়ে ১০/১২টি বর্শা ফলকের সাহায্যে উপরে তুলে এ গেটের ভিতরে নিক্ষেপ কর। হয় আমি দুশমনদের হাতে শহীদ হয়ে যাবো অথবা ভিতরে গিয়ে তোমাদের জন্যে এ বাগানের গেট খুলে দেব।'

দেখতে না দেখতেই বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উন্মুক্ত তরবারি হাতে তার ঢালটির উপর বসে পড়লেন। অত্যন্ত হালকা-পাতলা ও ছিপ ছিপে আনসার যুবক বারা'আকে কয়েকজনে খুব সহজেই ঢালে বসিয়ে মাথার উপর তুলে নিলেন এবং সাথে সাথে অন্য কয়েকজন বর্শাধারী তাদের বর্শা ফলকে তাকে উপরে তুলে গেটের ভিতরে মুসায়লামাতুল কায্যাবের হাজার হাজার অনুগত যোদ্ধার মাঝে সজোরে নিক্ষেপ করলেন। বারা'আ অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মাঝে বজ্রপাতের ন্যায় লাফিয়ে পড়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে গেট রক্ষী বাহিনীর উপর আক্রমণ শুরু করলেন। অন্যদিকে মুসায়লামাতুল কায্যাবের দুর্ধর্ষ সৈন্যরা চতুর্দিক থেকে ভিমরুলের মতো তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তলোয়ার, বর্শা এবং তীরের উপর্যুপরি আঘাত তাঁর গোটা দেহকে ক্ষত বিক্ষত করে ফেলল; কিন্তু বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের গেটরক্ষী বেষ্টনির দশজনকে হত্যা করে পরিশেষে গেট খুলে দিতে সমর্থ হলেন।

এদিকে সাথে সাথে অপেক্ষমাণ বীর মুসলিম যোদ্ধারা 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে বাঁধভাঙা স্রোতের মতো ভিতরে ঢুকতে শুরু করলেন। যা ছিল এক নজীরবিহীন ভয়াল চিত্র! মুহূর্তেই উভয়পক্ষের মধ্যে পুনরায় ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। মুসলমানদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে মুসায়লামাতুল কায্যাবের বাহিনী প্রাণ ভয়ে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে লাগল আর মুসলিম যোদ্ধারা এ সুযোগে তাদেরকে দলে দলে নিঃশেষ করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। এমনকি শেষ পর্যন্ত সেখানে মুসায়লামাতুল কায্যাবের অবশিষ্ট বিশ হাজার সৈন্যের কবর রচনা করে তার দেহরক্ষী বাহিনীসহ তাকে ঘিরে ফেলে সবাইকে জাহান্নামের অতল গহবরে নিক্ষেপ করা হলো। সমস্ত বাগান বিশ হাজার মুরতাদের লাশের স্তূপে পরিণত হয়ে গেল।

অন্যদিকে এই দুঃসাহসী বীর যোদ্ধা বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি এ গেট খুলতে গিয়ে আশিটির অধিক তীর, বর্শা

ও তরবারির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলেন, তাঁকে বিশেষ চিকিৎসার জন্যে চিকিৎসা তাঁবুতে প্রেরণ করা হলো। খালিদ বিন্ ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘ এক মাস ধরে নিজে বারা'আ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে নিয়োজিত থাকলেন। ধীরে ধীরে বারা'আ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর এই মহান ত্যাগ এবং কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁরই হাতে মুসলমানদের এ যুদ্ধে বিজয় দান করে জাযীরাতুল আরবকে চিরদিনের জন্যে ভণ্ডনবী ও মুরতাদদের হাত থেকে পবিত্র করলেন।

মুসায়লামাতুল কায্যাব বাহিনীর সাথে ইয়ামামার প্রান্তরে 'হাদীকাতুল মাউতের' রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে শাহাদাতের মৃত্যুর গৌরব থেকে মাহরুম হয়ে বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের তামান্নায় পরবর্তীতে একের পর এক সকল যুদ্ধে বীরত্বের সাথে অংশগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনের সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা যে, তিনি যেন শাহাদাতের মৃত্যুর মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জান্নাতে মিলিত হতে পারেন।

সর্বশেষে তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের সাথে মুসলমানদের 'তুস-তর' কেল্লা বিজয়ের জিহাদে অংশ গ্রহণ করেন। সেই রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের এক পর্যায়ে পারস্য সৈন্যরা দুর্ভেদ্য 'তুস-তর' কেল্লায় আশ্রয় নিয়ে ভিতর থেকে এর বিশাল গেটটি বন্ধ করে দেয়। মুসলিম যোদ্ধারা এই কেল্লার চারপার্শে অবস্থান নিয়ে কেল্লাটিকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। ধীরে ধীরে সব রসদ ও সরঞ্জামাদি নিঃশেষ হয়ে আসলে পারস্য বাহিনী জীবন রক্ষার লড়াইয়ে এক ধ্বংসাত্মক কৌশল অবলম্বন করে। তারা লম্বা শিকলের মাথায় মাছ ধরা বড়সির মতো লৌহ নির্মিত বড় বড় আংটাগুচ্ছ আগুনে পুড়িয়ে লাল করে নেয়। কেল্লার উপর থেকে মুসলমানদের উপরে তা নিক্ষেপ করে। প্রাচীর টপকে ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করা মাত্রই তাতে আটকিয়ে যাওয়া মুসলিম যোদ্ধাদের ক্রেনের মতো উপরে টেনে তুলে নিতে শুরু করে। এভাবে বেশ ক'জন মুসলিম যোদ্ধা আগুনে পোড়ানো আংটার নির্মম শিকারে পরিণত হন। অকস্মাৎ একটি আংটাগুচ্ছ বারা'আ বিন্ মালেকের বড় ভাই আনাস বিন্ মালেক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দেহে বিঁধে তাকে তুলে নিতে শুরু করে। বারা'আ বিন মালেক আল আনসারী কালবিলম্ব না করে এক লাফে এক হাতে শিকলটিকে ধরে ফেলে, ঝুলন্ত অবস্থায় অন্য হাতে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা

আনহুর শরীরে বিদ্ধ গরম আংটা খুলতে শুরু করেন। লাল টকটকে পোড়া আংটার দাহে তাঁর হাতের গোশ্‌ত পুড়ে ধোয়া বের হতে লাগলো। কিন্তু তিনি তাঁর আক্রান্ত হাতের অসহ্য কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আনাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আংটার হাত থেকে ছাড়ানোমাত্রই এক লাফে নীচে নেমে আসেন। তখন তাঁর পোড়া হাতে শুধু হাড়গুলো ছাড়া আর কোনো গোশ্‌ত অবশিষ্ট ছিল না।

এই 'তুস-তর' কেল্লা বিজয়ের যুদ্ধে তিনি আল্লাহর দরবারে শাহাদাতের জন্যে দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর এই দু'আ কবুল করে নেন। এ যুদ্ধেরই এক পর্যায়ে তিনি শত্রুর তরবারির আঘাতে শাহাদাতের মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। বহু আকাঙ্ক্ষিত শাহাদাতের মাধ্যমে তিনি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সান্নিধ্যের পথ রচনা করে পরবর্তী উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্যে প্রেরণা সৃষ্টি করে যান।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জান্নাতে বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারীর মুখমণ্ডল উজ্জ্বল করুন ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দর্শনে তার চক্ষুদ্বয় শীতল করুন, ইসলামের খিদমতের জন্যে আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন। আমীন।

---

বারা'আ ইবনে মালেক আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. আল ইসাবা, ৬২০ নং জীবনী।
২. আল ইসতিয়াব বি হামেশে আল ইছাবা, ১ম খণ্ড, ১৩৭ পৃ.।
৩. আত্ তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড, ৪৪১ পৃষ্ঠা, ৭ম খণ্ড, ১৭ পৃষ্ঠা এবং ১৩১ পৃ.।
৪. তারিখ আত্ তাবারী, ১০ম খণ্ডের সূচী দ্রষ্টব্য।
৫. আল কামিল ফিত্ তারিখ, সূচি দ্রষ্টব্য।
৬. আস সিরাতু আন্ নববীয়্যাহ, ইবনি হিশাম, সূচি দ্রষ্টব্য।
৭. হায়াতুস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, সূচী দ্রষ্টব্য।
৮. কা'দাতু ফাতহু ফারেছ-লশিত খাত্তাব।

# উম্মু সালামা (রা)

*'তুমি তোমার অভিজাত মন সম্পর্কে যা বলেছ, আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তোমার অন্তর থেকে তা দূর করে দেন এবং তুমি তোমার বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণের যে কথা বলেছ, আমিও তো বয়সের দিক দিয়ে তোমার মতো বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আর তুমি তোমার সন্তান সম্পর্কে চিন্তা করছ? এখানে তোমার সন্তানতো আমারই সন্তান।'*

*–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*

প্রিয় পাঠক! উম্মু সালামা সম্পর্কে কি কিছু জানেন? কে এই মহিয়সী মহিলা? তিনি ছিলেন মুসলিম নারীকূলের গর্ব উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহা। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন প্রসিদ্ধ মহিলা সাহাবী। তাঁর আসল নাম ছিল হিন্দ। উম্মু সালামা তাঁর ডাক নাম। পরবর্তী সময়ে তিনি উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা লাভ করেন এবং ডাক নামেই বেশী পরিচিত হন।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার পিতা ছিলেন বনূ মাখযূম গোত্রের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা। তিনি তৎকালীন আরবের হাতেগোনা কয়েকজন দানবীর ব্যক্তির অন্যতম ছিলেন। এই দানশীলতার জন্যে তাঁকে 'সফর সামগ্রীর যোগানদাতা'ও বলা হতো। কারণ কোনো মুসাফির তাঁর সাথে ভ্রমণ করলে অথবা তাঁর বাড়িতে অবস্থান নিলে সেই মুসাফিরের কোনো সফর সামগ্রীর প্রয়োজন হতো না।

উম্মু সালামার স্বামী ছিলেন আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদিল আসাদ। তিনি ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম সম্মানিত দশজন সাহাবীর অন্যতম। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আরও দু'একজন সাহাবী ছাড়া তাঁর আগে আর কেউ ইসলাম গ্রহণ করেননি।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁর স্বামীর সাথে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনিও ছিলেন দ্বিতীয় ইসলাম গ্রহণকারী মহিলাদের অন্যতম। উম্মু সালামা ও তাঁর স্বামীর ইসলাম গ্রহণের খবর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়লে কুরাইশদের মধ্যে ক্ষোভের আগুন জ্বলে ওঠে। উম্মু সালামাদের উপরও নেমে আসে কঠিন ও অবর্ণনীয় নির্যাতন। সে নির্যাতনের বর্ণনা কোনো পাষাণ হৃদয়ের মানুষও যদি শোনে তাহলে তাঁর হৃদয়ও বিগলিত না হয়ে পারে না; কিন্তু উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও তাঁর স্বামী এত নির্যাতনের পরও বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি এবং কোনো প্রকার দুর্বলতা ও সংশয় তাঁদের স্পর্শ করেনি। তাঁরা কঠিন নির্যাতনের সময় ধৈর্য ও ত্যাগের অনুপম নজীর স্থাপন করেছেন।

মক্কায় ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম কাতারের সাহাবীদের উপর এভাবে চলছিল জুলুম-নিপীড়ন ও নির্যাতনের স্টীম রোলার। জান-মালের এক চরম নিরাপত্তাহীনতা– জাহিলী যুগের বর্বরতার এ এক ভয়াল ও করুণ চিত্র।

প্রতিনিয়তই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কানে ভেসে আসছিল সাহাবীদের ওপর নির্যাতনের রোমহর্ষক আর্তনাদ। সাহাবীদের জান-মালের হেফাযতের জন্যে তিনি দারুণভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। উপায়ান্তর না দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া) হিজরতের অনুমতি দিলেন। ঈমানের হেফাযতের জন্য অনিশ্চিত নিরাপত্তার প্রত্যাশায় অন্যান্যের মতো উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং তাঁর স্বামীও হাবশায় হিজরত করেন।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও তাঁর স্বামী তাঁদের সুউচ্চ অট্টালিকা, বংশীয় প্রতিপত্তি এবং অঢেল ধন-সম্পদ সবকিছু ফেলে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, স্বাধীনভাবে তাঁর ইবাদত ও পারলৌকিক পুরস্কারের প্রত্যাশায় হাবশায় বাদশাহ নাজ্জাশীর নিরাপত্তা ও আশ্রয়ে খুবই শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।

বিশ্ব মানুষের কল্যাণ, মুক্তি এবং হেদায়াতের জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওহী নাযিলের স্থান হিসেবে পছন্দ করেছিলেন মক্কা মুআয্যমা। এই মক্কা নগরী ত্যাগের যে কী মর্মজ্বালা! সেই মর্মজ্বালা একমাত্র তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন, যারা নির্যাতনে জর্জরিত হয়েও মক্কায় ছিলেন এবং প্রাণাধিক প্রিয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চেহারা মোবারক দেখে আর তাঁর সঙ্গে মুসাফাহায় ও আলিঙ্গনে হৃদয় শীতল করে সকল দুঃখ-যাতনা ভুলে যেতেন। তাঁরা সেই প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য হতে বঞ্চিত হয়ে হাবশায় নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতে থাকেন। বিচ্ছিন্নতার দুশ্চিন্তাই ছিল তাঁদের সাথী। এই নিঃসঙ্গতা ও দুর্ভাবনাকে যদিও হাবশার বাদশাহ নাজ্জাসীর সার্বিক সহযোগিতা অনেকাংশে লাঘব করতো তবুও তাঁদের মনে ছিল নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা।

কিছুদিন যেতে না যেতেই লোক মারফত মক্কায় ইসলামের দ্রুত প্রসারের সুখবর হাবশায় গিয়ে পৌঁছতে থাকে। তাঁরা জানতে পারেন, কুরাইশদের লৌহমানব হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব, তেজস্বী মহাবীর উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমসহ বহু প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় মক্কাবাসী ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কারণে মুসলমানদের উপর থেকে কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়নের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। এ খবর শুনে মুহাজিরদের অনেকেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পুণ্য স্মৃতিবিজড়িত মাতৃভূমি মক্কায় ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নেন এবং মক্কার উদ্দেশ্যে হাবশা ত্যাগ করেন। এই প্রত্যাবর্তনকারী কাফেলার সাথে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং তাঁর স্বামীও ছিলেন।

হাবশা থেকে প্রত্যাগত সাহাবীগণ মক্কায় এসে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করেন যে, মক্কায় ইসলাম সম্প্রসারণ এবং নিরাপত্তা সম্পর্কে যেসব খবর তাঁরা হাবশায় বসে পেয়েছিলেন তা ছিল অতিরঞ্জিত। হামযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের প্রতিষ্ঠিত পৌত্তলিক সমাজ কাঠামোর উপর ছিল একটি প্রচণ্ড আঘাত। কুরাইশদের আশঙ্কা– এভাবে অনবরত যদি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা ইসলামের অনুসারী হয়ে যান, তাহলে তাদের প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার পতন অনিবার্য। বিষয়টি তাদের কাছে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো ছিল। তারা সিদ্ধান্ত নেয়, যে

কোনোভাবে মুসলমানদের অগ্রযাত্রা প্রতিহত করতে হবে। এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তারা মুসলমানদের প্রতি অধিকতর হিংস্র হয়ে উঠে এবং সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও দৈহিক নির্যাতনের মাত্রা পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়।

পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ও ভয়াবহতা লক্ষ্য করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবার মুসলমানদের মদীনায় হিজরত করার নির্দেশ দেন। কুরাইশদের সীমাহীন নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে মদীনা হিজরতকারী দলের সাথে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং তাঁর স্বামীও অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন; কিন্তু তাদের জন্যে হাবশার মতো মদীনায় হিজরত করা এতো সহজ ছিল না। এবারের হিজরত ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং বিপদসংকুল। পদে পদে বিপদ-মুসীবত, জীবনের ঝুঁকি এবং সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট তাঁদেরকে অক্টোপাসের মতো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে।

মদীনা হিজরতের দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ভাষায় ছিল :

> 'আমার স্বামী আবূ সালামা অতি সঙ্গোপনে মদীনা হিজরতের সিদ্ধান্ত নেন। প্রয়োজনীয় কাজ সমাপ্ত করে তিনি আমার জন্যে একটি উটও প্রস্তুত রাখেন। অতি সতর্কতার সাথে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে আমাদের একমাত্র ছেলে সালামাকে কোলে নিয়ে আমি উটের পিঠে সওয়ার হই। সাথে সাথে আমার স্বামী এদিক-সেদিক চিন্তা না করে দ্রুতগতিতে মদীনার উদ্দেশ্যে উট চালনা করতে থাকেন। চালকের সংকেত পাওয়ামাত্রই উটটিও তার স্বাভাবিক গতির চেয়ে আরও অধিক গতিতে এগিয়ে চলে। আমরা মক্কার সীমান্ত অতিক্রম করতে যাচ্ছি, ঠিক এ সময়ে আমার নিজ গোত্র বনূ মাখযূমের কিছু লোক আমাদের দেখে ফেলে এবং গতিরোধ করে। তারা আমার স্বামী আবূ সালামাকে উদ্দেশ্যে করে বলে :
>
> 'তুমি যদি আমাদের নিয়ন্ত্রণ থেকে চলে যেতেও সক্ষম হও তাতেই বা কী আসে যায়? কিন্তু তোমার স্ত্রী? সে তো আমাদের বংশের মেয়ে। তুমি চাইলেই কি আমরা তাকে তোমার সাথে যেখানে খুশি যেতে দেব? আর সে চাইলেই কি তোমার সাথে ইয়াসরিবে চলে যেতে পারবে?
>
> 'এই বলেই তারা আমার স্বামীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে তারা আমার স্বামীর নিকট থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে সক্ষম হয়।

অতঃপর তারা আমাকে নিয়ে মক্কায় রওয়ানা হয়। ঠিক এ সময়ে আমার স্বামীর গোত্র আবুল আসাদের কিছু লোকজন ঘটনাক্রমে সেখানে এসে পৌঁছে। তারা দেখতে পায় যে, আমার স্বগোত্রীয় লোকজন আমার স্বামী থেকে আমাকে ও আমাদের সন্তানকে জোরপূর্বক মক্কায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এতে তারা ভীষণ ক্ষুব্ধ হয় এবং তারা আমার গোত্রের লোকদের বলে :

'তোমরা যেহেতু আমাদের গোত্রের আবূ সালামা থেকে তোমাদের মেয়েকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছ, সেহেতু আমাদের গোত্রের শিশু সন্তানকে তোমাদের সাথে যেতে দিতে পারি না। সে আমাদের বংশের ছেলে। তাই আমরাই তার বৈধ উত্তরাধিকারী।

'এই উত্তরাধিকারীর দাবিতে উভয় গোত্রের লোকজনের মধ্যে আমার ছেলে সালামাকে নিয়ে ভীষণ বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং এক পর্যায়ে আমার স্বামীর গোত্রের লোকজন সালামাকে ছিনিয়ে নেয়। এই হাঙ্গামা এবং আক্রমণ পাল্টা-আক্রমণের এক পর্যায়ে আমি আমার স্বামী ও সন্তান থেকে মুহূর্তের মধ্যেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি।

'এদিকে আবূ সালামা আমার গোত্রীয় লোকজনের আক্রমণ থেকে কোনোমতে রক্ষা পেয়ে জীবন ও দীনের হেফাযতের উদ্দেশ্যে মদীনার দিকে চলে যান। এভাবেই আমি আমার গোত্রের লোকজনের হাতে বন্দী হয়ে পড়ি। অপরদিকে দুগ্ধপোষ্য সন্তান সালামা তার স্বগোত্রীয় লোকদের রক্ষণাবেক্ষণে চলে যায়।

'ক্ষণিকের মধ্যেই আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময় ও মধুর দাম্পত্য জীবনে নেমে আসে নানা বিপদ, শঙ্কা ও উদ্বেগ। আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানটিও হৃদয়হীন হিংস্র দস্যুদের অন্যায়ের শিকারে পরিণত হয়। আমার এই বিরহ-বেদনার মর্মজ্বালা এবং বুকফাটা আর্তনাদে আকাশ-বাতাসও যেন ভারী হয়ে উঠে।

'আমার গোত্রের লোকেরা আমাকে এভাবে পাহারা দিয়ে রাখত, যেন তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে আমি মক্কার সীমানা অতিক্রম করে যেতে না পারি। কিন্তু

প্রতিদিনই আমি স্বামী ও সন্তানের বিরহ-বেদনার সীমাহীন যন্ত্রণা বুকে নিয়ে খুব প্রত্যুষেই ছুটে যেতাম 'আবতাহ' নামক উপত্যকার সেই স্মৃতি বিজড়িত স্থানে যেখান থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। সন্তান ও স্বামীকে ফিরে পাবার বুকভরা আশা নিয়ে সেখানে বসে হা-হুতাশ ও কান্নাকাটি করতাম। আল্লাহর দরবারে সারাটা দিন আহাজারিতে রত থাকতাম। এমনিভাবে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই উত্তপ্ত উপত্যকায় আমার কান্নাকাটির প্রায় একটি বছর অতিক্রান্ত হলো। হঠাৎ একদিন আমার চাচার বংশের একজন লোকের নেক নজরে পড়ে গেলাম। আমার আর্তনাদ তার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক করল। তার করুণা ও স্নেহ বাৎসল্য এই যন্ত্রণাদগ্ধ উপত্যকায় আমার জন্যে আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ অনুভূত হলো।

তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে আমার গোত্রের লোকদের উপর চাপ সৃষ্টি করলেন এবং তাদের বললেন :

'এই নিরীহ মেয়েটিকে কি তোমরা মুক্তি দেবে না? কী যে নির্মম আচরণ তোমরা তার সাথে অব্যাহতভাবে করছ! পশুত্বেরও একটি সীমা আছে। অত্যন্ত নির্দয়ভাবে তোমরা তাকে তার স্বামী ও সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ। আর কতদিন তোমরা তাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাও?'

'মহান রাব্বুল আলামীনের অশেষ মেহেরবানীতে তার এ কথায় আমার গোত্রের লোকজনের পাষাণ হৃদয়ে একটু দয়া ও অনুকম্পার সৃষ্টি হলো। তার এই হৃদয়গ্রাহী নিবেদন ও চাপ সৃষ্টির এক পর্যায়ে তারা আমাকে আমার স্বামীর নিকট চলে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দিল। তারা আমাকে পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিল :

'যদি ইচ্ছে করো তাহলে তুমি তোমার স্বামীর নিকট চলে যেতে পার।

'স্বামীর নিকট চলে যাওয়ার' এ অনুমতি একদিকে যেমন আমার পেরেশানী কিছুটা লাঘব করল অন্যদিকে যেন আমার দুঃশ্চিন্তার মাত্রা আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিল। আমার একমাত্র ছেলে সালামাকে মক্কায় বনূ আসাদ গোত্রের লোকদের হাতে বন্দী রেখে আমি কী করে মদীনায় আমার স্বামীর কাছে যেতে পারি? কী করে নিজের মনকে প্রবোধ দিতে পারি? তখন চোখের পানিও শুকিয়ে যাচ্ছিল, কলিজা ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছিল এই

বেদনায় যে, আমার ছেলেকে মক্কায় রেখে আমি কি মদীনায় হিজরত করে মনে শান্তি পাব? এসব চিন্তায় আমি পাগলপারা হয়ে যাচ্ছিলাম।

'আল্লাহর মেহেরবানীতে কিছু হৃদয়বান লোক আমার এই করুণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাদের সহানুভূতির হাত আমার দিকে প্রসারিত করল। তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে বনূ আসাদ গোত্রের নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করে আমার ছেলে সালামাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে তাদেরকে রাজি করাতে সক্ষম হলো। এভাবে আমার নয়নের মণি সালামাকে আমি ফিরে পেলাম।

'ছেলে সালামাকে ফিরে পেয়েই মদীনায় যাওয়ার জন্যে একজন সফর সঙ্গীর অপেক্ষা করছিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, বিলম্বের কারণে আবার না জানি কোন্ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে স্বামীর সান্নিধ্য লাভে ব্যর্থ হই। অতএব কালবিলম্ব না করে আমি নিজেই বাহন উটটিকে সফরের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করলাম এবং কাউকে না পেয়ে একমাত্র আল্লাহর উপর ভরসা করে আমার শিশু পুত্রসহ একাই রওয়ানা হয়ে গেলাম।

'মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে 'তানয়ীম' নামক স্থানে খানায়ে কাবার চাবি সংরক্ষণকারী ওসমান ইবনে তালহার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়।

তিনি আমাকে দেখে বললেন :

'হে সফর সামগ্রীর যোগানদাতার মেয়ে, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

আমি উত্তর দিলাম, 'স্বামীর সাথে মিলিত হওয়ার প্রত্যাশায় মদীনায় যাচ্ছি।'

তিনি বললেন, 'তোমার সাথে কি কোনো সফরসঙ্গী নেই?'

উত্তরে আমি বললাম, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহ এবং আমার এই শিশু সন্তান সালামা ব্যতীত আমার সাথে আর কেউ নেই।

আমার এই জওয়াব শুনে তিনি বললেন :

'আল্লাহর শপথ! এ অবস্থায় আমি তোমাকে একাকী যেতে দিতে পারি না। তুমি নিশ্চিন্ত হও যে, অবশ্যই আমি তোমাকে মদীনা পর্যন্ত পৌছে দেব।'

'এই বলে তিনি তাঁর নিজের গতি পরিবর্তন করে আমার উটের রশি ধরে মদীনার পথ ধরে চলতে থাকলেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর মতো ভদ্র, চরিত্রবান ও আমানতদার সফরসঙ্গী এই জীবনে আর কখনো দেখিনি। যখন আমরা কোনো মঞ্জিলে পৌঁছতাম, তখন তিনি উটকে বসার নির্দেশ দিয়ে আমার দিকে না তাকিয়ে দূরে চলে যেতেন। আমি যেন সহজে উট থেকে অবতরণ করতে পারি। আমি উটের পিঠ থেকে নেমে গেলে তিনি এসে উটটিকে কোনো গাছের সাথে বেঁধে দিয়ে পুনরায় দূরে অন্য কোনো গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নিতেন। আবার যখন আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় হত, তখন তিনি উটকে প্রস্তুত করে আমার নিকটে এসে বসিয়ে দিয়ে নিজে সরে যেতেন এবং আমি ঠিকভাবে বসে আওয়াজ দিলে তিনি এসে রশি ধরে পথচলা শুরু করতেন।

'ক্রমাগত কয়েকদিন এভাবে আমরা মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করে মদীনার কাছে এসে পৌঁছলাম। মদীনা হতে মাত্র দু'মাইল দূরে 'কোবা' নামক স্থানে বনূ ওমর বিন আউফ গোত্রের লোকজনের সাথে আমার স্বামীর বসবাস করার খবর নিশ্চিতভাবে জানলাম। ওসমান বিন তালহা আমাকে বললেন :

'আল্লাহর উপর ভরসা করে তুমি এই গ্রামে প্রবেশ করো, এখানে তোমার স্বামী বসবাস করছেন।'

'অতঃপর ওসমান ইবনে তালহা আমাকে সহীহ-সালামতে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিয়ে খুশিমনে মক্কার পথে রওয়ানা হয়ে গেলেন।'

ত্যাগ-তিতিক্ষা, কুরবানী ও বিচ্ছিন্নতার বিরহ-বেদনার এক দীর্ঘ ইতিহাসের পরিসমাপ্তি ঘটল। সীমাহীন ঘাত-প্রতিঘাতের পর উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তাঁর হারানো স্বামীকে পেয়ে চক্ষু শীতল করলেন। সালামার পিতাও তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় ছেলে ও স্ত্রীকে পেয়ে ধন্য হলেন।

কিছুদিন যেতে না যেতেই বদর যুদ্ধের রণ-দামামা বেজে উঠল। অন্যান্য সাহাবীদের মতো বীর বিক্রমে আবূ সালামাও এ জিহাদে অংশ নিলেন। অসাধারণ বীরত্ব ও যুদ্ধ নৈপুণ্য প্রদর্শন করে অন্যান্য সাহাবীদের ন্যায় তিনিও বিজয়ীর বেশে ফিরে এলেন।

এদিকে বছর পার হতে না হতেই ওহুদের যুদ্ধের ডাক এসে গেল। বদরের যুদ্ধের চেয়ে আরও অধিক বীর বিক্রমে আবূ সালামা ওহুদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ওহুদ যুদ্ধের নিশ্চিত বিপর্যয়কে রোধ করতে তিনি জীবনের মায়া ত্যাগ করে তাঁর সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে মুশরিকদের পশ্চাৎপসরণে বাধ্য করেন। কিন্তু এ যুদ্ধে তিনি নিজে মারাত্মকভাবে আহত হলেন। তাঁর সমস্ত শরীর ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল। দ্রুত তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু তার শরীরের মারাত্মক ক্ষতস্থানগুলোর উপরদিক শুকিয়ে উঠলেও ভিতরে পচন ধরে গিয়েছিল। ফলে এই মর্দে মুজাহিদ মারাত্মক অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন। চিকিৎসার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকার পরও তিনি ক্রমেই নিস্তেজ হয়ে পড়ছিলেন। এ অবস্থায় তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতেন :

> 'আমি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি, কেউ যদি কোনো বিপদের সম্মুখীন হয় তাহলে দুঃশ্চিন্তা না করে সে যেন বলে, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিঊন।'

কারণ, আল্লাহর সান্নিধ্য পাওয়ার অনুভূতিই মুমিনের জীবনে বিপদের মুহূর্তে প্রশান্তি দিতে পারে। তিনি এই বলেও প্রার্থনা করতে বলেছেন :

اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اِحْتَسَبْتُ مُصِيْبَتِيْ هٰذِهٖ اَللّٰهُمَّ اخْلِفْنِيْ خَيْرًا
مِّنْهَا إِلَّا عَطَاهُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ..." .

> 'হে আল্লাহ! আমি আমার এই বিপদে তোমার কাছেই প্রতিদান চাচ্ছি। তুমি আমাকে এর চাইতেও উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করো, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তা দান করবেন।'

আবূ সালামার অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। একদিন সকালে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখার জন্যে তাশরীফ আনলেন। চিকিৎসা ও স্বাস্থ্যের খোঁজ-খবর নিয়ে যখন তিনি প্রত্যাবর্তন করছিলেন, ঠিক সে মুহূর্তেই আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতে তাঁর চোখ দুটি বুঁজিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর কাছে এই বলে প্রার্থনা করলেন :

"اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاَبِیْ سَلَمَةَ، وَارْفَعْ دَرَجَتَهٗ فِی الْمُقَرَّبِیْنَ وَاخْلُفْهُ فِیْ عَقِبِهٖ فِی الْغَابِرِیْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهٗ یَا رَبَّ الْعٰلَمِیْنَ، وَافْسِحْ لَهٗ فِیْ قَبْرِهٖ ، وَنَوِّرْ لَهٗ فِیْهِ".

'হে আল্লাহ! তুমি আবূ সালামার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দাও, তাঁর মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে তোমার প্রিয় ও নিকটতম বান্দাহদের অন্তর্ভুক্ত করো, তাঁর পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করো এবং তাঁকে ও আমাদের সকলকে ক্ষমা করো। তাঁর কবরকে আলোকিত ও প্রশস্ত করে দাও।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তার স্বামী কর্তৃক বর্ণিত সেই দু'আ উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার স্মরণ হলো। তিনি– 'হে আল্লাহ বিপদে তোমার কাছেই এর প্রতিদান চাচ্ছি'– পর্যন্ত বলে থমকে গেলেন এবং মনে মনে বললেন :

'আবূ সালামার চেয়ে উত্তম জীবন সঙ্গী আর কে হতে পারে?'

এ চিন্তা করতে করতে দু'আর শেষ পর্যন্ত বললেন। এ দু'আর ফলাফল তড়িৎগতিতে তার সামনে এল। অর্থাৎ দেখতে না দেখতেই উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার দু'আ বাস্তবে প্রতিফলিত হলো।

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার স্বামীর মৃত্যুতে সমস্ত মুসলমান শোকাভিভূত হলেন, যা অতীতে কারো মৃত্যুতে এমনটি হয়নি। উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সীমাহীন দুঃখ-কষ্টে সমবেদনা জানাতে গিয়ে তাঁকে মুসলমানগণ 'আইয়্যিমুল আরাব' বা 'আরব জাতির বিধবা'– এই সম্মানজনক উপাধিতে ভূষিত করলেন।

আরবের ঐতিহ্যবাহী, সম্পদশালী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মদীনায় একমাত্র শিশুসন্তানকে দেখা-শোনার আর কেউ অবশিষ্ট রইল না। মদীনার এই ইসলামী রাষ্ট্রের আনসার এবং মুহাজিরগণ প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খোঁজ-খবর নিতে লাগলেন। স্বামীর মৃত্যুর 'ইদ্দত' শেষ হতে না হতেই আবূ বকর সিদ্দীক

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ হতে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব পাঠানো হয়। কিন্তু উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এ প্রস্তাব গ্রহণে অসম্মতি জানান।

অতঃপর ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার নিকট অনুরূপ প্রস্তাব প্রেরণ করেন; কিন্তু তাতেও উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের মতোই অসম্মতি জ্ঞাপন করেন।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো মর্যাদাবান জালীলুল কদর সাহাবীদ্বয়ের প্রস্তাবে অসম্মতি জানালে এই ঐতিহ্যবাহী সম্ভ্রান্ত বংশের বিধবাকন্যার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখময় করার নিমিত্তে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব দেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রস্তাব পেয়ে তিনি বললেন :

> 'হে আল্লাহর রাসূল! আমার মধ্যে তিনটি এমন দুর্বলতা রয়েছে, যার কারণে আপনার এই মহান প্রস্তাব গ্রহণে আমি বড়ই সংকোচ বোধ করছি। প্রথমত, আমি আভিজাত্যের অহংকারে অহংকারী মেয়ে। আপনি যদি আমার এই আভিজাত্য মনোভাব দেখে বিরক্ত বোধ করেন তাহলে আমি আল্লাহ পাকের আযাবে নিপতিত হব। দ্বিতীয়ত, আমি এমন একজন মহিলা, যে বৃদ্ধা বয়সে পদার্পণ করতে যাচ্ছে। তৃতীয়ত, একটি সন্তান রয়েছে।'

এই তিন শর্ত শ্রবণে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

> 'তুমি তোমার অভিজাত মন সম্পর্কে যা বলেছ, আমি আল্লাহর কাছে দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তোমার অন্তর থেকে তা দূর করে দেন এবং তুমি তোমার বৃদ্ধাবস্থায় পদার্পণের যে কথা বলেছ, আমিও তো বয়সের দিক দিয়ে তোমার মতো বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছি। আর তুমি তোমার সন্তান সম্পর্কে চিন্তা করছ? এখানে তোমার সন্তানতো আমারই সন্তান।'

অতঃপর উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। এভাবেই মহান

আল্লাহ আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার বর্ণিত দু'আ বাস্তবায়িত করলেন এবং তাঁর পূর্বের স্বামীর চেয়ে শ্রেষ্ঠতম স্বামী দান করে উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে মহিমান্বিত করলেন। তখন থেকে তিনি সম্ভ্রান্ত বনূ মাখযূম গোত্রের মেয়ে হিসেবে অথবা উম্মু সালামা হিসেবে প্রসিদ্ধ না হয়ে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মু'মিনদের মাতা বা 'উম্মুল মুমিনীন' খেতাবে ভূষিত হলেন।

আল্লাহ বেহেশতে উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন। আমীন!

---

উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :


১. আল ইসাবা, ২৪০-২৪২ পৃ.।

২. আল ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, ৭৮০ পৃ.।

৩. উসুদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, ৫৫৮-৫৯৮ পৃ.।

৪. তাহ্যীব আত্ তাহ্যীব, ১২ খণ্ড, ৪৫৫-৪৬৫ পৃ.।

৫. সিফাতুস্-সাফওয়া, ২য় খণ্ড, ২০-২১ পৃ.।

৬. তাকরিবুত্ তাহযীব, ২য় খণ্ড, ৬২৭ পৃ.।

৭. শিজরাতুজ্ যাহাব, ১ম খণ্ড, ৬৯-৭০ পৃ.।

৮. তারিখুল ইসলাম লিয-যাহাবী, ৩য় খণ্ড, ৯৭-৯৮ পৃ.।

৯. আল বিদায়া ওয়া আন্ নিহায়া, ৮ম খণ্ড, ২১৪-২১৫ পৃ.।

১০. আল্ এ'লাম এবং ওহার মুরাজিয়াহু, ৯ম খণ্ড, ১০৪ পৃ.।

# ছুমামা ইবনে উছাল (রা)

*'হে ছুমামা! তোমার অতীতকর্মের জন্যে তুমি এখন আর নিন্দিত নও। কারণ, ইসলাম গ্রহণের ফলে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত পাপ মুছে যায়।'*
*—মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম*

ষষ্ঠ হিজরীতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বহির্বিশ্বে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজে মনোনিবেশ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সমকালীন আরব ও অনারব বিশ্বের মোট আটটি দেশের রাজা-বাদশাহ'র কাছে ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দূত মারফত চিঠি প্রেরণ করেন। এই আটজন রাজা-বাদশাহর মধ্যে ছুমামা ইবনে উছাল আল হানাফী অন্যতম। সে একাধারে বনূ হুনাইফা গোত্রের অন্যতম প্রভাবশালী নেতা এবং ইয়ামামা নামক রাষ্ট্রের অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও স্বৈরাচারী বাদশাহ। এ রাজ্যে তার হুকুম অমান্য করার সাধ্য কারো ছিল না।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ দূত-মারফত প্রেরিত চিঠিকে ইয়ামামার বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল অত্যন্ত তাচ্ছিল্য ও ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। সে আল্লাহর দাসত্ব এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পারলৌকিক মুক্তি ও কল্যাণের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে গর্ব ও অহঙ্কারে মেতে উঠে বলে :

> 'আমার মতো প্রভাবশালী ইয়ামামার বাদশাহকে আনুগত্যের আহ্বান জানিয়ে মুহাম্মদ নিরাপদে বসবাস করবে? এ কী করে সম্ভব?'

রাগে, ক্ষোভে ও অহমিকায় প্রায় উন্মাদ হয়ে সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আঁটতে শুরু করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর দাওয়াতকে দুনিয়া থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই তার আত্মমর্যাদা রক্ষা পাবে– এটাই ছিল তখন তার একমাত্র অভিপ্রায়।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিদ্রিতাবস্থায় অথবা অন্য কোনো অসতর্ক মুহূর্তে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ইয়ামামার বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল মদীনায় গিয়ে পৌঁছল। চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করার জন্যে সে ওৎ পেতে থাকে। এমনিভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক অসতর্ক মুহূর্তে ছুমামা প্রায় তাঁকে হত্যাই করে ফেলত, যদি তাঁর চাচা তাকে এর ঠিক পূর্বমুহূর্তে এ কাজ থেকে বিরত না করত। রাসূলুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যা করা থেকে বিরত হলেও তার হামলা থেকে কয়েকজন সাহাবী রক্ষা পেলেন না। ব্যর্থতার গ্লানিকে মুছে ফেলার জন্য রাতের আঁধারে সাহাবীদের উপর অতর্কিত হামলা চালিয়ে কয়েকজনকে নির্মমভাবে হত্যা করে ছুমামা ইবনে উছাল ইয়ামামায় পালিয়ে গেল।

সাহাবায়ে কেরামের উপর এই নির্মম ও পৈশাচিক হত্যাকাণ্ডে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। এভাবে চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে হত্যা করার দুঃসাহস যেন আর কেউ করতে না পারে সে জন্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা ইবনে উছালকে হত্যার মাধ্যমে এর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন।

এ ঘটনার কিছুদিন পর ইয়ামামার সেই বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে সদলবলে মক্কার পথে রওয়ানা হলো। তার উদ্দেশ্য ছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের হত্যার সাফল্যে আনন্দিত হয়ে সে খানায়ে কাবা তাওয়াফ করবে এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ দেবতাদের সম্মানার্থে পশু বলি দেবে।

চোরাগুপ্তা হামলা ও নবপ্রতিষ্ঠিত ক্ষুদে ইসলামী রাষ্ট্রের ওপর শত্রু পক্ষের সম্ভাব্য আকস্মিক হামলা প্রতিরোধ করার জন্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার পার্শ্ববর্তী এলাকায় যথাযথ পাহারার ব্যবস্থা করলেন। সশস্ত্র ছোট ছোট গ্রুপের মাধ্যমে শত্রুদের গতিবিধির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখার জন্য ঐসব স্থানে নিয়মিত টহলের ব্যবস্থা করা হলো।

এদিকে ইয়ামামার সেই বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল তার দলবল নিয়ে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে বিকল্প পথ না থাকায় অত্যন্ত সঙ্গোপনে মদীনার নিকটবর্তী ঐ একমাত্র পথ ধরে রাতের আঁধারে মক্কার দিকে যাচ্ছিল; কিন্তু মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের টহলরত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের দৃষ্টি এড়িয়ে পথ অতিক্রম করা তাদের পক্ষে সম্ভব হলো না। টহলরত বাহিনীর চোখে ধুলা দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার প্রয়াসকালে ছুমামা ইবনে উছাল নিজেই মুসলমানদের হাতে ধরা পড়ে গেল। মুসলিম সৈনিকরা ছুমামা ইবনে উছালকে শত্রুপক্ষের একজন সাধারণ সৈন্য মনে করে মদীনায় নিয়ে এসে মসজিদে নববীর একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখে। সন্দেহভাজন এই দুষ্কৃতকারীর বিচারের ব্যাপারে সাহাবীগণ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্তের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকলেন। এদিকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাষ্ট্রীয় কাজে মসজিদে নববীতে প্রবেশের সময় ইয়ামামার সেই বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছালকে খুঁটির সাথে বাঁধা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

'তোমরা কি জানো, কাকে এই খুঁটির সাথে বেঁধে রেখেছ?'

উত্তরে সাহাবীগণ বললেন : 'না, আমরা তো তাকে চিনি না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'এই সেই ইয়ামামার অহংকারী বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল আল হানাফী। তোমরা এই বন্দীর সাথে অত্যন্ত উত্তম ব্যবহার করবে।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদন শেষে বাসায় ফিরে পরিবারের সদস্যদের বললেন :

اِجْمَعُوْا مَا كَانَ عِنْدَكُمْ مِّنْ طَعَامٍ وَابْعَثُوْا بِهٖ إِلٰى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ ....

'তোমাদের কাছে খাবার কী আছে? সত্বর নিয়ে এসো এবং ছুমামা ইবনে উছালের জন্যে পাঠিয়ে দাও।'

এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের নির্দেশ দিলেন :

'আমার উটনীকে সকাল-বিকাল দোহন করে যেন সে দুধ ছুমামার জন্যে নিয়মিত পাঠানো হয়।'

রাসূলুল্লাহ (স) ছুমামাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য হাজির করার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে সর্বপ্রকার উত্তম ব্যবহার অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামার অতীত কার্যকলাপ ও হত্যাকাণ্ডের জন্যে তাকে কোনোরূপ তিরস্কার না করে ইসলামের সুমহান দাওয়াত তার কাছে পেশ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ছুমামার কাছে গিয়ে বললেন :

'ছুমামা! তোমার কি কিছু বলার আছে ?'

ছুমামা ইবনে উছাল আরয করল :

'আপনি যদি আমার উপর থেকে আপনার সাহাবীদের রক্তের প্রতিশোধ নিতে চান, তাহলে আমাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন এবং তা আপনার জন্য অতিরঞ্জিত হবে না...। আর যদি আমার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেন, তাহলে আপনি আপনার একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তিকেই ক্ষমা করবেন। যদি অর্থের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করতে চান, তাহলে আপনি যে পরিমাণ অর্থের দাবি করবেন, আমি তা দিতে ব্যধ্য থাকবো।'

প্রথম দিন এই সামান্য কথা বিনিময়ের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'দিন পর্যন্ত আর ছুমামার সাথে কোনো কথা বললেন না। অপরদিকে, তিনি তার পানাহার ও আরাম-আয়েশের জন্যে পূর্বের চেয়ে আরও উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন। প্রতিদিনই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটনী দোহন করে তার কাছে যথারীতি দুধ সরবরাহ করা হচ্ছিল।

তৃতীয় দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা ইবনে উছালকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন :

'ছুমামা! তোমার কি কিছু বলার আছে ?'

ছুমামা বললো :

'না, বলার আর কিছু নেই। যা আরয করার তা আপনাকে পূর্বেই করেছি। আপনি যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে এক কৃতজ্ঞকেই ক্ষমা করবেন। আর যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তাহলে তা আমার উপযুক্ত পাওনাই পরিশোধ করা হবে। আর যদি অর্থের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করতে চান, তাহলে বলুন, যত অর্থের প্রয়োজন তা আমি দিতে প্রস্তুত।'

তার এ উত্তর শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে পরবর্তী দিনের জন্যে অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরের দিন তিনি তাকে

পূর্বের মতো একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন। ছুমামা পূর্বের ন্যায় আরয করল :

'যদি আমাকে ক্ষমা করেন, তাহলে এক কৃতজ্ঞকেই ক্ষমা করবেন। আর যদি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, তাহলে তা হবে আমার কৃত অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি। আর যদি অর্থের বিনিময়ে আমাকে ক্ষমা করতে চান, তাহলে বলুন, কত অর্থের প্রয়োজন, আমি তা পরিশোধ করতে প্রস্তুত।'

ছুমামার এই একই ধরনের উত্তর শুনে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

'তোমরা ছুমামাকে মুক্ত করে দাও।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পাওয়ামাত্র ছুমামাকে ছেড়ে দিয়ে তাকে মুক্ত হিসেবে ঘোষণা করা হলো।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে ক্ষমা পেয়ে ছুমামা ইবনে উছাল সোজা মসজিদে নববীর সন্নিকটে 'বাকী' নামক স্থানে গোসল করতে চলে গেল। সেখানে সে অতি উত্তমভাবে গোসল সেরে পাক-পবিত্র হয়ে পুনরায় মসজিদে নববীতে ফিরে এসে উপস্থিত সাহাবীদের বৈঠকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোষণা করল :

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ـ

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আমি এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও প্রেরিত রাসূল।'

কিছুক্ষণ পূর্বেও যে ছুমামা ইবনে উছাল ছিলেন ইসলামের চরম দুশমন, উদ্ধত ও অহংকারী পৌত্তলিক– পরশ পাথররূপী রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিন দিনের সাহচর্য, সান্নিধ্য, ক্ষমা ও ভালোবাসায় অবিভূত হয়ে পবিত্র কালেমায়ে শাহাদাতের ঘোষণার মাধ্যমে সেই ছুমামা ইবনে উছালই পরিণত হলেন পূর্ণ মুসলিম এবং ইসলামের আপসহীন সৈনিকে। ইসলামে দীক্ষিত হবার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করে ছুমামা ইবনে উছাল আল হানাফী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইসলাম গ্রহণের পূর্বে এই পৃথিবীতে আপনার চেয়ে অধিক ঘৃণিত আর কোনো ব্যক্তি আমার কাছে ছিল না। আর এখন পৃথিবীর সমস্ত

লোকের চেয়ে আপনিই আমার নিকট অধিক প্রিয়। আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, 'তখন ইসলামের চেয়ে ঘৃণিত কোনো ধর্ম আমার কাছে ছিল না; কিন্তু ইসলামই এখন আমার কাছে সর্বোৎকৃষ্ট জীবনব্যবস্থা। আপনার এই মদীনার চেয়ে তুচ্ছ কোনো শহর আমার কাছে ছিল না; কিন্তু এখন এই পুণ্যভূমি মদীনাই আমার সর্বোত্তম প্রিয় ভূমি।'

অতঃপর তিনি অত্যন্ত কাতরকণ্ঠে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার বহু সাহাবীকে হত্যা করেছি। আপনি এর কী সাজা আমাকে দেবেন?'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

"لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكَ يَا ثُمَامَةُ... فَإِنَّ الْإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ".

'হে ছুমামা! তোমার অতীতকর্মের জন্য তুমি এখন আর নিন্দিত ও অপরাধী নও। কারণ, ইসলাম গ্রহণের ফলে ব্যক্তির অতীতের সমস্ত পাপ মুছে যায়।'

ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণের যে সৌভাগ্য দান করেছেন, সে জন্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মোবারকবাদ এবং পরকালে নাজাতের সুসংবাদ জানালেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যবান থেকে এই শুভসংবাদ শুনে ইয়ামামার বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে গেল। তিনি উপস্থিত সকলের সামনে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আপনার যত সাহাবীকে আমি হত্যা করেছি, অবশ্যই তার দ্বিগুণ মুশরিককে হত্যা করে এর বদলা নেব। আপনার এবং ইসলামের সাহায্যের জন্যে আমি আমার সমস্ত ধন-সম্পদ, সমরাস্ত্র, জনবল এমনকি প্রয়োজনে নিজের জীবন পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেও প্রস্তুত থাকব।'

এই তেজোদীপ্ত ঘোষণার পর ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরয করলেন :

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি উমরাহ্ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা যাওয়ার পথে ধৃত হয়ে আপনার দরবারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি। এখন কি আপনি আমাকে উমরাহ্ পালনের অনুমতি দেবেন?'

উত্তরে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

> 'হ্যাঁ, তুমি উমরাহ পালনের জন্যে যেতে পারো। কিন্তু তা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের বিধান মোতাবেক হতে হবে।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে উমরাহ পালনের সঠিক নিয়ম-পদ্ধতির শিক্ষা দিলেন।

উমরাহ পালনের নিয়ম-নীতি জ্ঞাত হওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বিদায় নিয়ে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মক্কার প্রাণকেন্দ্র খানায়ে কাবায় পৌঁছে উপস্থিত জনতার সামনে তিনি উচ্চকণ্ঠে তালবিয়া পাঠ শুরু করলেন :

"لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ ... لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ ...اِنَّ
الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ... لَا شَرِيْكَ لَكَ".

> 'আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি হাজির হয়েছি। আমি হাজির, হে আল্লাহ! আমি ঘোষণা করছি, তোমার কোনো অংশীদার নেই। আমি হাজির, হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা ও সমস্ত নিয়ামত এবং বাদশাহী একমাত্র তোমারই। তোমার এই সার্বভৌমত্বে কারো কোনো অংশীদারিত্ব নেই।'

এই ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুই রাসূলুল্লাহ (স)-এর উম্মতের মধ্যে প্রথম মুসলমান, যিনি সর্ব প্রথম এই 'তালবিয়ার' ধ্বনিতে মক্কার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে খানায়ে কাবা তাওয়াফ করেন।

ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তেজোদীপ্ত কণ্ঠে তাওহীদের উদাত্ত ধ্বনি যখন বায়তুল্লাহ'র চারপাশের আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলছিল, শিরক ও কুফরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার মাধ্যমে একমাত্র ওয়াহাদানিয়াতের ঘোষণা যখন বুলন্দ হচ্ছিল, তখন কুফফারে কুরাইশরা এসে তাদের প্রতিষ্ঠিত ধ্যান-ধারণা, ধর্ম-বিশ্বাস ও দেবতাদের বিরুদ্ধে এক প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ ও বিদ্রোহ

হিসেবে তা গ্রহণ করল। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াস্বরূপ তারা নাঙা তরবারি ধারণ করে চতুর্দিক থেকে দলবদ্ধভাবে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে ছুটে আসতে লাগল। তাদের সবার চোখে-মুখে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার আগুন জ্বলছিল। কে কার পূর্বে ছুমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শিরশ্ছেদ করে তাওহীদের আওয়াজকে এক মুহূর্তে স্তব্ধ করে দেওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারবে– এই নিয়ে কিশোর-যুবক-বৃদ্ধ সকলের মাঝে মারমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে গেল।

ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ দৃশ্য দেখে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে; বরং বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে আরো উচ্চকণ্ঠে 'তাওহীদ' ও 'তালবিয়ার' ধ্বনি দিতে থাকলেন। এই উত্তপ্ত ও মারমুখী পরিস্থিতিতে কুরাইশদের এক যুবক ছুমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপে ধরাশয়ী করার জন্যে উদ্যত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুরাইশ সরদারদের কয়েকজন তাকে জাপটে ধরে ফেলল। তারা চিৎকার করে বলে উঠল :

'তোমরা কি জানো, এ ব্যক্তি কে? কার প্রতি তীর নিক্ষেপ করছ? এ হলো ইয়ামামার বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল। তোমরা যদি তার প্রতি সামান্যতম দুর্ব্যবহার কর, তাহলে তার জনগণ সর্বপ্রকার খাদ্যসামগ্রী ও সাহায্য বন্ধ করে দেবে এবং যার পরিণতিতে আমাদের না খেয়ে মরতে হবে।'

নেতৃবৃন্দের মুখে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরিচয় এবং তার প্রতি দুর্ব্যবহারের সম্ভাব্য পরিণতি আঁচ করতে পেরে ক্ষিপ্ত ও উচ্ছৃঙ্খল জনগণ আঁৎকে উঠল। যুদ্ধবাজ বেদুইন যুবকদের উষ্ণ খুন যেন নিমিষেই হিম হয়ে গেল। উন্মুক্ত তরবারিগুলো কোষবদ্ধ হতে লাগল। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ অনুগত ভৃত্যের ন্যায় অত্যন্ত নম্র ও শান্ত মেজাজে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আরয করল :

'আপনি কি আপনার বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করে অন্য কোনো নতুন ধর্ম গ্রহণ করেছেন?'

ছুমামা ইবনে উছাল আল হানাফী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বললেন :

'আমি ধর্ম ত্যাগী নই, নতুন ধর্মও গ্রহণ করিনি; বরং দুনিয়া ও আখিরাতের সঠিক কল্যাণের জন্যে সর্বোত্তম দীন (জীবন বিধান) গ্রহণ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হয়েছি।'

উত্তর শেষ করেই তিনি বায়তুল্লাহর দিকে ইশারা করে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বললেন :

أُقْسِمُ بِرَبِّ هٰذَا الْبَيْتِ، اِنَّهُ لَا يَصِلُ اِلَيْكُمْ بَعْدَ عَوْدَتِى اِلَى الْيَمَامَةِ حَبَّةٌ مِنْ قَمْحِهَا اَوْ شَىْءٌ مِنْ خَيْرَاتِهَا حَتّٰى تَتَّبِعُوْا مُحَمَّدًا عَنْ اٰخِرِكُمْ۔

'আমি এই ঘরের প্রভুর শপথ করে বলছি, ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তনের পর তোমাদের কাছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্যস্বরূপ খাদ্যদ্রব্যের চালান আসা তো দূরের কথা, গমের একটি দানাও মক্কায় আসবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমাদের সর্বোচ্চ এবং সর্বশেষ ব্যক্তি পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী হবে।'

ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা শুনে উপস্থিত কুরাইশরা হতভম্ব হয়ে গেল। নীরব-নিস্তব্ধ হয়ে আহাম্মকের মতো তারা ছুমামা বিন উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আহহুর দিকে তাকিয়ে রইল।

বেদেরা বিশধর সাপের মুখে এক রকম গাছের শিকড় ছোঁয়ালে যেমন ফনা ধরা সাপ নিমষে চুপসে যায়, ঠিক তেমনি তৎকালীন পৌত্তলিকের দল মুষড়ে পড়ল। মুহূর্তেই পরিস্থিতি উল্টো দিকে মোড় নিল। তারা ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চ্যালেঞ্জ করা তো দূরের কথা নিজেদের ভবিষ্যৎপরিণতির কথা চিন্তা করেই হতাশায় ভেঙে পড়ল। এ সুযোগে ছুমামা বিন উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই বিশাল জনসমুদ্রের মাঝে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিখিয়ে দেওয়া পদ্ধতিতে ওমরাহ সম্পাদন করতে লাগলেন। এক ঢিলে দুই পাখি। ইসলামের বীর-সৈনিকের কী অপূর্ব কৌশল!

কী অলৌকিক পরিবর্তন! কী সৌভাগ্য! যে ছুমামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মূর্তি ও দেবতাদের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় তাদের সামনে বলিদান করার মানসে ইয়ামামা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন, তিনিই আজ ইসলামী পদ্ধতিতে ওমরাহ সম্পাদনশেষে দেবতাদের সান্নিধ্যের পরিবর্তে মহান করুণাময় আল্লাহর রেজামন্দির জন্যে পশু কুরবানী দিয়ে ধন্য হলেন।

ওমরাহ্ সম্পাদনশেষে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজ দেশ ইয়ামামায় প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর জনগণকে কুরাইশদের সাহায্য-সহানুভূতি ও যাবতীয় রসদ পাঠানো বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। সর্বত্র তাঁর এই নির্দেশ পৌঁছিয়ে দেওয়া হলো। সর্বস্তরের জনগণ তাঁর এই নির্দেশে সাড়া দিয়ে মক্কাবাসীদের জন্যে সমস্ত সাহায্য ও খাদ্যসামগ্রীর বরাদ্দ বন্ধ করে দিল।

দেখতে না দেখতেই এই অর্থনৈতিক অবরোধ মক্কাবাসীদের জন্যে এক করুণ অর্থনৈতিক মন্দভাবের সৃষ্টি করল। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হু হু করে বেড়ে গেল। দেখা দিল চরম খাদ্যাভাব। সমস্ত জনগোষ্ঠী নিপতিত হলো এক মহাদুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে। তারা এ অবস্থায় সন্তান-সন্ততিসহ অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। নিরুপায় হয়ে মক্কাবাসীরা সম্মিলিতভাবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে একটি চিঠি প্রেরণ করল। তাদের চিঠির ভাষা ছিল এই :

> 'যেহেতু ইতঃপূর্বে আপনার ব্যাপারে আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে, আপনি নিজেও দয়াশীল এবং আপনি দয়া ও অনুগ্রহ এবং সুসম্পর্কের শিক্ষাই দিয়ে থাকেন। ভালোবাসা ও দয়ার এ শিক্ষার বিপরীত অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আপনাকে লিখছি যে, আমাদের বাপ-দাদাদের অধিকাংশকে আপনারা যুদ্ধের ময়দানে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন এবং এখন আমাদের ও আমাদের সন্তান-সন্ততিদের অনাহারে মারার ব্যবস্থা করেছেন। আপনার অনুসারী ইয়ামামার বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছাল আমাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে খাদ্য ও সাহায্যসামগ্রী পাঠানো সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনাকে আমরা সবিনয় অনুরোধ করছি, অনুগ্রহপূর্বক ইয়ামামার বাদশাহ ছুমামা ইবনে উছালকে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করে খাদ্যসামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিন।'

মক্কাবাসীদের এই পত্র পেয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুমামা ইবনে উছাল আল হানাফী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করে তাদের জন্যে শীঘ্রই খাদ্যসামগ্রী প্রেরণের নির্দেশ দিলেন। ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই নির্দেশ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে অবরোধ প্রত্যাহার করে তাদের জন্যে খাদ্য ও সাহায্যসামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা করলেন।

ছুমামা ইবনে উছাল (রা) ইসলাম গ্রহণের পর সারাটি জীবন আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা ও রাসূলে কারীম (স)-এর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পালনে প্রাণপণ সচেষ্ট ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর যখন আরবে ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব ঘটে, যখন দলে দলে ইসলামে নবদীক্ষিত লোকেরা ইসলাম ত্যাগ করে ভণ্ড নবীদের প্রতি ঈমান আনতে শুরু করে, সে সুযোগে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিজ গোত্র বনূ হুনায়ফার অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মুসায়লামাতুল কাযযাব নবুওয়াতের দাবি করে বসে এবং তার প্রতি ঈমান আনার জন্যে স্বগোত্রীয় লোকদের আহ্বান জানায়।

ইসলামের এই চরম দুর্দিন ও নাজুক অবস্থায়ও ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভণ্ড নবী মুসায়লামাতুল কাযযাবকে কঠোরহস্তে দমন করার জন্যে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর স্বগোত্রীয় লোকদের ডেকে বলেন :

'খবরদার! তোমরা এই মুসায়লামাতুল কাযযাবের নবুওয়াতের মিথ্যা দাবির প্রতি ঈমান আনবে না। তার এই দাবিতে কোনো জ্যোতি নেই। আল্লাহর শপথ! এটা নিশ্চিত যে, তোমাদের মধ্যে যদি কেউ তার মিথ্যা ডাকে সাড়া দেয়, তাহলে আল্লাহ তার ভাগ্যে নির্ঘাত জাহান্নাম ছাড়া আর কিছু রাখেননি। শুধু তাই নয়, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এই ভণ্ডকে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রামে শরীক না হয় তাহলে তাকেও ভীষণ আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।'

অতঃপর তিনি যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন :

'দু'জন নবীর একত্রে আবির্ভাব হতে পারে না। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর রাসূল। তারপরে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবী আসবেন না। আর না কোনো নবুওয়াতের দাবিদার তাঁর রিসালাতের অংশীদার হতে পারে।'

এরপর ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসায়লামাতুল কাযযাবের কথিত ওহীর উদ্ধৃতির সাথে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ ওহী আল কুরআনের পার্থক্য তুলে ধরে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পেশ করেন :

حٰمٓ، تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ، غَافِرِ الذَّنْۢبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ـ

'হা-মীম। এই কিতাব সেই আল্লাহর পক্ষ হতে নাযিলকৃত, যিনি মহাশক্তিশালী, সর্ব বিষয়ে জ্ঞানী। (যিনি) গুনাহ মার্জনাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদানকারী এবং অতি বড় অনুগ্রহ দানকারী। তিনি ছাড়া আর কোনো মা'বুদ নেই। প্রত্যেককে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।'

ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'এই হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী, আর ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কাযযাবের কথা শোনো :

يَا ضِفْدَعُ نِقِّيْ مَا تَنِقِّيْنَ، لَا الشَّرَابَ تَمْنَعِيْنَ وَلَا الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ.

'হে ব্যাঙ! তুই যতই ঘেঁৎ ঘেঁৎ করিস না কেন, তোর এই ঘেঁৎ-ঘেঁৎ চিৎকারের কারণে না লোকদেরকে পুকুরের পানি পান করা থেকে বিরত রাখতে পারবি, আর না এর পানি ঘোলা করতে সক্ষম হবি।'

অতঃপর নিজ গোত্রের যেসব লোক ইসলামের প্রতি অবিচল ছিলেন তাদের সাথে নিয়ে ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসায়লামাতুল কাযযাব ও তার অনুসারী মুরতাদদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কালেমার ঝাণ্ডাকে সমুন্নত করার জন্যে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

হে আল্লাহ! সত্যের ঝাণ্ডাবাহী ছুমামা ইবনে উছাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ইসলাম ও মুসলমানদের পক্ষ থেকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন। খোদাভীরু মুত্তাকীনদের জন্যে আপনি জান্নাতের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তার সর্বোচ্চ স্থানে তাঁকে অধিষ্ঠিত করুন, আমীন।

---

ছুমামা ইবনে উছাল আল হানাফি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. আল ইসাবা ফী তামিজ আস্ সাহাবা, ইবনে হাজার আল আসকালানী : ১ম খণ্ড, ২০৪ পৃ. মোস্তাফা মুহাম্মদ।
২. আল ইসতিয়াব ফি আসমাইল আসহাব, ইবনে আব্দুল বার : ১ম খণ্ড, ৩০৫-৩০৯ পৃ.।
৩. আছ-সীরাত-আন-নববীয়াহ, ইবনে হিশাম, তাহাক্কিক আসসাক্কা সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।
৪. আল এ'লাম লি জিরিকলী ওয়া মোরাজেয়াহু ২য় খণ্ড; ৮৬ পৃ.।

# আবূ আইউব আল আনসারী (রা)

*আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) প্রাচীরের পাদদেশে দাফন করা হয়েছে।*

আরবের ঐতিহ্যবাহী বনূ নাজ্জার গোত্রের আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন বিশিষ্ট সাহাবী। এ সাহাবীর আসল নাম খালিদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব। তাঁর ডাক নাম ছিল আবূ আইউব। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাজিরদের সাহায্য-সহযোগিতা দানের সর্বোচ্চ গৌরবে গৌরবান্বিত হওয়ার কারণে ইতিহাসে তিনি আনসারী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মুসলিম বিশ্বে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একটি বহুল পরিচিত নাম। এ প্রসিদ্ধ সাহাবীর নাম জানেন না এমন লোক অতি অল্পই আছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছানোর পর আল্লাহ তাআলার ইশারায় আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাসগৃহকে নিজের অবস্থানের জন্যে বেছে নেন। আল্লাহ আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এভাবে সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক পরিচিতি দান করেন এবং ইসলামী জগতে বিশেষভাবে স্মরণীয় করে রাখেন।

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাসগৃহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবতরণ ও অবস্থানের ঘটনা অত্যন্ত চমকপ্রদ

ও আনন্দদায়ক। কুরাইশদের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় পৌঁছলে মদীনার অধিবাসীরা তাঁকে সর্বোচ্চ সম্মান শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও মহানন্দে উষ্ণ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমনবার্তা পেয়ে মদীনাবাসী যেন তাদের একান্ত প্রিয়জনের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে তাঁর শুভাগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে। এ উপলক্ষে নেতৃবর্গ স্ব-স্ব বাসগৃহ সুসজ্জিত করে প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন, রাহমাতুল্লিল আ'লামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন তাঁর গৃহকে নিজ অবস্থানের জন্যে বেছে নেন। কে তার বাসগৃহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পেয়ে ধন্য হবে– এ নিয়ে তাদের মধ্যে চলছিল এক নীরব ও স্নায়ুবিক প্রতিযোগিতা।

এদিকে রাসূলুল্লাহ (স) সরাসরি মদীনায় না পৌঁছে অনতিদূরের 'কুবা' নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করেন। কুবার মুসলমানদের অনুরোধে তিনি সেখানে চারদিন অবস্থান করেন। এ সময় তিনি সেখানে তাকওয়ার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ইসলামের ইতিহাসের সর্বপ্রথম মসজিদ 'মসজিদে কুবা' নির্মাণ করেন।

এরপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উটনীর পিঠে সওয়ার হয়ে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। মদীনার নেতৃবর্গ ও সর্বস্তরের জনসাধারণ রাস্তায় সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোশ আমদেদ জানান। সকলেরই প্রত্যাশা যে, এ মহান নেতাকে অবস্থানের জন্যে স্বগৃহে পেয়ে নিজেদের ধন্য করবেন। কিন্তু তাঁকে বহনকারী উটনীকে একের পর এক নেতৃবৃন্দের গৃহ অতিক্রম করে সামনের দিকে অগ্রসর হতে দেখে প্রত্যেকেই এমনভাবে বিনয়ের সাথে অনুরোধ জানাচ্ছিলেন :

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের এখানেই অবস্থান নিন। আমাদের রয়েছে বিপুলসংখ্যক সশস্ত্র জনগোষ্ঠী ও ধন-সম্পত্তির প্রাচুর্য। এসব আপনার প্রতি যে কোনো হুমকি মোকাবেলা করতে সক্ষম।'

কিন্তু রাসূলুল্লাহ (স) সবাইকে এই বলে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন :

دَعُوْهَا فَإِنَّهَا مَأْمُوْرَةٌ ـ

> 'উটনীকে চলতে দাও। কোথায় থামবে এ ব্যাপারে সে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে আদেশপ্রাপ্ত।'

এদিকে উটনীটি তার স্বাভাবিক গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সকলেই অতি ঔৎসুক্যের সাথে তাকিয়ে রইলেন উটনীর চলার পথের দিকে। উটনী যখন এক একটি বাড়ি অতিক্রম করছিল, তখন সে বাড়ির লোকজন অত্যন্ত হতাশ হয়ে নিজেদের দুর্ভাগা মনে করছিল। অপরদিকে পরবর্তী বাড়ির লোকজন বুকভরা আশা নিয়ে ভাবছিল, উটনী তাদের বাড়ির সামনেই থামবে; কিন্তু একের পর এক বাড়ির লোকজনের আশা আনন্দ নিরানন্দে পরিণত হচ্ছিল। এভাবেই উটনী অন্য কোথাও অবস্থান না নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চললো। উৎসুক জনতা বিশাল মিছিলের ন্যায় উটনীর পেছনে পেছনে চলতে লাগলেন। তাঁরা দেখতে চান, সেই সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে, যার বাড়িতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবস্থান নেবেন।

অবশেষে এ কৌতূহল ও প্রতীক্ষার অবসান ঘটল। উটনী আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহ তাআলা আনহুর বাসগৃহের সামনের উন্মুক্ত মাঠে এসে বসে পড়ল। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবতরণ না করে উটনীকে পুনরায় পথ চলার ইশারা দিয়ে লাগাম সহজ করে দিলেন। কিন্তু সে সামনে অগ্রসর না হয়ে ঘুরে ফিরে একই স্থানে এসে বসে গড়তে লাগল। এ দৃশ্য অবলোকনে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। তিনি দৌড়ে গিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উষ্ণ প্রাণঢালা অভ্যর্থনা জানালেন এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালপত্র উটনীর পিঠ থেকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে বহন করে আনতে থাকলেন। আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অনুভব করছিলেন, তিনি যেন আজ সমস্ত পৃথিবীর ধন-সম্পদ দিয়ে নিজের বাড়িঘর পরিপূর্ণ করলেন।

কালবিলম্ব না করে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর দোতলা বাসগৃহের উপর তলার সমস্ত আসবাবপত্র সরিয়ে সেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের জন্যে সুসজ্জিত করলেন; কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরের চেয়ে নিচ তলায় অবস্থান করাটা বেশি পছন্দ করলেন। আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা

আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে সে অনুযায়ী নিচ তলায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে পানাহার সেরে নিচ তলায় শুয়ে পড়লেন। আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর স্ত্রীসহ উপর তলায় চলে গেলেন, কিন্তু তাঁরা নিজ কক্ষের দরজা বন্ধ করতে ইতস্তত করছিলেন। আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলল :

'আমাদের প্রতি ধিক্কার! আমরা কতইনা বেয়াদবী করছি! আল্লাহর রাসূলকে নিচে রেখে আমরা উপরে ঘুমাতে যাচ্ছি? আল্লাহর রাসূলকে নিচে রেখে আমরা উপরে হেঁটে বেড়াবো, তা কী করে সম্ভব? আমরা কি আল্লাহর রাসূল ও তাঁর ওহীর মাঝখানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করব? এ অবস্থা যদি অব্যাহত রাখি, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা ধ্বংসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যাবো।'

এসব চিন্তা করতে করতে তাঁদের শরীর যেন নিস্তেজ হয়ে আসছিল। চিন্তা করে কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছিলেন না যে, তাঁরা এখন কী করবেন। পরিশেষে তাঁরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘরের সরাসরি উপরে অবস্থান না করে দূরে এক কোণে থাকার মনস্থ করলেন; কিন্তু হেঁটে যাবেন কী করে? যদি পায়ের শব্দে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে? অথবা উপর থেকে কোনো ধুলোবালি নিচে পড়ে? অনেক চিন্তা-ভাবনার পরে পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলির ওপর ভর করে তাঁরা অত্যন্ত আদব ও সংকোচের সঙ্গে মেঝের মাঝখান অতিক্রম না করে এক কিনারায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে অত্যন্ত আদবের সঙ্গে বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এবং আমার স্ত্রী গত রাতে একটুও ঘুমাতে পারিনি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'কেন, কী হয়েছে?'

উত্তরে আবূ আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমরা এ নিয়ে অত্যন্ত সংকোচবোধ করছিলাম যে, আপনি নিচে আর আমরা উপরে কিভাবে থাকব। আমাদের চলাফেরার কারণে ধুলা-বালি নিচে পড়তে পারে এবং আমরা আপনার ও আল্লাহর ওহীর মাঝখানে যদি কোনো প্রতিবন্ধক হয়ে যাই।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন :

'আবূ আইউব এতে সংকোচের কী আছে? আমি তো স্বেচ্ছায় নিচে অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কারণ বহু লোকজন আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে এবং সে কারণে নিচে থাকাই শ্রেয়।'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিদ্ধান্ত সম্মানের সাথে মেনে নিলেন। পরদিন রাতে খুব সতর্কতার সাথে চলাফেরা করলেও কীভাবে যেন পানিভর্তি কলসটি হঠাৎ পড়ে ভেঙে যায় এবং সমগ্র মেঝেতে গড়িয়ে যায়। আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাষায় :

'একেতো প্রচণ্ড শীতের রাত। এমতাবস্থায় আমি এবং আমার স্ত্রী আশঙ্কা করছিলাম, যদি পানি গড়িয়ে নিচে পড়ে তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে তাঁর কষ্ট হতে পারে, অথচ তখন আমাদের ঘরে দ্রুত পানি নিষ্কাশনের জন্যে একমাত্র সম্বল আমাদের ব্যবহার্য কম্বলটি ছাড়া বিকল্প আর কোনো বস্ত্র নেই। অগত্যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চলাফেরার পথে যাতে পানি পড়তে না পারে, সেজন্যে ঐ কম্বলটি দিয়েই মেঝের পানি সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেললাম।

পরের দিন সকালে আমি পুনরায় রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে এই ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বললাম :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার নির্দেশ পালনে সর্বাত্মক কুরবানী দিতে প্রস্তুত; কিন্তু আপনাকে নিচে রেখে আমাদের উপরে থাকাটা মানসিকভাবে কোনোমতেই মেনে নিতে পারছি না। এই বলে কলসি ভেঙে যাওয়ার ঘটনা বললাম, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এবারের আবেদন গ্রহণ করলেন এবং তিনি উপরে অবস্থান নিলেন, আর আমরা নিচে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ির সামনের সেই খোলা স্থানটি, যেখানে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বহনকারী উটনী এসে বসে পড়েছিল, সেখানেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তৈরি করলেন ইসলামী রাষ্ট্রের প্রথম প্রাণকেন্দ্র 'মাসজিদুন নববী'। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থানের জন্যে মাসজিদুন নববী সংলগ্ন হুজরা খানাসমূহের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত না হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘ সাত মাস তিনি আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাসগৃহে অবস্থান করেন।

অতঃপর নির্মাণ কাজ শেষ হলে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হুজরায় চলে আসেন। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সর্বোত্তম প্রতিবেশীতে পরিণত হন এবং তাদের মাঝে মধুর ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে।

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাণের চেয়েও বেশি ভালোবাসতেন এবং তাঁর যে কোনো প্রয়োজনে তিনি দ্রুত এগিয়ে আসতেন। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন এবং পারস্পরিক ব্যবহারের মাঝে কোনো লৌকিকতার ঝামেলা পছন্দ করতেন না। তিনি সব সময়ই আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর পরিবারের খোঁজ-খবর নিতেন। মনে হতো তাঁরা সকলে একই পরিবারভুক্ত।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন : একদা আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুপুরের সময় অত্যন্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় মসজিদে নববীতে এসে ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতে পান। ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কুশল জানার এক পর্যায়ে দুপুর বেলায় তাঁর মসজিদে আগমনের কারণ জানতে চাইলে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'একমাত্র ক্ষুধার তাড়না আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ কথা শুনে বললেন :

'আল্লাহর শপথ! আমিও একই কারণে এখানে এসেছি।'

উভয়ের কথোপকথনের মাঝে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এসে উপস্থিত হন। তিনি উভয়ের উদ্দেশ্যে বলেন :

'এ অসময়ে তোমরা কেন এখানে?'

তারা উত্তরে বললেন :

'আল্লাহর শপথ! আমরা উভয়েই ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে এখানে এসেছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা শুনে বললেন :

'আমিও জীবনমৃত্যুর ফায়সালাকারী সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, সেই একই কারণে আমিও এখানে উপস্থিত হয়েছি।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে বললেন :

'তোমরা আমার সাথে চলো।'

তিনি তাঁদের সাথে নিয়ে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিয়মিত খাবার প্রস্তুত রাখতেন। তিনি না এলে তা পরিবারের লোকেদের খেতে বলতেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আসতে দেখে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রী দৌড়ে দরজায় গিয়ে বললেন :

'মারহাবা বি নাবিয়্যিল্লাহি ওয়া বিমান মা'আহূ।'

অর্থাৎ 'আল্লাহর নবী ও তাঁর সাহাবীদের আগমন শুভ হোক।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আবূ আইউব কোথায়?'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পাশেরই খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। রাসূলে কারীমের কণ্ঠস্বর শুনে তিনিও দৌড়ে এসে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন :

'আল্লাহর নবী ও তাঁর প্রিয় সাহাবীদের আগমন শুভ হোক।'

অতঃপর আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্যে করে বলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো সাধারণত এ সময়ে কখনো আসেন না।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ।'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকে ক্ষুধার ছাপ লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বাগানে গিয়ে আধাপাকা খেজুরের একটি থোকা নিয়ে এলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ দেখে বললেন :

'কী দরকার ছিল এই আধাপাকা থোকাটি কাটার? একে পরিপক্ক হতে দেওয়াই তো ভালো ছিল।'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি চাচ্ছিলাম, এ থোকার কাঁচা-পাকা সব ধরনের খেজুরের স্বাদ আপনি গ্রহণ করবেন। আর আপনার মেহমানদারীর জন্যে আমি এখনই একটি বকরি যবেহ করছি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'দেখ, দুধ দেয় এমন কোনো বকরি জবেহ করো না।'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ঠিক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো দুধ দেয় না এমন একটি বকরি যবেহ করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বললেন :

'তুমি তো খুব সুন্দর রুটি তৈরি করতে পারো, এবার মেহমানদের জন্য সর্বোচ্চ মানের রুটি তৈরি করে আনো তো দেখি?'

অল্পক্ষণের মধ্যেই বকরির গোশ্‌ত ভুনা ও রেজালা এ দু'ভাবে রান্না করে সম্মানিত মেহমানদের সামনে উপস্থিত করা হলো। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে কিছু গোশত এবং রুটি নিয়ে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে তুলে দিয়ে বললেন :

'এগুলো ফাতেমাকে দিয়ে এসো, অনেকদিন ধরে এত মজাদার খাবার আমাদের ঘরে তৈরি হয়নি।'

অতঃপর তৃপ্তির সাথে পানাহারের পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কবিতার মতো করে বললেন :

'রুটি-গোশ্‌ত খেজুর
আধাপাকা খেজুর
পাকা কচমচে খেজুর!'

এ শব্দগুলো উচ্চারণের সাথে সাথে তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে গেল এবং তিনি বললেন :

'যে মহান সত্তার হাতে আমার জীবন ও মৃত্যুর ফায়সালা, তাঁর শপথ করে বলছি, এ সকল নিয়ামত সম্পর্কেই তো কিয়ামতের দিন তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'

সুস্বাদু খাদ্যবস্তু পানাহারের পূর্বে অবশ্যই বলবে :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ

এবং পানাহারশেষে বলবে :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هُوَ اَشْبَعَنَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا فَاَفْضَلَ ـ

'সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর, যিনি আমাদেরকে অত্যন্ত অনুগ্রহ করে উত্তম খাদ্যে পরিতৃপ্ত করেছেন।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়ের মুহূর্তে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পরের দিন তাঁর বাসায়

আসার দাওয়াত দিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল, তাঁকে কেউ দাওয়াত করলে তিনিও তাকে অনুরূপ দাওয়াত করতেন। কিন্তু আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হুজুরের দাওয়াত ভালো করে শুনতে পাননি। পরে ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে উচ্চৈঃস্বরে বললেন :

'হে আবূ আইউব! আপনাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগামীকাল তাঁর বাসায় আসার জন্যে বলেছেন।'

আবূ আইউব আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ কথা শুনে বললেন :

سَمْعًا وَطَاعَةً لِرَسُوْلِ اللّٰهِ -

'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে অবশ্যই আসবো।'

পরের দিন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়িতে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এলে তিনি তাঁকে ছোট্ট একটি কাজের মেয়ে উপহার দিয়ে বললেন :

'হে আবূ আইউব! এই মেয়েটির সাথে খুব ভালো আচরণ করবে ও উত্তম আদব-কায়দা শিক্ষা দেবে। আমাদের এখানে থাকাকালীন আমরা তাকে খুব ভালো হিসেবেই পেয়েছি।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে দেওয়া ছোট্ট কাজের মেয়েটিকে নিয়ে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত আনন্দের সাথে বাসায় ফিরলেন। স্বামীর সাথে ছোট্ট মেয়েটিকে দেখে তাঁর স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে আইউবের আব্বা! এ মেয়ে কার জন্যে নিয়ে এলেন?'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্যে উপহারস্বরূপ একে দিয়েছেন।'

তাঁর স্ত্রী বললেন :

'তিনি কতই না শ্রদ্ধাভাজন! তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন ও কৃতজ্ঞ হোন এবং যাকে দান করা হয়েছে, তার প্রতি স্নেহপরবশ থাকুন, সে কতই না উত্তম!'

আব আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'এর প্রতি উত্তম ব্যবহার করার জন্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন।'

তাঁর স্ত্রী বললেন :

'আমরা তার সাথে এমন কী সদাচরণ করতে পারি, যার দ্বারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ যথার্থভাবে পালন করা হবে?'

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি তো একে আযাদ করে দেওয়া ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পথ খুঁজে পাচ্ছি না। এভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ যথার্থভাবে পালন করা হবে।'

তাঁর স্ত্রী বললেন :

'হ্যাঁ, আপনার এই প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত ও সঠিক বলে মনে হয়। যেহেতু আপনি এতেই সন্তুষ্ট, তাই তাকে মুক্ত করে দিন।'

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসীয়তের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ছোট্ট কাজের মেয়েটিকে আযাদ করে দেওয়া হলো।

এতো গেল আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর স্বাভাবিক জীবনের একটি খণ্ডচিত্র মাত্র। তাঁর যুদ্ধকালীন জীবনের ঘটনাবলি আরও অধিক আকর্ষণীয় ও বৈচিত্র্যময়.....।

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সমগ্র জীবনটাই আল্লাহর পথের একজন নিষ্ঠাবান সৈনিক হিসেবে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর ব্যাপারে বলা হয় যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু

করে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পর্যন্ত সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী সমস্ত যুদ্ধেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। শুধু ঐসব যুদ্ধের একটিতে মাত্র অংশ গ্রহণ করতে পারেননি, যেসব যুদ্ধ একই সময়ে দু'স্থানে সংঘটিত হয়েছে। তাঁর জীবনের সর্বশেষ যুদ্ধ ছিল মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে ইয়াযীদের নেতৃত্বে পরিচালিত কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ের যুদ্ধ। এ সময় আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশি বছরের বৃদ্ধ। কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের জন্যে সাধারণ সৈনিক হিসেবে ইয়াযীদের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্যে আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার কারণে বয়সের আধিক্য সত্ত্বেও তাঁকে বিরত রাখা সম্ভব হয়নি। বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা বিদীর্ণ করে তিনি কনস্টান্টিনোপল (ইস্তাম্বুল) বিজয়ে যাবেন– এটাই ছিল তাঁর এই প্রবল আকাঙ্ক্ষার মূল কারণ।

সমুদ্রপথে কিছু দূর অতিক্রম করতে না করতেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। দুশমনদের উপর উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে দুর্বার গতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার আকাঙ্ক্ষা যেন তাঁর স্তিমিত হয়ে এল। এ অসুস্থতা ক্রমশই বৃদ্ধি পেয়ে যুদ্ধ এবং তাঁর মাঝে প্রবল অন্তরায় সৃষ্টি করল। সেনাপতি ইয়াযীদ তাঁকে সেবা-শুশ্রূষার জন্যে এসে জিজ্ঞাসা করলেন :

> 'হে আবূ আইউব আল আনসারী, আল্লাহ আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হোন! আমাদের উদ্দেশ্যে আপনার শেষ অসীয়ত বলুন।'

উত্তরে তিনি বললেন :

> 'সমস্ত মুসলমান যোদ্ধাদের প্রতি আমার সালাম পৌঁছে দিন এবং তাঁদের বলে দিন, আবূ আইউব আল আনসারী তোমাদের প্রতি অসীয়ত করেছেন, তোমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে দুর্বার গতিতে দুশমনদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে কনস্টান্টিনোপলের শেষ সীমানা পর্যন্ত বিজয় না করে থামবে না। তাদের এও বলে দিন, আমি যদি ইন্তিকাল করি, তাহলে তারা যেন আমার লাশকে সমুদ্র বক্ষে নিক্ষেপ না করে তাদের সাথে বহন করে নিয়ে যায় এবং কনস্টান্টিনোপলের প্রাচীরের পাদদেশে দাফন করে।'

এই অসীয়ত বর্ণনা শেষ হতে না হতেই এই মহান বিপ্লবী মহাপুরুষের পবিত্র আত্মা দেহত্যাগ করে মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়।

রণতরী বহরের সমস্ত মুসলিম যোদ্ধা আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শেষ অসীয়তকে অত্যন্ত জযবা ও শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ করলেন। তাঁর নির্দেশমতো মুসলিম সৈন্যরা সর্বশক্তি নিয়োগ করে দুশমনের ওপর ক্ষিপ্রতার সাথে আঘাতের পর আঘাত হানতে শুরু করলেন। এ প্রচণ্ড আঘাতে দুশমনরা পিছু হটতে লাগল। আর মুসলমান সৈন্যরা আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশকে বহন করে বিজয়ীর বেশে কনস্টান্টিনোপলে গিয়ে পৌঁছলেন। আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শেষ অসীয়ত অনুযায়ী তাঁকে কনস্টান্টিনোপলের (ইস্তাম্বুল) প্রাচীরের পাদদেশে দাফন করা হলো।

ইসলামের বীর মুজাহিদ আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত রহমত বর্ষিত হোক। আশি বছরের বার্ধক্য যাকে আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণে বিরত রাখতে পারেনি, তিনি বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করার চেয়ে অশ্বপৃষ্ঠে মৃত্যুবরণকে শ্রেষ্ঠ মনে করতেন। তিনিই এই জিহাদের কাফেলার রণতরীতে মৃত্যুবরণ করে চিরদিনের জন্যে জিহাদী জযবার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন।

---

আবূ আইউব আল আনসারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :


১. আল্ ইসাবা ফি তামিযিস্ সাহাবা, ৯৮-২৯০ তুবয়া ছায়াদাহ ২য় খণ্ড।

২. আল্ ইসতিয়ার, হায়দারাবাদ সংস্করণ : ১ম খণ্ড, ১৫২ পৃ.।

৩. উসদুল গাবা, ৫ম খণ্ড, ১৪৩-১৪৪ পৃ.।

৪. তাহযীব আত্ তাহযীব, ৩য় খণ্ড, ৯০-৯১ পৃ.।

৫. তাকরীব আত্ তাহযীব, ১ম খণ্ড, ২১৩ পৃ.।

৬. ইবনে খাইয়াত ৮৯, ১৪০, ১৯০ ও ৩০৩ পৃ.।

৭. তাজরীদু আসমাউস্ সাহাবা, ১ম খণ্ড, ১৬১ পৃ.।

৮. খোলাসাতু তাহযীবুত তাহযিব কামাল, ১০০-১০১ পৃ.।
৯. আল্ জারহু ওয়া আত্তাদীল, ১ম খণ্ড, ভূমিকা ও ২য় খণ্ড, ১৩১ পৃ.।
১০. সিফাতুস ছাফওয়া, ১ম খণ্ড, ১৮৬-১৮৭ পৃ.।
১১. আত্ তাবাকাত আল কুবরা, ৩য় খণ্ড, ৪৮৪-৪৮৫ পৃ.।
১২. আল্ ইব্‌র, ১ম খণ্ড, ৫৬ পৃ.।
১৩. তারীখুল ইসলাম লিয যাহাবী, ২য় খণ্ড, ৩২৭-৩২৮ পৃ.।
১৪. শিজরাতুয্ যাহাব, ১ম খণ্ড, ৫৭ পৃ.।
১৫. দায়েরাতুল মা'য়ারেফ আল্ ইসলামিয়া, ১ম খণ্ড, ৩০৯-৩১০ পৃ.।
১৬. আল্ জাম'উ বাইনা রিজালিস্ ছাহিহাইন, ১ম খণ্ড, ১১৮-১১৯ পৃ.।
১৭. মিন আবতালিনা আল্লাযিনা ছানায়ু আত তারিখ (লি আবিফতুহ আত তাওরিসী) : ১০৫-১১০ পৃ.।
১৮. ছিলছিলাতু আ'লামুল মুসলিমিন, ৪র্থ নং।
১৯. আল আ'লাম, ২য় খণ্ড, ৩৩৬ পৃ.।

# আমর ইবনুল জামূহ (রা)

*বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও দৃঢ় সংকল্প করেছিলেন যে শাহাদাতের বিনিময়ে খোঁড়া পা নিয়েই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন।*

*–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

বনূ সালামা আল মুসাওয়াদ গোত্রের নেতা আমর ইবনুল জামূহ জাহেলী যুগে মদীনার অন্যতম প্রসিদ্ধ দানবীর এবং অভিজাত ব্যক্তিদের অন্যতম ছিল। সেকালের প্রথানুযায়ী অভিজাত সম্প্রদায়ের নেতারা সকলেই নিজেদের জন্য এক একটি মূর্তি নির্দিষ্ট করে রাখত। তারা কোথাও রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে এবং প্রত্যাবর্তনের পরে এসব দেবতার সামনে উপস্থিত হয়ে আশীর্বাদ গ্রহণ করত। বিভিন্ন মৌসুমে দেবতাদের উদ্দেশ্যে পশু বলিদান করত ও নিজেদের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্যে তাদের শরণাপন্ন হতো। আমর ইবনুল জামূহ তার নিজের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান কাঠ দিয়ে নির্মিত যে মূর্তিটি নির্দিষ্ট করেছিল, তা 'মানাত' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সে অত্যন্ত মূল্যবান সুগন্ধি ও তৈলাক্ত দ্রব্যাদি মেখে মূর্তিটিকে সম্মানের সাথে সংরক্ষণ করত।

ইসলামপূর্ব মদীনার প্রখ্যাত এই নেতা আমর ইবনুল জামূহ ষাটের কোঠায় পদার্পণ করেছে। সে রুচিবোধ ও আভিজাত্যের জন্য ছোট-বড় সবার কাছেই সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। সকলেই তাকে সমীহ করে চলত। এক সময়ে ইসলামের প্রথম দাঈ মুস'আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলামের দাওয়াত নিয়ে মদীনায় আগমন করেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও

আন্তরিকতার সাথে মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেন। তাঁর আহ্বানে আকৃষ্ট হয়ে আমর ইবনুল জামূহ'র তিন ছেলে মুয়াওয়ায, মু'য়ায ও খাল্লাদ সঙ্গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। মুআয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদের তা'লীম ও তারবিয়্যাতের দায়িত্ব নিয়ে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছিলেন। আমর ইবনুল জামূহ'র অগোচরেই ছেলেদের প্রচেষ্টায় তাদের মা 'হিন্দ'ও ইসলামে দীক্ষিত হন।

মদীনার ঘরে ঘরে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের ফলে হাতেগোনা মাত্র কয়েকজন স্থানীয় ব্যক্তি ছাড়া বাকি সবাই ইসলামে দীক্ষিত হওয়ায় আমর ইবনুল জামূহ-এর স্ত্রী 'হিন্দ' তার স্বামীর জন্যে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়লেন। কাফির হিসেবে তাঁর স্বামী যদি ইন্তিকাল করে তাহলে নির্ঘাত জাহান্নাম ছাড়া তার ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না। এ চিন্তায় তিনি অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়েন।

অপরপক্ষে, মুস'আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খুব স্বল্পসময়ের মধ্যে মদীনার আনাচে-কানাচে ইসলামের দাওয়াত সম্প্রসারণের মাধ্যমে বিপুলসংখ্যক কিশোর ও যুবককে ইসলামে দীক্ষিত করায় আমর ইবনুল জামূহ তার ছেলেদের ব্যাপারে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। পাড়ার অন্যান্য ছেলেদের মতো তার ছেলেরাও ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলামে দীক্ষিত না হয়, এ আশঙ্কায় সে তার স্ত্রীকে সতর্ক করে দিয়ে বলল :

> 'হে 'হিন্দ'! তুমি তোমার ছেলেদের ব্যাপারে অত্যন্ত সতর্ক থাকবে, যেন তারা মক্কা থেকে আগত সেই ব্যক্তির (মুস'আব ইবনে উমাইর) সাথে কোনো প্রকারের উঠা-বসা ও দেখা সাক্ষাৎ না করে। দেখি ঐ লোকটির ব্যাপারে কী ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়।'

স্ত্রী বললেন :

> 'আপনার উপদেশ শিরোধার্য। আপনি ঠিকই বলেছেন; কিন্তু আপনার ছেলে মুআয সেই লোকটির কাছ থেকে কিছু কথা শুনে এসেছে, তার কাছ থেকে তা একবার শুনে দেখবেন কী?'

স্ত্রীর মুখে একথা শুনে আমর ইবনুল জামূহ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে বলল :

> 'ধিক্কার তোমার প্রতি! আমার অজান্তেই মু'আয কি তার স্বধর্ম ত্যাগ করে ঐ লোকটির অনুসারী হয়েছে?'

দীনদার মহিলা তাঁর স্বামীর প্রতি অনুরাগী হয়ে উত্তর দিলেন :

'না না কক্ষনোই না, ব্যাপারটি এমন হয়েছিল যে, মু'আয কৌতূহলবশে সেই ব্যক্তির কোনো এক বৈঠকে যোগ দিয়েছিল এবং তার কাছে কিছু শুনে তা-ই মুখস্থ করে রেখেছে।'

আমর ইবনুল জামূহ স্ত্রীর কথায় একটু আশ্বস্ত হয়ে বলল :

'তাকে আমার নিকট ডাক।'

অতঃপর মু'আযকে তার সামনে ডাকা হলে সে ছেলেকে বলল :

'ঐ লোকের কিছু কথা নাকি তুমি মুখস্থ করেছ? তা আমাকে শোনাও তো দেখি।'

মু'আয অত্যন্ত আদবের সাথে তাঁর পিতার সামনে পাঠ করে শোনালেন :

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ـ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ـ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ـ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ـ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّآلِّيْنَ ـ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

'সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলারই জন্য, যিনি নিখিল জাহানের রব। যিনি দয়াময় মেহেরবান, বিচার দিনের মালিক। (হে আল্লাহ!) আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। সেসব লোকের পথ, যাদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছো, যারা অভিশপ্ত নয়, যারা পথ ভ্রষ্টও নয়।'

মু'য়ায-এর সুললিত কণ্ঠে কুরআনুল কারীমের সূরা ফাতিহার তিলাওয়াত শুনে আমর ইবনুল জামূহ বলে উঠল :

مَا اَحْسَنَ هٰذَا الْكَلاَمَ وَمَا اَجْمَلَهٗ؟ اَوَ كُلُّ كَلاَمَهٗ مِثْلُ هٰذَا؟

'বাহ! কত সুন্দরই না এ কথাগুলো, কী চমৎকার এর বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপন, তার সমস্ত কথাগুলোই কি এমন চমৎকার?'

পিতার এ মন্তব্য শুনে মু'য়ায তার দুর্বলতার সুযোগে বলে ফেলল :

'আব্বা! আপনি কি তাঁর হাতে 'বায়'আত' গ্রহণ করবেন? কেননা, আপনার সম্প্রদায়ের সকলেই তো তার হাতে 'বায়'আত' গ্রহণ করেছেন।'

ছেলের একথা শুনে পিতা একটু নীরব থেকে বলে উঠল :

'না এতো শীঘ্রই নয়; যতক্ষণ পর্যন্ত মানাতের সাথে পরামর্শ না করেছি। একটু অপেক্ষা করো, দেখি 'মানাত' কী সিদ্ধান্ত দেয়।'

পিতার এ কথা শুনে মু'য়ায বলে উঠল :

'হে পিতা! এ ব্যাপারে 'মানাত' আপনাকে কী সিদ্ধান্ত দেবে? সে তো একটি কাঠের মূর্তি মাত্র। তার তো কোনো বিবেক নেই। সে তো বোবা ও বধির।'

ছেলের যুক্তির সামনে কোনো উত্তর খুঁজে না পেয়ে আমর ইবনুল জামূহ তাকে ধমক দিয়ে বলল :

'আমি তো বলেছি, তার পরামর্শ ছাড়া আমার পক্ষে স্বধর্ম ত্যাগ করা সম্ভব নয়।'

জাহিলিয়াতের প্রথানুযায়ী যখন কোনো মূর্তি বা দেবতার কাছ থেকে পরামর্শ চাওয়া হতো, কোনো আবেদন-নিবেদন পেশ করা হতো, তখন সেই মূর্তির পেছনে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হতো এই ধারণায় যে :

'দেবতা তার অনুরাগীর আবেদন-নিবেদনের উত্তর বা কোনো পরামর্শ সেই বৃদ্ধা মহিলার অন্তরে সৃষ্টি করে দেবে। আর সেই মহিলা তার ভাষায় দেবতার ভাবকে ফুটিয়ে তুলবে।'

আমর ইবনুল জামূহ একইভাবে মূর্তি 'মানাতের' সাথে পরামর্শ করার লক্ষ্যে তার পেছনে এক বৃদ্ধা মহিলাকে দাঁড় করিয়ে নিজের একটি খোঁড়া পা'কে লম্বা করে দিয়ে অত্যন্ত কষ্ট করে এক পায়ে বিনয়ের সাথে 'মানাতের' ভূয়সী প্রশংসা শুরু করল। অতঃপর মানাতকে উদ্দেশ্য করে বলল :

'হে মানাত! নিঃসন্দেহে তুমি জানো, ইসলামের এই আহ্বানকারী যিনি মক্কা হতে এখানে এসেছে, তুমি ছাড়া তার মোকাবেলা করার আর কেউ নেই.....। সে এজন্যেই এখানে এসেছে, যেন তোমার ইবাদত হতে আমায়

বিরত রাখা যায়.....। আমি তার প্রচারিত খুব সুন্দর ও উত্তম কথা শোনার পরও তোমার সাথে পরামর্শ ব্যতীত তার কাছে 'বাইআত' করাকে কোনোক্রমেই পছন্দ করছি না। তাই তুমি আমাকে এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দাও'।

এতো কিছু বলে অনেক কাকুতি-মিনতি করার পরও 'মানাতের' পেছনে দণ্ডায়মান বৃদ্ধা কোনো জওয়াব দিচ্ছিল না। কেননা, সে মদীনার আবহাওয়াকে খুব ভালোভাবেই আঁচ করতে পেরেছিল। অতীতে বহু ভণ্ডামি করলেও এ ক্ষেত্রে সে তার পুনারাবৃত্তি করতে সাহস পাচ্ছিল না।

আমর ইবনুল জামূহ মনে করল যে, 'মানাত' বোধ হয় তার ওপরে রাগ করেছে। তাই সে 'মানাত'কে সম্বোধন করে বলল :

'মানাত, তুমি আমার প্রতি রাগ করেছ? তুমি মনে কষ্ট পাবে এমন কোনো পদক্ষেপ আমি নেবো না; কিন্তু আমার আপত্তির কিছু নেই। তোমাকে কয়েকদিনের সময় দিচ্ছি, তুমি একটু শান্ত হলে পুনরায় তোমার খিদমতে উপস্থিত হব। আশা করি, তখন তুমি আমাকে সঠিক পরামর্শ দানে ধন্য করবে।'

আমর ইবনুল জামূহ'র ছেলেরা একথা ভালো করেই জানত যে, পিতার অন্তরে মূর্তি 'মানাতের' প্রতি কত শ্রদ্ধা ও ভক্তি রয়েছে। দীর্ঘ জীবনে সে 'মানাতকে' অন্তরের গভীর থেকে ভক্তি করে আসছিল। কিন্তু ছেলেরা এ কথাও বুঝতে পারছিল যে, তাদের পিতার অন্তর দোদুল্যমান হয়ে উঠেছে। 'মানাতের' প্রতি অন্ধভক্তি ও শ্রদ্ধার স্থলে সন্দেহ ও সংশয় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে– এটাই ঈমানের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রথম লক্ষণ।

আমর ইবনুল জামূহ-এর ছেলেরা তাদের বন্ধু মু'য়ায বিন জাবালের সাথে শলাপরামর্শ শুরু করল, কিভাবে পিতার অন্তর থেকে মূর্তি 'মানাতের' প্রতি অন্ধবিশ্বাস সমূলে উৎপাটন করে তাকে ইসলামের ছায়াতলে টেনে আনা যায়। তারা সবাই মিলে রাতের আঁধারে মূর্তি 'মানাত'কে তার মন্দির থেকে উঠিয়ে নিয়ে সালামা গোত্রের আবর্জনার গর্তে নিক্ষেপ করে চুপিসারে ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। সকালবেলা আমর ইবনুল জামূহ নিত্যদিনের মতো শ্রদ্ধা নিবেদন করতে 'মানাতের' মন্দিরে প্রবেশ করল। তখন সে 'মানাতকে' না পেয়ে রাগে, ক্ষোভে

অস্থির হয়ে সবাইকে ধিক্কার দিতে শুরু করল। তার ভাষায় :

> 'তোমাদের প্রতি ধ্বংস নেমে আসুক, কে আমাদের দেবতাকে রাতে অপহরণ করেছ?'

কিন্তু কেউই এর দায়দায়িত্ব স্বীকার করল না। নিজের ছেলেরাই এ কাজ করেছে কি না ভেবে ঘরের আনাচে-কানাচে সে খোঁজাখুঁজি শুরু করল। কোথাও না পেয়ে সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলো এবং এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। সবাইকে ধমক দিয়ে শাসিয়ে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করল। পরিশেষে, সে সালামা গোত্রের ময়লা ও আবর্জনার গর্তে উল্টো মাথায় পড়ে থাকা অবস্থায় 'মানাত'কে দেখতে পেল। সে তাকে সেখান থেকে তুলে এনে যত্নের সাথে গোসল করিয়ে ধুয়ে-মুছে নানা ধরনের আতর ও সুগন্ধি মাখিয়ে যথাস্থানে রেখে দিয়ে বলল :

> 'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি যদি জানতে পারি যে, কে তোমার সাথে এ দুর্ব্যবহার করেছে, তাহলে নিশ্চয়ই আমি তাকে সমুচিত শিক্ষা দেব।'

পরদিন রাতে ছেলেরা তাদের বন্ধু মু'য়ায বিন জাবালসহ পূর্বের রাতের মতো 'মানাতকে' তুলে নিয়ে তার সারা গায়ে মলমূত্র মাখিয়ে সেখানেই ফেলে আসল। পরের দিন সকালে মু'আযের পিতা 'মানাতের' প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে পূর্বের ন্যায় তাকে দেখতে না পেয়ে অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে রাগে ও ক্ষোভে ফেটে পড়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিল। এবার তাকে আরও বিশ্রী অবস্থায় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখের সাথে তুলে এনে উত্তমরূপে গোসল করিয়ে আতর-সুগন্ধি মাখিয়ে ভক্তিভরে যথাস্থানে রেখে দিল।

পর দিন রাতেও ছেলেরা পূর্বের ন্যায় 'মানাত'কে সরিয়ে এনে একই অবস্থায় ময়লা আবর্জনার কূপে নিক্ষেপ করে আসে। সকালে আমর ইবনুল জামূহ অতিষ্ঠ হয়ে মানাতের গলায় একটি উন্মুক্ত তরবারি লটকিয়ে দিয়ে বলে দিল :

> 'হে মানাত! খোদার কসম! কে যে তোমার সাথে বার বার এরূপ দুর্ব্যবহার করছে তা তুমি নিশ্চয়ই জানো, তোমার মধ্যে প্রকৃত অর্থেই যদি কোনো সামর্থ্য ও শক্তি থাকে তাহলে এ তরবারি দিয়ে সেই দুষ্টকে প্রতিহত করবে। এই তলোয়ার তোমার সাথেই রইল।'

এই বলে সে ঘরে চলে আসে।

এদিকে ছেলেরা পিতার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখছিল, কখন তিনি গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হন। পিতা ঘুমিয়ে পড়লে তারা অত্যন্ত সংগোপনে ঝুলন্ত তলোয়ারটি নিজেরা নিয়ে মূর্তি 'মানাতকে' প্রতিবারের ন্যায় তুলে নিয়ে দূরে চলে যায়। বাড়ির পাশেই পাওয়া এক মৃত কুকুরকে রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে মানাতের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে মলমূত্র ও আবর্জনার গভীর গর্তের মাঝে নিক্ষেপ করে চলে আসে।

প্রতিদিনের ন্যায় ঘুম থেকে ওঠে তাদের পিতা আমর ইবনুল জামূহ্ বুকভরা আশা নিয়ে 'মানাতের' খিদমতে হাজিরা দিতে যাচ্ছিল এ আশায় যে, আজ একটু প্রাণভরে তাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন করবে; কিন্তু প্রতিদিনের ন্যায় আজও 'মানাতকে' স্বস্থানে না পেয়ে দ্রুত আবর্জনার সেই কূপের দিকে ছুটে গিয়ে দেখতে পেল, গলায় মৃত কুকুর বাঁধা অবস্থায় 'মানাত' উল্টোমুখো হয়ে পড়ে আছে এবং সাথে তলোয়ারটিও কে বা কারা উঠিয়ে নিয়ে গেছে। 'মানাতের' এই দুরবস্থা দেখে এবার সে আর তাকে উঠাতে অগ্রসর হলো না। তার মনে বিরাট পরিবর্তন এসে গেল। সারা জীবনের সমস্ত ভুল-ভ্রান্তি সে বুঝতে পারল। বৃথা ভক্তি-শ্রদ্ধার অসারতা উপলব্ধি করতে পেরে বলে উঠল :

وَاللّٰهِ لَوْ كُنْتَ اِلٰهًا لَمْ تَكُنْ اَنْتَ وَكَلْبٌ وَسْطَ بِئْرٍ فِىْ قَرَنٍ ـ

'আল্লাহর শপথ! তুমি যদি সত্যিই ইলাহ বা (দেবতা) হতে তাহলে তুমি এই মৃত কুকুরের সাথে একত্রে উল্টোমুখো হয়ে আবর্জনার গর্তে পড়ে থাকতে না।'

এই বলেই তিনি কালেমা শাহাদাতের উচ্চারণের মাধ্যমে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আমর ইবনুল জামূহ্ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অতীত মুশরিকী জীবনের প্রতিটি মুহূর্তের কথা চিন্তা করে লজ্জিত হতেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণ শুধুমাত্র মৌখিক স্বীকৃতিই ছিল না; বরং অন্তরের অন্তঃস্তল থেকেই তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তাঁর জান-মাল, সন্তান-সন্ততি সবকিছুই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্যে কুরবান করেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের মাত্র কিছুদিন পরই ওহুদের রণ-দামামা বেজে ওঠে। তাঁরই ছেলেরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে শহীদী মৃত্যু বরণ করে জান্নাতের সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে– ছেলেদের এই জোশ ও জযবা দেখে তাঁর

ভেতরে এক নবচেতনার সৃষ্টি হয়। তিনিও বার্ধক্যকে উপেক্ষা করে আল্লাহর রাসূলের নেতৃত্বে তাঁর জিহাদী ঝাণ্ডার নিচে শামিল হওয়ার জন্যে দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। কিন্তু তার ছেলেরা এই বৃদ্ধ বয়সে পিতাকে জিহাদে অংশ নিতে বারণ করলেন। কেননা, তাঁর যুদ্ধে অংশ গ্রহণের বয়স শেষ হয়ে গেছে, অধিকন্তু তাঁর একটি পা একেবারেই অচল। যেহেতু আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণ করা থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, সেহেতু ছেলেরা তাঁকে পরামর্শ দিল :

'হে আব্বা! যেহেতু আল্লাহ আপনাকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন, তাই আপনা থেকেই তা নিজের ওপর টেনে নেবেন না।'

ছেলেদের এই পরামর্শে বৃদ্ধ পিতা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে রাগে-ক্ষোভে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে ছেলেদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ দায়ের করলেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ছেলেরা এই সর্বোত্তম ইবাদত 'জিহাদ' থেকে আমাকে বিরত রাখার জন্যে পরামর্শ দিচ্ছে এবং তারা যুক্তি প্রদর্শন করছে, যেহেতু আমি বৃদ্ধ, খোঁড়া, তাই আমার জন্যে জিহাদ জরুরি নয়।'

আমি খোদার কসম করে বলছি :

'আমি এই খোঁড়া পা দিয়েই জান্নাতে প্রবেশ করব।'

আমর ইবনুল জামূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এই ঈমানী জযবা ও শাহাদাতের তামান্না দেখে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ছেলেদের ডেকে বললেন :

"دَعُوهُ، لَعَلَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَرْزُقُهُ الشَّهَادَةَ".

'তোমাদের পিতাকে জিহাদে যেতে দাও। এমনও হতে পারে এ জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁকে শাহাদাতের সম্মানে সম্মানিত করবেন।'

আল্লাহর রাসূলের আদেশের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে ছেলেরা তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্যে আর বাধা না দিয়ে মোবারকবাদ জানালেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে জিহাদে অংশ নেওয়ার অনুমতি পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত ও খুশি হয়ে আমর ইবনুল জামূহ

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বাড়িতে ফিরে এলেন। জিহাদের প্রস্তুতি নিয়ে বাড়ি থেকে রওয়ানা হওয়ার প্রাক্কালে তিনি স্ত্রীকে ডেকে তাঁর নিকট থেকে চিরদিনের জন্যে বিদায় নিলেন.......। অতঃপর কিবলামুখী হয়ে আকাশপানে দু'হাত তুলে দু'আ করলেন :

"اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِى الشَّهَادَةَ وَلَا تَرُدَّنِىْ إِلٰى اَهْلِىْ خَائِبًا".

'হে আল্লাহ! আমাকে শহীদী মৃত্যু দান করো। বিফল মনোরথ হয়ে আমাকে আমার পরিবার-পরিজনের মাঝে আর ফিরিয়ে এনো না।'

এরপর তিনি তাঁর তিন পুত্রসহ জিহাদে রওয়ানা হলেন। এ যুদ্ধে তিনিই ছিলেন বনূ সালামা গোত্রের সবচেয়ে বৃদ্ধ যোদ্ধা।

ওহুদের যুদ্ধে মুশরিক কুরাইশ বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের এক পর্যায়ে যখন মুসলমান যোদ্ধাদের মধ্যে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিল এবং লোকেরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধের ময়দানে ফেলে রেখে প্রাণভয়ে এদিক-সেদিক ছোটাছুটি করছিল, ঠিক সেই চরম মুহূর্তে আমর ইবনুল জামূহ ও তাঁর ছেলেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিরাপদ রাখার জন্যে কুরাইশ বাহিনীর উপর প্রাণপণে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন এবং তিনি চিৎকার করে করে বলছিলেন :

اِنِّىْ لَمُشْتَاقٌ إِلَى الْجَنَّةِ ، إِنِّىْ لَمُشْتَاقٌ اِلَى الْجَنَّةِ ...

'আমি অবশ্যই জান্নাত প্রত্যাশী, আমি অবশ্যই জান্নাত প্রত্যাশী, আমি অবশ্যই জান্নাতের প্রত্যাশী।'

ছেলে খাল্লাদ পিতার সাথে ছায়ার মতো লেগে থেকে তরবারি চালিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আসা আঘাতকে প্রতিহত করছিলেন। আল্লাহর অশেষ মহিমা পিতা-পুত্র উভয়েই কুরাইশদের প্রচণ্ড হামলায় মুহূর্তের ব্যবধানে শাহাদাতের তামান্না পূরণ করেন।

ওহুদ যুদ্ধ শেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারীদের দাফন কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে সাহাবীদের উদ্দেশ্য

করে বললেন :

خَلُّوْاهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَجِرَاحِهِمْ ، فَاَنَا الشَّهِيْدُ عَلَيْهِمْ"، ثُمَّ قَالَ : "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُكْلَمُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَسِيْلُ دَمًا، اَللَّوْنُ كَلَوْنِ الزَّعْفَرَانِ ، وَالرِّيْحُ كَرِيْحِ الْمِسْكِ، ثُمَّ قَالَ : اِدْفِنُوْا عَمْرَو بْنَ الْجَمُوْحِ مَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بِن عَمْرٍو ، فَقَدْ كَانَ مُتَحَابِّيْنَ مُتَصَافِّيْنَ فِى الدُّنْيَا ـ

'হে সাহাবীগণ! এই শহীদদের ক্ষতবিক্ষত দেহ রক্তমাখা অবস্থায় দাফন করো। কেননা আমি তাদের এই শাহাদাতের সাক্ষ্য দেব।

অতঃপর তিনি বলেন :

'এমন কোনো মুসলমান নেই, যে আল্লাহর পথে আহত হয়েছে অথচ সে কিয়ামতের দিন তার ক্ষত স্থান থেকে রক্ত প্রবাহিত অবস্থায় উঠবে না। যে রক্তের বর্ণ হবে জাফরানের মতো এবং যার সুগন্ধি হবে মিশ্‌ক আম্বরের ন্যায়।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমর ইবনুল জামূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আবদুল্লাহ বিন আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে একত্রে দাফন করার নির্দেশ দিলেন। কেননা, জীবিত অবস্থায় তারা পরস্পর অত্যন্ত পবিত্র ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন।

আমর ইবনুল জামূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং ওহুদের শহীদদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হোন, আল্লাহ তাঁদের কবরসমূহকে নূরের আলোয় উদ্ভাসিত করুন। আমীন!

---

আমর ইবনুল জামূহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ:

১. আল ইসাবা জীবনী নং ৫৭৯৯।

২. ছাফওয়াতুছ ছাফওয়া, ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা।

# আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদী (রা)

*'আমি তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে দলের পরিচালক (সর্ব প্রথম আমীরুল মুমিনীন) মনোনীত করব, যে তোমাদের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় সবচেয়ে বেশি ধৈর্য অবলম্বনে সক্ষম।'*

*–মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

আমরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন ঘনিষ্ঠ সাহাবী ও প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী সাহাবীদের অন্যতম আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে আলোচনা করছি। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাতা উমাইমা বিনতে আবদুল মুত্তালিব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফুফু। পরবর্তীতে তাঁর বোন উম্মুল মুমিনীন যায়নাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিয়ে করায় পুনরায় তাদের মধ্যে নতুনভাবে আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি হয়। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই সম্মানিত সর্বপ্রথম সাহাবী, যাকে 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি দিয়ে ইসলামের সামরিক ঝাণ্ডা সোপর্দ করা হয়েছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতের সূচনাকালে এবং 'দারুল আরকামে' প্রশিক্ষণমূলক কর্মসূচি শুরু করার পূর্বে আবদুল্লাহ ইবনে

জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করেন। মক্কায় কুরাইশদের অত্যাচারে যখন মুসলমানদের জানমাল একান্তই হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের মদিনায় হিজরত করার অনুমতি দেন। তিনিই হলেন দ্বিতীয় মুহাজির সাহাবী, যার পূর্বে আবূ সালামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছাড়া অন্য কেউ মদীনায় হিজরত করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেননি।

ঘর-বাড়ি, পরিবার-পরিজন ও জন্মভূমি ত্যাগ করে আল্লাহর দীনের হেফাযতের জন্য হিজরত করার অভিজ্ঞতা এটাই তার প্রথম নয়। এর পূর্বেও তিনি পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে হাবশায় হিজরত করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। তবে তাঁর এবারকার হিজরত পূর্বের তুলনায় পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক। মদীনা হিজরতে তাঁর ছেলে-মেয়ে, ভাইবোন, স্ত্রী পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়-স্বজন সহ সকলেই অংশগ্রহণ করেছেন। কেননা তাঁর সমগ্র পরিবারটিই ছিল ইসলামী পরিবার এবং সমগ্র গোত্রটিই ছিল ঈমানদারদের গোত্র। এবারের হিজরতের পর তাঁর বাড়িটি বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। মরুভূমির দমকা হাওয়া তাঁর ঘরের একদিকের জানালা দিয়ে প্রবেশ করে অন্যদিকের জানালা দিয়ে শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে যেত। মনে হতো, এই বিরাণ বাড়িটিতে কোনোদিন কেউ বাস করেনি। আর এখানে চা ও কফির আসরে সন্ধ্যায় কেউ একত্রিত হয়ে খোশ-গল্পেও রত থাকেনি।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হিজরতের মাত্র কয়েকদিন পর আবূ জাহল ও উতবা বিন রাবিয়ার নেতৃত্বে কুরাইশদের একটি দল মহল্লায় ঘুরে ঘুরে অনুসন্ধান চালাচ্ছিল যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কে কে মদীনায় হিজরত করে চলে গেছে, আর কে কে এখনো এখানে অবস্থান করছে। তারা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে পৌছে দেখতে পায় যে, জন-মানবহীন এই বিরাণ ঘরবাড়িগুলোর দরজা-জানালা দিয়ে দমকা বাতাসের সাথে ধুলাবালি প্রবেশ করে আসবাব পত্রের উপর একটি মোটা আবরণের সৃষ্টি করেছে। আর দমকা বাতাসের ঝাপটায় দরজা জানালাগুলো সজোরে আওয়াজ করছে। মনে হচ্ছিল বনূ জাহাশের পরিত্যক্ত ঘরবাড়িগুলো তাদের মালিকদের জন্যে ক্রন্দন করছে। বিরাণ বাড়িঘরগুলোর এই করুণ দশা

প্রত্যক্ষ করে আবূ জাহল বলে উঠল :

'তারা কোথায়? যাদের জন্যে আজ বাড়িঘরগুলো ক্রন্দন করছে?'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অত্যন্ত সুন্দর ও মূল্যবান আসবাবপত্র ও মনোরম বাড়িঘরের লোভ আবূ জাহলের পক্ষে সংবরণ করা সম্ভব হলো না। রাজা-বাদশাহগণ যেভাবে তাদের রাজ্যের ধন-সম্পত্তি যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করে, অনুরূপ আবূ জাহলও আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের বাড়িঘরগুলো দখল করে যথেচ্ছা ব্যবহার শুরু করল।

মদীনায় আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট তাঁর ঘরবাড়ি আবূ জাহেল কর্তৃক দখলের খবর পৌঁছলে তিনি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এ খবর জানালেন। এ কথা শুনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

أَلَا تَرْضَى يَا عَبْدَ اللّٰهِ، أَنْ يُّعْطِيَكَ اللّٰهُ بِهَا دَارًا فِى الْجَنَّةِ ـ

'হে আবদুল্লাহ! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আল্লাহ এর বিনিময়ে জান্নাতে তোমাকে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা দান করুন?'

প্রতি উত্তরে তিনি বললেন :

'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর রাসূল!'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় বললেন :

'তোমার জন্যে তাহলে জান্নাতের ঘরবাড়িই উত্তম।'

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে জান্নাতের সুসংবাদ শুনে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। আনন্দে তাঁর দু'চোখ জুড়িয়ে গেল।

প্রথম ও দ্বিতীয় দফা হিজরতের কারণে তাঁর ধন-সম্পত্তি ও সুখ-শান্তির অবসান হলো। মদীনায় তিনি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য জীবন যাপন করছিলেন। জীবনের এক বিরাট অংশে কুরাইশদের নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হওয়ার পর মদীনায় একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নিতে না নিতেই তাঁকে অত্যন্ত কঠিন এক পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। ইসলাম গ্রহণের পর থেকে এ পর্যন্ত তাঁকে আর এতো কঠিন

পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর এ ঈমানী পরীক্ষা ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা হয়ে আছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানী মদীনা মোনাওয়ারায় সামরিক তৎপরতা জোরদার করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এ লক্ষ্যে তিনি আট সদস্যবিশিষ্ট একটি সশস্ত্র প্লাটুন গঠন করলেন, যাদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু'র মতো সাহসী ও বুদ্ধিমান সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

> 'আমি তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তিকে বাহিনীর পরিচালক মনোনীত করব, যে তোমাদের মধ্যে ক্ষুৎপিপাসায় সবচেয়ে বেশি ধৈর্য অবলম্বনে সক্ষম।'

এই বলে তিনি এই সেনা দলের ঝাণ্ডা আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে সোপর্দ করলেন। তখন থেকেই আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথম আমীর হলেন, যাঁকে মুসলিম বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে তাঁর প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে নির্দেশ দানের পর একটি চিঠি হাতে দিয়ে বললেন :

> 'এই চিঠিটি দু'দিনের পথ অতিক্রম না করে খুলবে না।'

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে ইসলামের এই প্রথম গোয়েন্দা প্লাটুন মদীনা থেকে বিদায় নিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশমতো দু'দিনের পথ অতিক্রম করার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিঠিটি খুললেন। এতে হেদায়াত ছিল :

"اِذَا نَظَرْتَ فِىْ كِتَابِىْ هٰذَا فَامْضِ حَتّٰى تَنْزِلَ "نَخْلَةَ" بَيْنَ الطَّائِفِ ومَكَّةَ، فَتَرَصَّدْ بِهَا قُرَيْشًا وَقِفْ لَنَا عَلٰى اَخْبَارِهِمْ ..."

'আমার এই চিঠি পাঠ করার পর পুনরায় পথ চলতে থাক, যতক্ষণ পর্যন্ত না তায়েফ এবং মক্কার মাঝখানে একটি খেজুর বাগান না পাবে। এ বাগানের নিকট দিয়ে কুরাইশরা যাতায়াত করে। তোমরা সেখানে অতি সঙ্গোপনে অবস্থান নিয়ে তাদের গতিবিধি ও খবরাখবর আমাকে অবহিত করবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ চিঠিটি পাঠ করার সাথে সাথে বলে উঠলেন :

'আল্লাহর নবীর নির্দেশের প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত করলাম।'

অতঃপর তিনি তাঁর বাহিনীকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন সম্মুখপথের নির্দিষ্ট একটি খেজুর বাগান পর্যন্ত গিয়ে সেখানে অবস্থান নিয়ে কুরাইশদের গতিবিধির খবরাখবর ও তথ্যাদি সংগ্রহ করে তাঁকে পাঠাই। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে পর্যন্ত নিয়ে যেতে নিষেধ করেছেন। এই ঝুঁকিপূর্ণ পথে শাহাদাতের মৃত্যুকে অবধারিত জেনে তোমাদের মধ্যে যারা আমার সাথে যেতে ইচ্ছুক, শুধু তাদেরকেই সাথে নেব। আর যারা অসম্মতি জানাবে তারা নিঃসংকোচে ফিরে যেতে পারবে।'

এ কথা শুনে সাহাবীদের সকলেই সমস্বরে বলে উঠলেন :

'আমরা সকলেই রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্যে আনুগত্যের মস্তক অবনত করলাম। আল্লাহর রাসূল আপনাকে যে পর্যন্ত যেতে বলেছেন, আমরা সে পর্যন্ত আপনার সাথে যেতে অবশ্যই প্রস্তুত আছি।'

খেজুর বাগানের সন্নিকটে পাহাড়ের গা ঘেঁষে আঁকা-বাঁকা ও উঁচু-নিচু দুর্গম যে পথটি চলে গেছে, কুরাইশদের বহির্বিশ্বে যোগাযোগের একমাত্র পথ সেটিই। এই ঝুঁকিপূর্ণ স্থানে গিয়ে তারা অত্যন্ত সংগোপনে কুরাইশদের গতিবিধি ও খবরাখবর জানার জন্যে ওৎ পেতে রইলেন। দায়িত্ব পালনরত অবস্থার কোনো এক পর্যায়ে তারা দেখতে পেলেন :

আমর বিন হাদরামী, হাকাম বিন ফায়সাল, ওসমান বিন আবদুল্লাহ ও তার ভাই মুগাইরার সমন্বয়ে কুরাইশদের এক ব্যবসায়ী কাফেলা প্রচুর পরিমাণ কিসমিস,

চামড়ার সামগ্রী ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি নিয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ অবস্থায় কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়, সে ব্যাপারে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীরা সলা-পরামর্শ শুরু করলেন। নির্দিষ্ট দিবসটি ছিল 'আশহুরিল হুরুম' বা হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ নিষিদ্ধ মাসসমূহের শেষ দিন। তারা পরামর্শ করছিলেন :

> 'আজ যদি আমরা তাদের ওপর হামলা করি তাহলে তো নিষিদ্ধ মাসেই তাদের ওপর আক্রমণ করা হবে। আর তা হবে হারাম মাসেরই অবমাননা। যার ফলে সমগ্র আরবে এর মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে। আর যদি আমরা আজকের দিনের সুযোগ ছেড়ে দেই তাহলে তো আগামীকালই তারা হারাম শরীফের সীমানার ভিতরে প্রবেশ করবে। আর সেখানে আমাদের পক্ষ থেকে কোনো অভিযান পরিচালনার প্রশ্নই উঠে না। সেখানে তো সকলেরই জীবন ও সম্পদ নিরাপদ। মুশরিকরা তা মেনে না চললেও মুসলমানদের পক্ষে তো হারামের অবমাননা করা সম্ভব নয়।'

এসব বিষয়ের ভালোমন্দ উভয় দিক চিন্তা-ভাবনা করার পর শেষ পর্যন্ত তারা ঐদিনই তাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করে এ চারজনকে হত্যা করে কাফেলার সব কিছুকেই গনীমত হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে একমত হলেন। এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে তারা কুরাইশদের এই বাণিজ্য কাফেলার বিরুদ্ধে অভিযান চালালেন। এ অভিযানে কুরাইশদের একজন নিহত, দু'জন বন্দী ও চতুর্থ ব্যক্তি কোনো মতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হলো।

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তাঁর বাহিনীর অন্যান্য সাহাবীরা এই দুই কয়েদি এবং তাদের উট বহরের সমস্ত মাল সামান নিয়ে দ্রুত গতিতে মদীনার দিকে ধাবিত হলেন। মদীনায় পৌঁছে তাঁরা দু'বন্দীসহ এসব মালামাল রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ মাসসমূহে রক্তপাত করে কয়েদি ও তেজারতি দ্রব্যাদি নিয়ে আসায় তিনি এসব গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বললেন :

وَاللّٰهِ مَا اَمَرْتُكُمْ بِقِتَالٍ، وَاِنَّمَا اَمَرْتُكُمْ اَنْ تَقِفُوْا عَلٰى اَخْبَارِ قُرَيْشٍ، وَاَنْ تَرَصُدُوْا حَرَكَتَهَا ـ

'আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের রক্তপাত করতে নির্দেশ দেইনি; শুধু নির্দেশ দিয়েছিলাম, কুরাইশদের গতিবিধি ও খবরাখবর সংগ্রহের লক্ষ্যে ওৎ পেতে থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি আমাকে জানানোর জন্যে।'

কয়েদি দু'জনের ব্যাপারেও তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো ফায়সালা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। আর বাণিজ্যসম্ভার ও উটবহর থেকে একটি কপর্দক গ্রহণ করতেও তিনি অস্বীকৃতি জানালেন।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক ঘটনার নিন্দা, মালপত্র গ্রহণে অস্বীকৃতি ও তাদের কৃতকর্মের প্রতি ভর্ৎসনা করায় আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীরা যেন আসমান থেকে পড়লেন। রাসূলে কারীমের ইচ্ছা ও নির্দেশবিরোধী কাজ করে তারা নিশ্চিতভাবেই নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন ভেবে অত্যন্ত অনুতপ্ত হচ্ছিলেন। এ ঘটনার ফলে মদীনার গোটা পরিবেশ যেন তাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে আসছিল। তাদেরই একান্ত প্রিয় আনসার ও মুহাজির সঙ্গী সাথীরা তাদেরকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করতে শুরু করলেন। এমনকি তাদের সাথে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ করে দিলেন। যখন তাদের পাশ দিয়ে সাহাবীগণ যাতায়াত করতেন, তখন তাদের দিকে কটাক্ষ করে বলতেন :

'দেখো, এই চরমপন্থিরা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশের বিপরীত কাজ করেছে.........।'

এখানেই শেষ নয়, জীবনটা তাদের জন্যে অত্যন্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠল, এখন তারা এ কথাও জানতে পারলেন যে, মক্কার কুরাইশরা এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সমগ্র আরব গোত্রসমূহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড়ের সৃষ্টি করেছে। তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে বলে বেড়াচ্ছে :

'মুহাম্মদ হারাম মাসকে তার জন্যে হালাল করে ফেলেছে, এ মাসে সে রক্তপাতকে বৈধ করে নিয়েছে। ধন-সম্পত্তি লুট ও লোকদের বন্দী করা শুরু করে দিয়েছে।'

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীদের উপরে সমস্ত মুসলামানদের পক্ষ থেকে যে ধিক্কার ও ঘৃণা বর্ষণ হচ্ছিলো তা ছিল অবর্ণনীয়। একদিকে তাঁদের অনিচ্ছাকৃত ভুলের অন্তর্জ্বালায় তাঁরা দগ্ধ হচ্ছিলেন।

অপরদিকে তাঁদেরই ভুলের খেসারত হিসেবে তাঁদের প্রাণপ্রিয় নেতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ সারা বিশ্বে বিতর্কিত। এসব ভেবে দুশ্চিন্তা ও অনুশোচনায় আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তার সঙ্গী-সাথীর একবারে ম্রিয়মান হয়ে গেলেন। এ অবস্থায় তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটে যেতে খুবই লজ্জাবোধ করছিলেন।

ক্রমান্বয়ে অবর্ণনীয়ভাবে তাঁদের সামাজিক অবস্থার শোচনীয় অবনতি ঘটতে লাগল। তাদের ওপর যেন বিপদ-মুসীবতের একটি পাহাড় ভেঙে পড়ছিল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিলো, তখনকার গোটা প্রকৃতিই যেন তাদেরকে উপহাস করে বলছে :

'রাসূলের নির্দেশ অমান্য করেছো, এবার বোঝো মজা!'

এই শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থায় হঠাৎ করে একজন সাহাবী দৌড়ে এসে তাদের এ সুসংবাদ দিয়ে বললেন :

"بِأَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ قَدْ رَضِيَ عَنْ صَنِيْعِهِمْ، وَأَنَّهُ أَنْزَلَ عَلٰى نَبِيِّهِ فِيْ ذٰلِكَ قُرْاٰنًا".

'প্রিয় ভাইয়েরা! আপনাদের ঐ ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় আল্লাহ আপনাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়েছেন। শুধু তাই নয়, এ ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ওহী নাযিল করেছেন।'

এ সংবাদ প্রাপ্তির সাথে সাথে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সঙ্গীরা কী যে খুশি হয়েছিলেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এদিকে দলে দলে সাহাবীরা তাদের মোবারকবাদ জানানো ও একটু কোলাকুলি করার মানসে খুশির সাথে তাদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হওয়া কুরআনের সেই আয়াতগুলো তিলাওয়াত করতে করতে ছুটে আসছিলেন। তাদের উদ্দেশ্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ হলো :

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌ بِهٖ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ.

‘হে নবী! লোকেরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করে হারাম মাসে যুদ্ধ করা কী? আপনি বলে দিন, এ মাসে যুদ্ধ করা অন্যায়; কিন্তু আল্লাহর নিকট তা হতেও অধিক বড় অন্যায় হচ্ছে, আল্লাহর পথ হতে লোকদেরকে বিরত রাখা। আল্লাহকে অস্বীকার ও অমান্য করা, আল্লাহবিশ্বাসীদের জন্য মসজিদে হারামের পথ রুদ্ধ করা এবং হারাম শরীফের অধিবাসীদের সেখান থেকে বহিষ্কার করা আর বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা রক্তপাত হতেও মারাত্মক ব্যাপার। (আল কুরআন ২, সূরা বাকারা ২১৬)

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীদের কার্যক্রমের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার পর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও অত্যন্ত খুশি হলেন এবং হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। আল্লাহ এ আয়াত নাযিলের মাধ্যমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে সমগ্র আরব বিশ্বে কুরাইশদের প্রোপাগান্ডার ওপর যেন জ্বলন্ত আগুনে পানি ঢেলে দিলেন। শুধু তাই নয়, সমস্ত আরববাসীদের জানিয়ে দেওয়া হলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীদের কৃতকর্মের চেয়ে কুরাইশদের কৃতকর্ম ছিল আরও জঘন্য এবং ঘৃণিত।

অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের সাথে উট বহরের সমস্ত মালপত্র গ্রহণ করলেন। মুক্তিপণ আদায় করে বন্দীদের মুক্তি দিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। কেননা, তাদের এই অভিযান মুসলমানদের ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়ের রচনা করেছে। তাদের এই উটবহর ইসলামের সর্বপ্রথম গণীমত, মুসলমানদের ওপর যুলুম-নির্যাতন ও জানমালের ক্ষয়-ক্ষতির প্রথম প্রতিশোধ। এরাই মুসলমানদের হাতে প্রথম বন্দী। আর এই ঝাণ্ডাই ইসলামের প্রথম জিহাদী ঝাণ্ডা, যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে সোপর্দ করেছিলেন। আর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুই এই প্রথম ব্যক্তি, যাঁকে ‘আমীরুল মু’মিনীন’ বলে সম্বোধন করা হয়েছিল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদেরকে ওহুদের রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানালেন। আল্লাহর রাসূলের ডাকে সাড়া দিয়ে যার যা আছে তা নিয়েই মুসলমানরা ওহুদের যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ যুদ্ধে মুসলমানদের অত্যন্ত কঠিন ঈমানী পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এতে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমানী পরীক্ষা ছিল সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ওহুদ যুদ্ধে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথী সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের মাঝে যে ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল, তা সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাসের বর্ণনায় নিম্নরূপ :

'ওহুদ যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে আবদুল্লাহ্ ইবনে জাহাশের সাথে আমার দেখা হলো। তিনি আমাকে বললেন :

'চলো না আমরা একটু আল্লাহর কাছে দু'আ করি।'

আমি তাকে বললাম :

'ঠিক আছে।'

অতঃপর আমরা একটু নিরিবিলি স্থানে গিয়ে আল্লাহর কাছে মোনাজাত শুরু করলাম। আমি বললাম :

"يَا رَبِّ إِذَا لَقِيْتُ الْعَدُوَّ فَلَقِّنِيْ رَجُلًا شَدِيْدًا بَأْسُهُ، شَدِيْدًا حَرْدُهُ أُقَاتِلُهُ وَيُقَاتِلُنِيْ، ثُمَّ ارْزُقْنِي الظَّفَرَ عَلَيْهِ حَتّٰى أُقَاتِلَهُ وَآخُذَ سَلَبَهُ، فَأَمَّنَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَحْشٍ عَلٰى دُعَائِيْ".

'হে আল্লাহ! যুদ্ধ শুরু হলে আমাকে সবচেয়ে শক্তিশালী, তেজস্বী ও এমন এক বীর যোদ্ধার সম্মুখীন করো, মুসলমানদের প্রতি যার হামলা হবে অত্যন্ত ক্ষীপ্র ও দুর্ধর্ষ। আমি তাকে চ্যালেঞ্জ করব এবং সেও আমাকে চ্যালেঞ্জ করবে। প্রচণ্ড লড়াইয়ের এক পর্যায়ে তুমি তার উপর আমাকে বিজয় লাভ করার তাওফীক দান করবে। এমনকি আমি যেন উন্মুক্ত তরবারির আঘাতে তাকে দ্বি-খণ্ডিত করে তার সমস্ত অস্ত্র গনীমত হিসেবে ছিনিয়ে নিতে পারি। আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশও আমার সাথে সাথে হাত তুলে আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দু'আর সমর্থনে বলছিলেন আমীন! আমীন!'

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দু'আ করা শুরু করলেন :

"اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنِىْ رَجُلًا شَدِيْدًا، حَرَدَهٗ شَدِيْدًا بَأْسُهٗ اُقَاتِلُهٗ فِيْكَ وَيُقَاتِلُنِىْ، ثُمَّ يَأْخُذُنِىْ فَيَجْدَعُ اَنْفِىْ وَاُذُنِىْ فَاِذَا لَقِيْتُكَ غَدًا، قُلْتَ : فِيْمَ جُدِعَ اَنْفُكَ وَاُذُنُكَ؟ فَاَقُوْلُ : فِيْكَ وَفِىْ رَسُوْلِكَ، فَتَقُوْلُ : صَدَقْتَ ..."

'হে আল্লাহ! তুমি আমাকেও একজন শক্তিশালী বীর যোদ্ধার সম্মুখীন করো, যে অত্যন্ত বিক্রমের সাথে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমি শুধু তোমার সান্নিধ্য লাভের জন্যে উন্মুক্ত তরবারি হাতে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ব। যুদ্ধের এক চরম মুহূর্তে তার তলোয়ারের আঘাতে যেন আমি শাহাদাতের মৃত্যুর সুধা পান করতে পারি। আর সে তোমার দীনের বিরোধী সৈনিক হওয়ার কারণে আমার উপর বিজয়ী হওয়ার খুশিতে সে যেন আমার নাক ও কান কেটে আমার মৃতদেহকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয় এবং কাল কিয়ামতের দিন তোমার সামনে দণ্ডায়মান হলে যখন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে, 'কী উদ্দেশ্যে তুমি তোমার নাক এবং কানকে বিচ্ছিন্ন করেছ'? তখন আমি যেন বলতে পারি, 'হে আল্লাহ! শুধু তোমার ও তোমার রাসূলের সৈনিক হওয়ার কারণে। তখন তুমি বলবে, 'সাদ্দাকতা, তুমি সত্য বলেছ।'

সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'ওহুদের ময়দানে আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের দু'আ আমার দু'আ অপেক্ষা লাখো কোটি গুণ উত্তম ছিল। ওহুদ যুদ্ধের শেষ বেলায় আমি আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশকে শহীদ অবস্থায় তাঁর দেহকে নাক কান কাটা অবস্থায় দেখতে পেলাম। তাঁর লাশের পাশেই একটি গাছের ডালে তাঁর কর্তিত নাক ও কান ঝুলছিল।'

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দু'আ কবুল করেছিলেন। ওহুদের যুদ্ধে তাঁকে শাহাদাতের সর্বোত্তম মর্যাদায় ভূষিত করেছিলেন, যেমন ভূষিত করেছিলেন সাইয়েদুশ শুহাদা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে।

যুদ্ধশেষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইসলামের এই সু-মহান আদর্শ সৈনিক আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ ও হামযা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে একই কবরে রক্তাক্ত অবস্থায় দাফন করেন। আল্লাহর রাহে কুরবানী দেওয়া তাদের এই পূত-পবিত্র রক্ত চিরদিন মুসলমানদের শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা পোষণের অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে থাকবে এবং সেদিকেই হাতছানি দিয়ে ডাকবে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানকে তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণের তাওফীক এনায়েত করুন। আমীন!

---

আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আল আসাদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইছাবা জীবনী নং ৪৫৭৪।

২. ইমতাউল আসমা, ১ম খণ্ড, ৫৫ পৃ.।

৩. হুলিয়াতুল আউলিয়া, ১ম খণ্ড, ১০৮ পৃ.।

৪. হুসনুস্ সাহাবা, ৩০০ পৃ.।

৫. মাজমুয়াতুল অসায়েক আছ ছিয়াছিয়্যাহ, ৮ পৃ.।

# আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা)

*'প্রত্যেক উম্মতের একজন 'আমীন' থাকে। আর আমার উম্মাতের আমীন হচ্ছে, আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ।'*

*—রাসূলে কারীম (স)-এর উক্তি*

হালকা পাতলা গড়ন, লম্বাকৃতি দেহ, হাস্যোজ্জ্বল চেহারা, ধীর-স্থির শান্ত-শিষ্ট মেজাজ, লাজ-নম্র, অমায়িক ব্যবহার, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, সদালাপী ও মিষ্টভাষী, দ্রুতগামী এবং কর্মতৎপর হিসেবে খ্যাত এমন এক ব্যক্তি, যার মনে গর্ব ও অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না। কিন্তু রণক্ষেত্রে তিনিই যেন ঝলসে ওঠা তীক্ষ্ণধার তরবারি ও গর্জে ওঠা এক সিংহ শার্দুল এবং প্রতিকূল পরিবেশে দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন এক বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। ইতিহাস খ্যাত এ ব্যক্তিই মুসলিম উম্মাহর 'আমীন' আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুল জাররাহ আল ফেহরী আল কুরাইশী। যিনি ছোট-বড় সবার নিকট আবূ উবায়দা আল জাররাহ নামে পরিচিত।

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর প্রশংসায় বলেছেন :

> 'গভীর পাণ্ডিত্য, চারিত্রিক মাধুর্য এবং শালীনতায় কুরাইশ বংশে তিন ব্যক্তি বিশেষভাবে খ্যাতি লাভ করেন। তারা যদি আপনার প্রশংসা করেন, তাতে মিথ্যা অতিরঞ্জন থাকবে না এবং আপনিও যদি তাদের প্রশংসা করতে চান, তাতেও কোনো অসত্যের আশ্রয় নিতে হবে না। তাঁরা হলেন :

'আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের দ্বিতীয় দিনে তাঁরই প্রচেষ্টায় তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আবদুর রহমান ইবনে আউফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওসমান ইবনে মাযউন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আরকাম ইবনে আবিল আরকাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। তাঁরা কালেমা তাওহীদের ঘোষণার মাধ্যমে একই সাথে তাঁর হাতে বাই'আত গ্রহণ করেন। এ পাঁচ ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত সাংগঠনিক কাঠামোই হলো পরবর্তী সময়ে ইসলামের সুমহান প্রাসাদের ভিত্তি।

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মাক্কী জীবন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটাই অগ্নিপরীক্ষার এক দুর্বিষহ জীবন। প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী অন্যসব সাহাবীদের মতো তিনিও আর্থিক সংকট, দুঃখ-কষ্ট, নির্যাতন ও নিপীড়নের শিকার হয়েছেন; কিন্তু আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমানী পরীক্ষা ইতিহাসে আদর্শের যে কোনো অনুসারীর বিচারে এক বিরল ঘটনা।

প্রতিটি ঈমানী পরীক্ষাতেই তিনি ধৈর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে সমুন্নত করেছেন। কিন্তু বদরের যুদ্ধে তাঁর অকল্পনীয় ঈমানী পরীক্ষা অতীতের সব পরীক্ষাকে ম্লান করে দিয়েছে।

বদর প্রান্তরে তুমুল যুদ্ধের এক পর্যায়ে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুর পরওয়া না করে প্রচণ্ড আক্রমণে শত্রুবাহিনীর দুর্ভেদ্য ব্যূহকে ছত্রভঙ্গ করতে সমর্থ হন, এতে মুশরিকদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়ে যায়। এ সুযোগে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জীবনের ঝুঁকি উপেক্ষা করে শত্রুবাহিনীকে ধরাশায়ী করতে করতে সম্মুখপানে অগ্রসর হচ্ছিলেন ও তাঁর চতুর্দিকে ঘুরেফিরে আক্রমণ চালাচ্ছিলেন। কুরাইশ বাহিনীও বার বার তাঁকে

প্রতিরোধ করার ব্যর্থ চেষ্টায় লিপ্ত ছিল। এরই ফাঁকে শত্রুবাহিনীর ব্যূহ থেকে এক ব্যক্তি আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বার বার চ্যালেঞ্জ করছিল। তিনিও আক্রমণের গতি পরিবর্তন করে প্রতিবারই তার সে চ্যালেঞ্জ এড়িয়ে যাচ্ছিলেন। আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ দুর্বলতার এক সুযোগে হঠাৎ সে তাঁর ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে বসল। তিনি তড়িৎ গতিতে পাশ কাটিয়ে গেলে অল্পের জন্য রক্ষা পেলেন। সে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে শত্রু নিধনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। ধৈর্যহীনতার চরম পর্যায়ে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তরবারির প্রচণ্ড এক আঘাতে তার শির দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ল।

প্রিয় পাঠক! ভূলুণ্ঠিত এ ব্যক্তি কে? পূর্বেই আলোচনা করেছি, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঈমান সর্বকালের কঠিন অগ্নিপরীক্ষায় এমনভাবে উত্তীর্ণ যে, তা কোনো কল্পনাকারীর কল্পনারও ঊর্ধ্বে। স্তম্ভিত হবেন, ভূলুণ্ঠিত ব্যক্তির পরিচয়ে। সে আর কেউ নয়, সে হলো আবূ উবায়দার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহ।

এ ক্ষেত্রে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর পিতাকে হত্যা করেননি। তিনি হত্যা করেছেন, পিতার অবয়বে শিরকের প্রতিমূর্তিকে। মহান আল্লাহ তাঁর ও পিতার মাঝে সংঘটিত এ ঘটনা সম্পর্কে আল কুরআনের আয়াত নাযিল করলেন :

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْآ اٰبَآءَهُمْ اَوْ اَبْنَآءَهُمْ اَوْ اِخْوَانَهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولٰٓئِكَ كَتَبَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْاِيْمَانَ وَاَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ اُولٰٓئِكَ حِزْبُ اللّٰهِ اَلَآ اِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ

'তুমি পাবে না আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাসী এমন কোনো সম্প্রদায়, যারা ভালোবাসে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে হোক না এই

> বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র ভ্রাতা অথবা তাদের জ্ঞাতি-গোত্র। এদের অন্তরে আল্লাহ্ সুদৃঢ় করে দিয়েছেন ঈমান এবং তাদের শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ দ্বারা। এদের প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত, সেথায় তারা স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। আল্লাহ্ তাদের প্রতি প্রসন্ন, এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তারাই আল্লাহ্‌র দল। জেনে রাখো, আল্লাহ্‌র দলই সফলকাম হবে।'

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে এমনটি ঘটা আশ্চর্যের কিছুই ছিল না। আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর দৃঢ় ঈমান, ইসলামী আদর্শের কল্যাণকামিতায় এবং উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আমানতদার ও বিশ্বাসভাজন হওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান ছিল শীর্ষে। যে কারণে অনেক মহান ব্যক্তি আল্লাহ্‌র দরবারে তাঁর সমকক্ষ মর্যাদা পেতে আগ্রহী ছিলেন।

মুহাম্মদ ইবনে জাফর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এক সময় খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল :

> 'হে আবুল কাশেম! আপনার সাহাবীদের মধ্য থেকে আমাদের জন্য এমন এক ব্যক্তিকে মনোনীত করে দিন, যিনি আমাদের অর্থ-সম্পত্তির কিছু বিষয়ে সৃষ্ট বিবাদের সুষ্ঠু ফায়সালা করে দিতে পারবেন। আপনারা আমাদের কাছে খুবই আস্থাভাজন সম্প্রদায়।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন :

> 'তোমরা বিকেলে এখানে এসো, আমি তোমাদের সাথে অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ এক ব্যক্তিকে পাঠাব।'

ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন :

> 'সারা জীবনে শুধু এবারই ঐ গুণের অধিকারী হওয়ার জন্য আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। যদিও নেতৃত্ব লাভ কখনো আমি পছন্দ করিনি। তাই সে উদ্দেশ্যে একটু আগেভাগেই আমি যোহরের নামাযের জন্য মসজিদে গিয়ে হাজির হই। নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডানে ও বাঁয়ে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলেন। আমি সে মুহূর্তে একটু উঁচু হয়ে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নজরে পড়ার জন্য চেষ্টা করতে লাগলাম। তিনি এদিক-সেদিক দেখতে লাগলেন। অবশেষে তিনি আবূ উবায়দা ইবনুল জাররাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখতে পেলেন এবং তাকে ডেকে বললেন :

'তুমি তাদের সাথে যাও এবং বিবাদটির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করে দাও।'

'আমি মনে মনে বললাম, আবূ উবায়দা এ গুণটির অধিকারী হয়ে গেল।'

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তিই শুধু ছিলেন না; বিশ্বস্ততার সাথে ছিল শক্তি এবং একাধিক ক্ষেত্রে তিনি সেই শক্তির প্রমাণও দিয়েছেন। কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ আরম্ভের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বাণিজ্য কাফেলাকে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে মুহাজির সাহাবীদের সমন্বয়ে সুসজ্জিত যোদ্ধাদের একটি বাহিনীকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলে, তাদের সিপাহসালার হিসেবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেই মনোনীত করেন। ঐ অভিযানে তিনি ত্যাগ ও কষ্টসহিষ্ণুতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায়কালে তাদের রসদবাবদ মাত্র এক ঝুড়ি খেজুর ছাড়া আর কিছুই দিতে পারেননি। আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীর সদস্যদের প্রত্যেককে প্রতিদিন মাত্র একটি করে খেজুর রেশন হিসেবে বরাদ্দ করতেন। স্তন্য পানকারী শিশুদের মতো সারাদিনে তারা একটিমাত্র খেজুর চুষে খেতেন এবং তারপর পানি পান করতেন, এভাবে সবাই গোটা একটা দিন অতিবাহিত করতেন।

ওহুদ যুদ্ধে মুসলমানগণ এক পর্যায়ে পরাজয়ের সম্মুখীন হলেও মুশরিক বাহিনীর একজন চিৎকার করে বলছিল :

'আমাকে দেখিয়ে দাও মুহাম্মদকে।'

সেই চরম মুহূর্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে দশজন সাহাবী তাঁকে রক্ষা করার জন্য ঘিরে রেখেছিলেন, আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন তাদের অন্যতম।

এ যুদ্ধে শত্রুদের আঘাতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি দন্ত মোবারক শহীদ হয়ে যায়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরস্ত্রাণ ভেঙে এর দুটি পেরেক তাঁর মাথায় ঢুকে পড়ে। আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক থেকে তা বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন; কিন্তু আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আপনি কাজটি আমাকে করতে দিন।'

আবূ বকর ছিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর অনুরোধে সাড়া দিয়ে তাঁকেই কাজটি করার সুযোগ দিলেন। আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আশঙ্কাবোধ করছিলেন যে, যদি হাতের সাহায্যে পেরেক দু'টি টেনে বের করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীষণ কষ্ট পাবেন। তাই তিনি দাঁত দিয়ে তা টেনে বের করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

প্রথমবারে একটি বের হয়ে এলেও আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনের একটি দাঁত ভেঙে যায়, দ্বিতীয় বারে অপরটিও বেরিয়ে আসে; কিন্তু এবারও তাঁর সামনের অপর একটি দাঁত ভেঙে যায়। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'আবূ উবায়দা ছিলেন সামনের দুটি দাঁত ভাঙা সর্বাপেক্ষা সুদর্শন ব্যক্তি।'

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাত পর্যন্ত তাঁর সাথে সমস্ত যুদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ দাওয়াতী ও রাষ্ট্রীয় কাজে অংশ নেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে খিলাফাতের বাইআতের দিন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সম্বোধন করে বললেন :

'আপনার হাতটা বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি বাইআত করতে পারি। কারণ, আমি রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 'প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই একজন আমীন বা বিশ্বস্ত ব্যক্তি থাকেন, এ উম্মতের মধ্যে আপনিই 'আমীন'। অতএব আপনিই এর একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি।'

এ কথা শুনে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

> ‘এমন এক ব্যক্তিকে রেখে কখনোই নিজে খিলাফতের বাইআত নিতে পারি না, যাঁকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবদ্দশাতেই আমাদের জন্য নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনিই আমাদের ইমামতি করেন।’

অতঃপর আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতেই খিলাফতের বাইআত করা হয়। তাই হকের ব্যাপারে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য উত্তম উপদেশদাতা ও সর্বাপেক্ষা অধিক সহযোগিতা দানকারী ছিলেন।

আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইনতিকালের পর আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে খিলাফতের বাইআত গ্রহণ করেন। আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর একান্ত অনুগত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

সারা জীবনে মাত্র একবার ছাড়া আর কখনো তিনি খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নির্দেশ পালনে অনীহা দেখাননি।

প্রিয় পাঠক! কী সেই নির্দেশ, যেটি পালন করতে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন?

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়া বিজয়ের প্রাক্কালে যখন মুসলিম বাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে একের পর এক বিজয় ছিনিয়ে আনছিলেন, তখন তিনি পূর্বে ফোরাত নদী এবং উত্তরে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তাঁর বিজয়ের সীমানা বিস্তৃত করেন। অব্যাহত গতিতে এ বিজয় চলাকালে সিরিয়ায় হঠাৎ নজীরবিহীন মহামারি দেখা দেয় এবং তাতে ব্যাপকভাবে মানুষ মারা যেতে থাকে। এ সময় আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একখানা পত্র দিয়ে একজন দূত প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লিখেন :

إِنِّي بَدَتْ لِيْ إِلَيْكَ حَاجَةٌ لَاغِنى لِيْ عَنْكَ فِيْهَا، فَإِنْ أَتَاكَ كِتَابِيْ لَيْلًا فَإِنِّيْ أَعْزِمُ عَلَيْكَ أَلَّا تُصْبِحَ حَتّى تَرْكَبَ إِلَيَّ، وَإِنْ أَتَاكَ نَهَارًا فَإِنِّيْ أَعْزِمُ عَلَيْكَ أَلَّا يُمْسِيَ حَتّى تَرْكَبَ إِلَيَّ .

'অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে আমি বিশেষভাবে মদীনায় আপনার উপস্থিতি কামনা করছি। আপনার নিকট এ নির্দেশনামা রাতে পৌঁছলে ভোর হওয়ার পূর্বে এবং দিনে পৌছলে সূর্যাস্তের পূর্বে অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করে আমার কাছে চলে আসবেন বলে আশা করছি।'

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খালীফাতুল মুসলিমীনের এ নির্দেশনামা পাঠ করে বললেন :

'আমার কাছে আমীরুল মুমিনীনের কী প্রয়োজন, তা আমি বুঝতে পেরেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে জীবিত রাখতে চাচ্ছেন, যার বেঁচে থাকার কথা নয়।'

অতঃপর তিনি আমীরুল মুমিনীনকে লিখলেন :

'আমীরুল মুমিনীন, আপনার সমীপে আমার প্রয়োজনীয় বিষয়টা বুঝতে পেরেছি। আমি মুসলিম সৈন্যবাহিনীর দায়িত্বে নিয়োজিত। তারা মহামারীতে আক্রান্ত। তাদেরকে বিপদে রেখে আমি নিজে নিরাপদ স্থানে যাওয়া মোটেই পছন্দ করছি না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর পক্ষ থেকে মৃত্যু আমাকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন না করেছে; ততক্ষণ আমি তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাচ্ছি না। আমার এ পত্র আপনার কাছে পৌছার পর আমাকে ঐ নির্দেশ থেকে অব্যাহতি দান করবেন এবং আমাকে এখানে অবস্থান করার অনুমতি দান করবেন।'

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পত্র পাঠের পর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ থেকে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে থাকল, তাঁর এ অস্বাভাবিক কান্না দেখে তাঁর পাশে যারা উপস্থিত ছিলেন তারা বললেন :

'হে আমীরুল মুমিনীন! আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি মৃত্যুবরণ করেছেন?'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'না, বরং মৃত্যু তাঁর অতি নিকটে এসে পৌছেছে।'

উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ধারণা মিথ্যা ছিল না, অল্পদিনের মধ্যে আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহামারীতে আক্রান্ত হলেন! মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁর বাহিনীকে অন্তিম উপদেশ দিয়ে বললেন :

إِنِّىْ مُوْصِيْكُمْ بِوَصِيَّةٍ إِنْ قَبِلْتُمُوْهَا لَنْ تَزَالُوْا بِخَيْرٍ : أَقِيْمُوْا الصَّلٰوةَ، وَصُوْمُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ وَتَصَدَّقُوْا، وَحُجُّوْا وَاعْتَمِرُوْا، وَتَوَاصَوْا، وَانْصَحُوْا لِامَرَائِكُمْ وَلَاتَغُشُّوْهُمْ وَلَاتُلْهِكُمُ الدُّنْيَا، فَإِنَّ الْمَرْءَ لَوعُمِّرَ أَلْفَ حَوْلٍ مَاكَانَ لَه بُدٌّ مِنْ أَنْ يَصِيْرَ إِلٰى مَصْرَعِى هٰذَا الَّذِىْ تَرَوْنَ... وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ-

'আমি তোমাদেরকে অন্তিম কিছু উপদেশ দিতে চাই। যদি তা গ্রহণ কর তাহলে সর্বদা তোমাদের কল্যাণ হতে থাকবে। নামায কায়েম করবে, রমযান মাসে রোযা রাখবে, যাকাত দিবে, হজ্জ ও উমরাহ পালন করবে, পরস্পরের মঙ্গল কামনা করে অসিয়ত করবে। আমীরদের পরামর্শ দান করবে, তাদেরকে ধোঁকা দেবে না এবং দুনিয়াদারী যেন তোমাদেরকে অন্য সবকিছু থেকে গাফেল করে না দেয়। কেননা, যদি কাউকে হাজার বছরও আয়ুষ্কাল দান করা হয় তবুও একথা নিশ্চিত যে, তাকেও একদিন এমনিভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। যেভাবে এ মুহূর্তে তোমরা আমাকে হতে দেখছ।'

এরপর তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'আস্সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ'

অতঃপর তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দিকে ফিরে বললেন :

'হে মুয়ায, মুসলিম বাহিনীর নামাযের ইমামতি করাও।'

এর অল্পক্ষণ পরেই তাঁর পবিত্র রূহ ইহজগতের মায়া ত্যাগ করে চলে গেল। তখন মুয়ায রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন :

'প্রিয় ভাইয়েরা! আপনারা এমন এক ব্যক্তিকে হারিয়েছেন, খোদার শপথ! যাঁর মতো প্রশস্ত অন্তরের মানুষ আমার জানা মতে আর নেই, তাঁর মন সর্বপ্রকার হিংসা-বিদ্বেষ থেকে ছিল পবিত্র। সঙ্গী-সাথীদের ভুল-ক্রটিতে দয়াশীল ও ক্ষমাসুলভ আচরণে তাঁর কোনো জুড়ি ছিল না। তাঁর মতো জনগণের এতো বড় কল্যাণকামীও আর কেউ ছিল না, তাঁর প্রতি সদয় হোন। আল্লাহ্ আপনাদের প্রতি সদয় হবেন।'

---

আবূ উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমূহ :


১. তাবাকাত ইবনে সা'দ। ৪র্থ খণ্ডে সূচী দ্রষ্টব্য।
২. আল ইসাবা : জীবনী নং ৪৪০০।
৩. আল ইসতিয়াব : ৩য় খণ্ড ২য় পৃ.।
৪. হুলিয়াতুল আউলিয়া : ১ম খণ্ড ১০০ পৃ.।
৫. আল বদয়ু ওয়াত্ তারিখ : ৫ম খণ্ড ৮৭ পৃ.।
৬. ইবনে আসাকের : ৭ম খণ্ড ১৫৭ পৃ.।
৭. সিফাতুচ্ছাফ্ওয়া : ১ম খণ্ড ১৪২ পৃ.।
৮. আশ্হারু মাশাহিরুল ইসলাম : ৫০৪ পৃ.।
৯. তারিখুল খামিস : ২য় খণ্ড ২৪৪ পৃ.।
১০. আর রিয়াদ আন নাদরা : ৩০৭ পৃ.।
১১. তাবাকাতুস সাআদাহ্।

# আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)

*'যে মধুর সুরে কুরআন অবতীর্ণ, কেউ যদি সেই সুরে কুরআন তিলায়াত করতে চায়, তাহলে সে যেন ইবনে 'উম্মে আবদ' অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করে।'*

*- রাসূলে কারীম (স)-এর উক্তি*

সবার প্রিয়, কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে মক্কার লোকেরা ইবনে উম্মে আবদ বলে ডাকত। জনপদ থেকে বেশ দূরে মক্কার পাহাড়ি রাস্তায় জনৈক কুরাইশ সর্দার 'উকবা ইবনে মু'আইতে'র বকরি চড়ানোই ছিল তাঁর একমাত্র কাজ।

মক্কায় নবীর আগমনের সংবাদ সে শুনত বটে; কিন্তু একদিকে অপরিণত বয়স এবং অপরদিকে মক্কার জনপদ থেকে দূরে থাকার কারণে তাঁর নিকট এর তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। সকালে উকবার বকরির পাল নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া এবং রাতে প্রত্যাবর্তন ছিল তাঁর নিত্যদিনের অভ্যাস।

মক্কার অধিবাসী এ কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ একদিন দেখতে পেল, ব্যক্তিত্বের অধিকারী শ্রদ্ধাভাজন দুই জন ব্যক্তি দূর থেকে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছেন, তাদের চোখে-মুখে প্রচণ্ড ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। প্রচণ্ড পিপাসায় তাদের ঠোঁট ও কণ্ঠনালী শুস্ক। তারা কিশোর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে এসে পৌছলে তাঁকে সালাম দিয়ে বললেন :

'ওহে বালক! বকরির মধ্য থেকে একটিকে দোহন করে আমাদেরকে দাও, যাতে আমরা আমাদের পিপাসা দূর করে পরিতৃপ্ত হতে পারি।'

বালক উত্তর দিল :

'আমি বকরির মালিক নই, আমি এর রক্ষক ও আমানতদার মাত্র।'

বালকের উত্তরে তারা বিরক্তি প্রকাশ করলেন না বরং তাদের মুখমণ্ডলে আনন্দের আভাস ফুটে উঠল এবং তাদের একজন বালককে বললেন :

'তবে এমন একটি বকরি দেখিয়ে দাও, যা এখনো পর্যন্ত এক বারের জন্যও গাভিন হয়নি।'

বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ পাশেরই একটি বকরির বাচ্চার দিকে ইশারা করল। তাদের একজন এগিয়ে গিয়ে বকরির বাচ্চাটিকে ধরে বিসমিল্লাহ বলে তার পালানে হাত বুলাতে আরম্ভ করল। বালক আবদুল্লাহ হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে মনে মনে বলতে লাগল :

'পাঁঠা দেখেনি, এমন বকরির বাচ্চা কখনো দুধ দেয় নাকি?'

কিন্তু বকরির বাচ্চার পালান দেখতে দেখতে স্ফীত হয়ে উঠল এবং তা থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ বেরিয়ে আসতে লাগল। অন্য ব্যক্তিটি বাটির ন্যায় একটি পাথর এনে ধরলেন এবং তা দুধে পূর্ণ হয়ে গেল। এবার তাঁরা উভয়েই দুধ পান করলেন এবং আমাকেও পান করালেন। কিন্তু আমি যা দেখলাম, তা যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। পরিতৃপ্তির সাথে আমাদের দুধ পান করার পর বরকতময় ব্যক্তিটি বকরির পালানকে লক্ষ্য করে বললেন :

'পূর্বাবস্থায় ফিরে যাও।'

দেখতে দেখতেই তা চুপসে যেতে থাকল এবং পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল। এবার আমি সেই বরকতময় ব্যক্তিকে বললাম :

'আপনি যে কথাটি বললেন, আমাকে তা শিখিয়ে দিন।'

তিনি আমাকে বললেন :

'হে বালক, তুমি সব কিছুই জানতে পারবে।'

এ ঘটনার মাধ্যমেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলামের সাথে পরিচয়ের সূচনা হয়। বরকতপূর্ণ সেই লোকটি ছিলেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আর তাঁর সাথীটি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

কুরাইশদের সীমাহীন অত্যাচার ও নিপীড়নে অতিষ্ট হয়ে তাঁরা মক্কার পাহাড়ি রাস্তার দিকে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েছিলেন। এই বালক যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ভালোবেসে ফেলেছিলেন, ঠিক তেমনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও তাঁর আমানতদারী ও বুদ্ধিমত্তার কারণে তাঁকে পছন্দ করে ফেলেছিলেন এবং তাঁর মধ্যে কল্যাণ দেখতে পেয়েছিলেন।

এরপর অল্প কয়েকদিন অতিবাহিত হতে না হতেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিজেকে তাঁর খিদমতের জন্য পেশ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে নিজ সেবায় নিয়োজিত করলেন। সেদিন থেকেই সৌভাগ্যবান এই বালক আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ বকরি চরানো থেকে সমস্ত সৃষ্টিকূলের মহান নেতার খিদমতের সৌভাগ্য লাভ করলেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে ছাঁয়ার মতো লেগে থাকতে শুরু করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাড়িতে অবস্থানকালে এবং সফরকালে এমনকি বাড়ির ভেতরে ও বাইরে যেখানেই থাকতেন, তিনি সর্বদা তাঁর খিদমতে নিমগ্ন থাকতেন।

নির্দিষ্ট সময়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঘুম থেকে জাগিয়ে দেওয়া, গোসলের সময় পর্দার ব্যবস্থা করা, গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় জুতা পরিয়ে দেওয়া, ঘরে প্রবেশকালে পা থেকে তা খুলে দেওয়া, তাঁর লাঠি ও মিসওয়াক এগিয়ে দেওয়া এবং তিনি তাঁর ঘরে প্রবেশ করলে তাঁর আগে আগে প্রবেশ করা, এসব কাজই তিনি করতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইচ্ছা তাঁর নিজ কক্ষে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদকে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন। নির্বিঘ্নে ও নিশ্চিন্তে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপনীয় বিষয় অবগতি লাভের অনুমতিও তাঁর ছিল। যে কারণে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন বিষয় জানার অধিকারী বলে ডাকা হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গৃহে বেড়ে ওঠেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে তিনি ইসলামের মহান শিক্ষায় শিক্ষিত হন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারিত্রিক গুণাবলি দ্বারা গুণান্বিত হন এবং তাঁর প্রতিটি স্বভাব ও অভ্যাস অনুসরণ করেন। যে কারণে তাঁর সম্পর্কে বলা হতো যে, ইসলামী শিক্ষা ও আমল-আখলাকে তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচাইতে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সাহাবা।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সরাসরি শিক্ষা লাভ করার কারণে অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমগণের মধ্যে তিনি সবচাইতে উত্তম ও বিশুদ্ধভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। কুরআনের অর্থ ও মর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক জানতেন এবং তিনি শরীআত সম্পর্কেও সর্বাধিক অবগত ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনাই সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ। ঘটনাটি হলো :

> 'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরাফাতে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি কুফা থেকে এসে তাঁর খিদমতে আরয করল :
>
> 'হে আমীরুল মুমিনীন! আমি কুফা থেকে এসেছি। সেখানে এমন এক ব্যক্তি আছেন, যিনি কুরআন শরীফ দেখা ছাড়াই শুধু স্মৃতি থেকেই কুরআন শরীফের কপি করে থাকেন।
>
> 'একথা শুনে ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতটা রাগান্বিত হলেন যে, খুব কম সময়ই তাঁকে এতটা রাগান্বিত হতে দেখা যেত। তিনি যারপরনাই ক্রুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন।

তিনি লোকটিকে বললেন :

'তুমি ধ্বংস হও! কে সেই ব্যক্তি?

সে বলল :

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ।'

তাঁর নাম শোনামাত্রই উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ক্রোধ প্রশমিত হতে থাকল এবং তিনি স্বাভাবিক হলেন। স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে তিনি বললেন :

'তোমার জন্য আফসোস! আমার জানা নেই, তিনি ছাড়া এ পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কেউ জীবিত আছেন, যার দ্বারা এ কাজ সম্ভব। তোমাকে তাঁর পাণ্ডিত্যের কয়েকটি ঘটনা শোনাচ্ছি।'

এ বলে তিনি তাঁর কথা আরম্ভ করলেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এক রাতে মুসলমানদের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু আলোচনা করার জন্য আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে কথাবার্তা বলছিলেন। আমিও তাঁদের সাথে ছিলাম। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে পড়লে আমরাও তাঁর সাথে বেরিয়ে পড়লাম। এ সময় মসজিদে একজন অপরিচিত লোক নামায আদায় করছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কিরাআত শোনার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন।'

অতঃপর আমাদের প্রতি লক্ষ্য করে বললেন :

'যে মধুর সুরে কুরআন অবতীর্ণ, কেউ যদি সেই সুরে কুরআন তিলায়াত করতে চায়, সে যেন ইবনে 'উম্মে আবদ' অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের সুরে কুরআন তিলাওয়াত করে।'

নামাযশেষে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বসে দু'আ করতে শুরু করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে লাগলেন :

'আল্লাহর কাছে চাও, যা চাইবে তাই দেওয়া হবে। প্রার্থনা করো, যা প্রার্থনা করবে তাই পাবে।'

অতঃপর উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আরো বললেন :

'আমি মনে মনে বললাম, আল্লাহর কসম! আমি সকালেই আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদের কাছে গিয়ে তার দু'আয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'আমীন' বলার সুসংবাদ দেব। তাই আমি সকালে তার কাছে গিয়ে তাকে সুসংবাদটা জানালাম; কিন্তু জানতে পারলাম যে, আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার আগেই তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে গেছেন।

খোদার শপথ! যে কোনো কল্যাণ কাজে আমি আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে মনস্থ করেছি, সে কাজেই তিনি আমাকে পরাস্ত করেছেন।'

আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের জ্ঞানে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এতটা পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েছিলেন যে, তিনি বলতেন :

'সেই আল্লাহর কসম! যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, কুরআন মাজীদের এমন কোনো আয়াতই নাযিল হয়নি, যে আয়াত সম্পর্কে আমি জানি না, তা কোথায় নাযিল হয়েছে এবং কার বিষয়ে নাযিল হয়েছে। আমি যদি জানতে পারি যে, এ ব্যাপারে অন্য কেউ আমার চেয়ে বেশি জানে, আর যদি তার কাছে যাওয়া সম্ভব হয়, তাহলে আমি অবশ্যই তার কাছে যাব।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নিজের সম্পর্কে যা কিছু বলেছেন, তাতে কোনো অতিরঞ্জন নেই। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে তাঁর নিম্নোক্ত ঘটনা তা-ই প্রমাণ করে :

'উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো সফরে তিমিরাচ্ছন্ন এক গভীর রাতে এক কাফেলার সম্মুখীন হন। সেই কাফেলায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও ছিলেন।

কাফেলা কোথা থেকে আগমন করছে, একথা জিজ্ঞাসা করার জন্য উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এক ব্যক্তিকে নির্দেশ দিলেন।

উত্তরে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুরআনের ভাষায় উত্তর দিতে বললেন :

مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيْقِ

'বহু দূর-দূরান্ত থেকে।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করতে বললেন : 'গন্তব্যস্থল কোথায়?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কুরআনের ভাষায় উত্তর দিতে বললেন :

اَلْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ـ

'প্রাচীন গৃহের (খানায়ে কাবার) দিকে।'

ওমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ উত্তর শুনে বললেন :

'এ কাফেলায় নিশ্চয়ই কোনো জ্ঞানবান লোক আছেন।' তাই তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন :

'তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, আল কুরআনের কোন্ আয়াত সবচাইতে শ্রেষ্ঠ?

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বলে দিতে বললেন :

اَللّٰهُ لَا إِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ـ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'জিজ্ঞাসা করো, আল কুরআনের কোন্ আয়াত ন্যায়বিচারের চরম উৎকর্ষতায় ভরা?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বলে দিতে বললেন :

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَإِيْتَاءِ ذِى الْقُرْبٰى.

'আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয় স্বজনকে দানের নির্দেশ দেন।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এরপর জিজ্ঞাসা করতে বললেন, 'আল কুরআনের কোন্ আয়াত সবচাইতে ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বলে দিতে বললেন :

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ، وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ـ

'কেউ অণু পরিমাণ সৎ কর্ম করলে তা দেখবে ও কেউ অণু পরিমাণ অসৎ কর্ম করলে তাও দেখবে।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার জিজ্ঞাসা করতে বললেন :

'আল কুরআনের কোন্ আয়াত সবচাইতে বেশি ভীতি প্রদর্শনকারী?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বলতে নির্দেশ দিলেন :

لَيْسَ بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ يَّعْمَلْ سُوْءًا يُّجْزَ بِهٖ وَلَا يَجِدْ لَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ـ

'তোমাদের ও খ্রিস্টান, ইহুদী আহলে কিতাবীদের খেয়ালখুশি অনুসারে কাজ হবে না, কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল লাভ করবে, এবং আল্লাহ ছাড়া তার জন্য সে কোনো অভিভাবক ও সহায়ক পাবে না।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবার জিজ্ঞাসা করতে বললেন :

'আল কুরআনের কোন্ আয়াত সর্বাধিক আশার সঞ্চারক?'

ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তরে বলতে বললেন :

قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ أَسْرَفُوْا عَلٰى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا، إِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'বল, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজের প্রতি অবিচার করেছ। আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না, আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অতঃপর উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'এ কাফেলার মধ্যে কি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আছেন?'

তখন কাফেলার লোকজন সমস্বরে উত্তর দিল :

'হ্যাঁ, আল্লাহর শুকরিয়া, তিনি আমাদের সাথে আছেন।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুধুমাত্র সুন্দর কুরআন তিলাওয়াতকারী, ইবাদতকারী, আলেম ও জাহিদই ছিলেন না; সাথে সাথে তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন বীর মুজাহিদ এবং রণক্ষেত্রে প্রথম সারির যোদ্ধা।

তিনিই একমাত্র মুসলিম, যিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরই পৃথিবীতে প্রকাশ্যে কুরআন পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। মক্কায় মুসলমানগণ ছিলেন দুর্বল ও অসহায়। একদিন তারা মক্কায় একত্রিত হয়ে বলতে লাগলেন :

'মক্কার কুরাইশদের কি প্রকাশ্যে কুরআন শোনানো সম্ভব হলো না। কে এমন আছে যে, তাদেরকে সুউচ্চৈঃস্বরে কুরআন শোনাতে পারে?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি তাদেরকে কুরআন শোনাব।'

সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম বললেন :

'তুমি তা করলে আমরা আশঙ্কা বোধ করি। আমরা চাই, এমন কোনো ব্যক্তি এ কাজ করুক, যার অনেক জনবল আছে। যারা তাকে রক্ষা করবে এবং কুরাইশরা কোনো দূরভিসন্ধি নিয়ে অগ্রসর হলে তাদেরকে বাধা দিতে সক্ষম হবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমাকেই এ কাজ করতে দাও। আল্লাহই আমাকে তাদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করবেন এবং তিনিই আমাকে সাহায্য করবেন।'

পরদিনই সকালে তিনি মসজিদে হারামের মাকামে ইবরাহীমের নিকট উপস্থিত হলেন। কুরাইশরা তখন কাবা শরীফের চারপাশে ব্যস্ত ছিল। তিনি মাকামে

ইবরাহীমের পাশে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন :

اَلرَّحْمٰنُ، عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۔

'করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে, দয়াময় আল্লাহ। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন, ভাব প্রকাশ করতে।'

তিনি তিলাওয়াত করেই চলছেন, তাঁর এ কাজ কুরাইশদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল, তারা বলা শুরু করল :

'ইবনে উম্মে আবদ কী তিলাওয়াত করছে? ধ্বংস হোক সে। সে তো মুহাম্মদ যে কুরআনের কথা বলে, তা-ই তিলাওয়াত করছে!'

এই বলে তারা সম্মিলিতভাবে তাঁর দিকে ছুটে এল এবং তাঁর মুখমণ্ডলের ওপর বেদম প্রহার করতে লাগল। আর তিনি সেদিকে কোনো ভ্রুক্ষেপ না করে তিলাওয়াত করেই চলেছিলেন। এ প্রহারের মধ্যে তিনি যতটুকু সম্ভব তিলাওয়াত করলেন। অতঃপর রক্তে রঞ্জিতাবস্থায় সাহাবীদের কাছে ফিরে এলেন।

তারা তখন বলতে লাগলেন :

'আমরা এই আশঙ্কাই করছিলাম।

তিনি বললেন :

'খোদার কসম! আল্লাহর দুশমনদের আজ যতটুকু তুচ্ছ পেয়েছি, তা বলার নয়। তোমরা অনুমতি দিলে তাদেরকে আগামীকালও অনুরূপ শোনাতে পারি।'

তারা বলেন :

'না, যথেষ্ট হয়েছে। তুমি তাদেরকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই শুনিয়েছ।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফত পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় শায়িত হলে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে দেখতে গেলেন।

তিনি তাঁকে বললেন :

'আপনি কিসের আশঙ্কা করছেন?'

তিনি বললেন :

'আমার আশঙ্কার কারণ আমার গোনাহসমূহ।'

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'কোনো কিছুর আকাঙ্ক্ষা করছেন?'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি আল্লাহর রহমতের আকাঙ্ক্ষা করছি।'

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আপনি বেশ কয়েক বছর যাবৎ যে সরকারি নাগরিক ভাতা নেওয়া থেকে নিজেকে বিরত রেখেছেন, সে ভাতা দেওয়ার জন্য আদেশ দেব?'

তিনি উত্তরে বললেন :

'না তার কোনো প্রয়োজন নেই।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আপনার পরে আপনার মেয়েদের তা কাজে লাগবে।'

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আপনি কি আমার মেয়েদের অভাবগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা করেন? আমি প্রতি রাতে তাদেরকে সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছি। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি,

وَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ يقول " مَنْ قَرَأَ الْوَاقِعَةَ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبدًا.

'যে প্রত্যেক রাতে সূরা আল ওয়াক্বিয়াহ পাঠ করবে, দারিদ্র্য ও অভাব তাকে স্পর্শ করবে না।'

রাত হলে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মহান আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। তখনো তাঁর মুখে জারি ছিল আল্লাহর নাম এবং পবিত্র কুরআনের আয়াতসমূহের তিলাওয়াত।

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. আল ইসাবা : ৪র্থ খণ্ড, ১২৯-১৩০ পৃ.।
২. আল ইস্তিয়াব (হায়দরাবাদ সংস্করণ) ১ম খণ্ড, ৩৫৯-৩৬২ পৃ.।
৩. উসদুল্ গাবা ৩য় খণ্ড: ২৫৬-২৬০ পৃ.।
৪. তাযকিরাতুল হুফফাজ : ১ম খণ্ড ১২-১৫ পৃ.।
৫. আল বিদায়াওয়ান নিহায়া : ৭ম খণ্ড, ১৬২-১৬৩ পৃ.।
৬. তাবাকাত আশ-শা'রানী, ২৯-৩০ পৃ.।
৭. শাযরাতুয যাহাব ১ম খণ্ড : ৩৮-৩৯ পৃ.।
৮. তারিখুল ইসলাম লিয্যাহাবী, ২য় খণ্ড: ১০০-১০৪ পৃ.।
৯. সিয়ারু আলামুন নুবালা : ১ম খণ্ড, ৩৩১-৩৫৭ পৃ.।
১০. সিফাতুস সাফওয়া :১ম খণ্ড, ১৫৪-১৬৬ পৃ.।

# সালমান আল ফারেসী (রা)

*'সালমান আল ফারেসী আহলে বাইত অর্থাৎ নবী পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত।'*

*-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

এটি আল্লাহর সন্ধানে হকের তালাশে অবিস্মরণীয় ঘটনা। ঘটনাটি ঘটেছে সালমান আল ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনে। মহান আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট এবং তিনিও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

যেহেতু এ ঘটনার ব্যাপারে তাঁর অনুভূতি অত্যন্ত গভীর এবং বর্ণনাও বস্তুনিষ্ঠ ও চিত্তাকর্ষক। সেহেতু নিজের জীবন সম্পর্কে সালমান আল ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিজের বক্তব্য হুবহু এখানে তুলে ধরা হলো।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে সালমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'আমি ইরানের ইস্পাহান প্রদেশের 'জাইয়ান' গ্রামের এক যুবক। আমার পিতা ছিলেন সেই গ্রামের সর্দার। ধন-দৌলতে এই গ্রামের মধ্যে তাঁর যেমন কোনো জুড়ি ছিল না, তেমনি সামাজিক মর্যাদায়ও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

জন্মের পর থেকেই আমি ছিলাম এ পৃথিবীতে আমার পিতার সর্বাধিক স্নেহধন্য সন্তান। দিন দিন এ আদর এতই প্রগাঢ় হতে থাকে যে, মেয়েদের মতো তিনি আমাকেও ঘরের চার দেয়ালের মাঝে আটকে রাখতে পছন্দ করতেন।

আমি অগ্নি পূজারী হিসেবেই নিজ ধর্মের উপর লেখাপড়া ও নিষ্ঠার সাথে আরাধনা-সাধনা করতাম। গির্জায় আলো জ্বালানোর দায়িত্বে নিয়োজিত থাকার কারণে প্রতিদিন সকালে অগ্নিশিখা জ্বালাতাম। দিন বা রাতের কোনো সময়েই যাতে এ শিখার অগ্নি নিভে না যায়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হতো আমাকে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

গ্রামে আমার পিতার বিরাট শস্য খামার ছিল। সেখান থেকে আমাদের প্রচুর শস্য আসত। আমার পিতা শস্য কেটে নিয়ে আসতেন এবং নিজেই তার রক্ষণাবেক্ষণ করতেন।

একবার তিনি অন্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে আমাকে বললেন :

'তোমার আজ খামারের দেখাশোনার কাজে যেতে পারলে ভালো হয়।'

তার কথামতো আমি খামারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেই। বেশ কিছু রাস্তা অতিক্রম করার পর হঠাৎ গির্জায় আরাধনারত খ্রিস্টানদের প্রার্থনার আওয়াজ আমার কানে আসে। খ্রিস্টানদের ধর্ম-কর্ম সম্পর্কে আমার কিছুই জানা ছিল না। আমি অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কেও কিছু জানতাম না। কারণ, আমাকে লোকজনের সাথে মেলামেশা করতে দেওয়া হতো না, বরং বলা যায় স্নেহের বাঁধনে আটকে রাখা হয়েছিল। তাই গির্জায় প্রার্থনারত খ্রিস্টানদের প্রার্থনার আওয়াজ শুনে কৌতূহল জাগল, ওরা কী করছে, কী বলছে তা দেখা ও শোনার। এই কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে গির্জায় প্রবেশ করি। তাদের অনুষ্ঠানের সবকিছু খুবই মনোযোগের সঙ্গে দেখি। তাদের আরাধনা অনুষ্ঠান আমার খুব ভালো লাগে।

এ ঘটনাই আমাকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে। মনে মনে বললাম :

'আমাদের অগ্নি পূজা থেকে খ্রিস্টান ধর্মই তো অনেক ভালো।'

তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান দেখে আমি সারাদিন পার করে দিলাম। খামারে আর যাওয়া হলো না। আমি তাদের জিজ্ঞাসা করলাম :

'এ ধর্মের কেন্দ্রীয় দফতর কোথায়?'

তারা জানাল :

'সিরিয়া।'

রাত ঘনিয়ে এলে আমি এখান থেকেই বাড়ি ফিরি। সারাদিনের কাজকর্মের হিসাব চাইলেন আমার পিতা। আমি বললাম :

'বাবা, আমি খামারে যাবার পথে কিছু লোককে দেখতে পাই, তারা গির্জায় আরাধনা করছিল। তাদের ধর্মের এ সকল কার্যাবলি আমাকে মুগ্ধ করে ফেলে। সবকিছু ভুলে আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই সময় কাটিয়েছি।'

আমার এমন উত্তর শুনে আমার পিতা অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি বললেন :

'বৎস! সে ধর্মে কোনো কল্যাণ নেই, শুধু তোমার ও তোমার পিতার ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট ও কল্যাণকর।'

আমি বললাম :

'খোদার শপথ! তা হতেই পারে না, তাদের ধর্ম অবশ্যই আমাদের ধর্ম থেকে উত্তম।'

একথা শুনে আমার পিতা আরো ভয় পেয়ে গেলেন। নিজ ধর্ম ত্যাগ করে আমি ধর্মান্তরিত হই কি না এই আশঙ্কায় তিনি আমার দু'পায়ে বেড়ি পরিয়ে গৃহবন্দী করে রাখলেন। কিন্তু আমি প্রথম সুযোগেই সেই খ্রিস্টানদের কাছে সংবাদ পাঠালাম :

'সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যদি কোনো কাফেলা তোমাদের এখানে আসে, তাহলে আমাকে সংবাদ দিও।'

কয়েক দিনের মধ্যেই সিরিয়ার উদ্দেশ্যে এক কাফেলা তাদের গির্জার কাছে তাঁবু খাটায়। এ সংবাদ আমার কাছে পৌছানো হয়। আমিও পায়ের বেড়ি ছিন্ন করে নিজেকে মুক্ত করে বাড়ি ত্যাগ করলাম এবং গোপনে তাদের সাথে রওয়ানা হলাম। এমনকি, শেষ পর্যন্ত সিরিয়ায় পৌছলাম। সিরিয়ায় উপস্থিত হয়ে আমি খ্রিস্টান ধর্মের সবচাইতে বড় পাদ্রির খোঁজ করলাম।

তাদের অনেকেই জানাল : 'বিশাপ হলেন বড় পাদ্রি।'

তাঁর খিদমতে হাজির হয়ে বললাম :

'আমি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেছি। এখন আমি আপনার সাথে থেকে আপনার খিদমত করতে চাই। ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে চাই এবং আপনার সাথে আরাধনা করার সুযোগ লাভ করতে চাই।'

তিনি বললেন : 'গির্জায় প্রবেশ করো।'

আমি গির্জায় প্রবেশ করলাম এবং তার খিদমতে নিজেকে নিয়োজিত রাখলাম।

এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত করার পর আমি বুঝতে পারলাম, এই পাদ্রি ভালো লোক নয়, বরং লোভী ও প্রতারক। তিনি তাঁর অনুসারীদের দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিতেন এবং এ কাজে অনেক পুণ্য হবে বলে তাদের উদ্বুদ্ধ করতেন। তার কথায় আস্থা স্থাপন করে ভক্তরা প্রচুর অর্থ তাকে দিত; কিন্তু সেসব অর্থ দীন-দুঃখীদের না দিয়ে তিনি নিজের জন্য রেখে দিতেন। এভাবে তিনি ভক্তদের দানের সোনা-রূপা দিয়ে নিজের জন্য বিরাট সঞ্চয় গড়ে তোলেন। বড় বড় সাত পিপা ভরে উঠল সোনা-রূপা। এসব কাণ্ড দেখার পর পাদ্রির ওপর আমার কোনো আস্থা আর অবশিষ্ট রইল না; বরং তার ওপর আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ হলাম। তিনি যেদিন মারা গেলেন, সেদিন তার দাফন-কাফনের জন্য দূর-দূরান্ত থেকেও খ্রিস্টানরা এসে জড়ো হলো। আমি তাদের বলে দেই :

'আপনাদের এই পাদ্রি কিন্তু খুব খারাপ ও পুরোদস্তুর প্রতারক। তিনি লোকদের দান-খয়রাত করতে বলতেন এবং এ কাজে সবাইকে উদ্বুদ্ধও করতেন। যারা তার কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দান করত, তাদের দানের একটি কানাকড়িও গরীব-দুঃখীদের দান করতেন না; বরং তা নিজের জন্য সঞ্চয় করে রাখতেন।'

উপস্থিত ভক্তদের অনেকে আমার কাছে জানতে চাইলেন, এসব আমি কিভাবে জানলাম। আমি বললাম :

'চলুন আমার সাথে, আমি তার সঞ্চিত ধন-ভাণ্ডার আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি।'

তারা বলল :

'ঠিক আছে. তবে তাই হোক।' পাদ্রির গোপন ধনভাণ্ডার আমি তাদের দেখিয়ে দিলাম। তারা সেখান থেকে পিপাভর্তি সোনা ও রূপা উদ্ধার করল।

এসব দেখে তারা বলল :

'খোদার কসম, আমরা এই খারাপ ব্যক্তিকে দাফন করতে পারি না। দাফনের পরিবর্তে তাকে শূলে চড়িয়ে পাথর নিক্ষেপ করব।' তারা তা-ই করল।

কিছুদিন যেতে না যেতেই এই পাদ্রির স্থানে নতুন এক পাদ্রিকে নিয়োগ দেওয়া হলো। আমি নিজেকে তাঁর খিদমতে নিয়োজিত করলাম। দিন-রাতের অধিকাংশ সময় তিনি ইবাদতে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন দুনিয়াত্যাগী সাধক। আখিরাতের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনুরাগ। আমি এমন নিষ্ঠাবান পাদ্রি আর দেখিনি। আমি তাঁকে অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভালো বাসতাম। তাঁর সাথে আমি বহুদিন কাটিয়েছি।

তাঁর মৃত্যুর সময়ে আমি তাঁর কাছে আবেদন করলাম :

'মুহতারাম! আপনার পর আমি কার সান্নিধ্যে থেকে জীবন অতিবাহিত করব? আপনি আমাকে কার অনুগত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন?'

তিনি বললেন :

'হে বৎস! আমার জানামতে মাওসেল শহরে এক ব্যক্তি আছেন, যিনি দীনকে কাটছাঁট করেননি। আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে দেখছি না, তুমি তার কাছেই চলে যাও।'

অতঃপর এই সাধকের মৃত্যু হলে আমি 'মাওসেলের' সেই পাদ্রির কাছে চলে যাই এবং তাঁর কাছে বিস্তারিত ঘটনা বর্ণনা করে আবেদন করি :

'সেই সাধক মৃত্যুকালে আপনার সাথে মিলিত হওয়ার জন্য আমাকে অসিয়ত করেছেন। একমাত্র আপনিই খ্রিস্টান ধর্মকে সঠিকভাবে ধরে রেখেছেন। এ কারণে আপনার খিদমতে আমার উপস্থিতি।'

তিনি বললেন :

'তুমি আমার কাছেই থাক।'

আমি তাঁর কাছে থাকি এবং তাঁকেও সঠিক পথের দিশারী হিসেবে দেখতে পাই; কিন্তু কিছুদিন পর তিনিও ইনতিকাল করলেন।

আমি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে আবেদন করলাম :

'মুহতারাম! বুঝতে পারছেন যে, আপনার জীবন শেষ হয়ে এসেছে। আপনি আমার ব্যাপারে সবকিছুই জানেন। আপনার মৃত্যুর পর আমাকে কার খিদমতে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন?'

তিনি বললেন :

'বৎস 'নাছিবাইন' নামক স্থানের এক পাদ্রি ছাড়া আর কেউ নিজ দীনের অনুসরণে নেই। তার মতো আর কেউ এভাবে দীনের অনুসরণ করছে বলেও আমার মনে হয় না। সম্ভব হলে তুমি তার সান্নিধ্যে চলে যেতে পার।'

অতঃপর এ সাধকের মৃত্যু হলে আমি 'নাছিবাইন' নামক স্থানের সেই পাদ্রির সাথে সাক্ষাৎ করে আমার পূর্ববর্তী সাধকের অসিয়ত ও নিজ বিষয়ে বিস্তারিত জানাই। তিনিও আমাকে তাঁর সাথে অবস্থান করার অনুমতি দিলেন। তাঁকেও আমি অপর দুই পাদ্রির মতো খোদাভীরু পেলাম। কিছুদিন পর তিনিও ইনতিকাল করেন।

মৃত্যুর পূর্বকালে তাঁর নিকটও আগের মতো আবেদন করলাম :

'আমার ব্যাপারে আপনি ভালো করেই জানেন। আপনার পর এখন কার সাহচর্যে থাকব?'

তিনি বললেন :

'হে বৎস! খোদার শপথ করে বলছি, 'আম্মুরিয়ার' এক ব্যক্তি ছাড়া দ্বিতীয় আর কেউ সঠিকভাবে খ্রিস্টধর্মে কায়েম আছে বলে আমার জানা নেই। তুমি তার সাহচর্যে নিজেকে নিয়োজিত কর।'

এবার আমি 'আম্মুরিয়ার' সেই পাদ্রির খিদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁকে আমার বিষয়ে বিস্তারিত জানালাম। তিনি আমাকে তাঁর সাথে থাকার অনুমতি দিলেন। আমি তখন থেকে তার খিদমতেই লেগে গেলাম। খোদার শপথ করে বলছি যে, তিনি তাঁর ঐসব সঙ্গী-সাথীদের মতোই হেদায়াতের উত্তম পথের পথিক ছিলেন। তাঁর থেকে আমি অনেক গাভী ও বকরি তোহফা হিসেবে লাভ করি। কিছুদিন পর তিনিও ইনতিকাল করলেন।

তার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও তার কাছে নিবেদন করি :

'আপনি আমার ব্যাপারে বিস্তারিত জানেন, অতএব আপনি আমাকে কার সাহচর্য লাভের পরামর্শ দেন বা আমার করণীয় বিষয়ে কিইবা নির্দেশ দিচ্ছেন?'

তিনি বললেন :

'বৎস! আমার বিশ্বাস, আমরা যারা খ্রিস্টধর্মে আছি, তাঁদের কেউই ধর্মের ওপর সঠিকভাবে নেই। কিন্তু সে সময় অতি নিকটবর্তী, যে সময়ে ইবরাহীম আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনের অনুসারী একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তিনি তাঁর জন্মভূমি থেকে দুই প্রান্তরে কালো পাথরে ঘেরা খেজুর বাগানের জন্য প্রসিদ্ধ ইয়াসরিব এলাকায় হিজরত করবেন। তাঁর কিছু প্রকাশ্য নিদর্শন থাকবে। তাঁর খিদমতে হাদীয়া পেশ করলে তিনি তা নিজের জন্য গ্রহণ করবেন। কিন্তু সদকা ও যাকাত কখনোই নিজের জন্য গ্রহণ করবেন না। তাঁর পিঠে থাকবে নবুওয়াতের মোহর বা ছাপ। যদি পার সে দেশে গিয়ে তাঁর সাথে মিলিত হবে।'

অতঃপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন; কিন্তু আমি আম্মুরিয়াতেই অনেক দিন অবস্থান করলাম। অবশেষে 'কালব' গোত্রের একটি আরব বাণিজ্য কাফেলা এখান দিয়ে ফিরে যাওয়ার সময় আমি তাদের কাছে আবেদন করি :

'যদি আরবের উদ্দেশ্যে আমাকে আপনাদের সাথে নিয়ে যান, তাহলে আমার গাভী ও বকরিগুলো আপনাদের দিয়ে দেব।'

তারা এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে বললেন :

'হ্যাঁ, আমরা আপনাকে সাথে নেব।'

ওয়াদা মোতাবেক আমি আমার গাভী ও বকরি তাদের দিয়ে দিলাম এবং তারা আমাকে তাদের সঙ্গে নিল। কিন্তু সিরিয়া ও মদীনার মাঝে 'ওয়াদীয়ে কুবা' নামক স্থানে এসে তারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে একজন ইহুদীর কাছে বিক্রি করে দিল। বাধ্য হয়ে এই ইহুদীর খিদমতে নিয়োজিত হলাম। কিছুদিন পর উক্ত ইহুদীর এক ভাইপো (যিনি 'বনূ

কুরাইযা' গোত্রের লোক) এ বাড়িতে বেড়াতে এসে আমাকে তার কাছ থেকে কিনে নেয়। এভাবেই সে আমাকে 'ইয়াসরিব' নামক স্থানটিতে নিয়ে এল। এখানে এসেই খেজুর বাগান সমৃদ্ধ সেই স্থান দেখতে পেলাম, যার কথা আম্মুরিয়ার সেই পাদ্রি আমাকে বলে দিয়েছিলেন এবং বর্ণিত সেই মদীনা মুনাওয়ারারও সন্ধান পেলাম, যার প্রশংসা শুনেছি। এভাবে আমি এখানে পৌঁছে সেই ইহুদীর ভাইপোর খিদমতে নিয়োজিত থাকলাম।

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাতেই অবস্থান করে কুরাইশদের আল্লাহর দীনের দাওয়াত দিচ্ছিলেন। আমার গোলামি বা দাস জিন্দেগী থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য মুক্তিপণের যে অংক নির্ধারিত করা হয়েছিল তা সংগ্রহ করার জন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হতো। এ কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খবরাদি সংগ্রহ করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

কিছুদিন পরেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইয়াসরিবে হিজরত করে আসেন। আমি এ সময় আমার মালিকের খেজুর গাছের মাথায় উঠে কিছু কাজ করছিলাম। আর আমার মালিক গাছের নিচে বসেছিলেন। এমন সময় সেখানে মালিকের ভাইপো এলেন এবং তাকে বলতে লাগলেন :

'আউস এবং খাযরাজ গোত্রের নবীকে আল্লাহ ধ্বংস করুক। তারা সবাই এখন কোবাতে একত্রিত হয়েছে এমন এক ব্যক্তিকে দেখার জন্য, যে নিজেকে নবী দাবি করে মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছে।'

এ সংবাদ শোনামাত্রই আমার শরীরে যেন জ্বর এসে গেল। আমি তখন ভীষণভাবে কাঁপছিলাম। আমার ভয় হচ্ছিল যে, আমি মালিকের মাথার উপরই পড়ে না যাই। দ্রুত আমি খেজুর গাছ থেকে নেমে পড়ি এবং তাকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করি, আপনি কী বলছিলেন? সেই সংবাদটির পুনরাবৃত্তি করুন না। আমার মালিক এতে ভীষণভাবে রেগে গেলেন এবং আমাকে সজোরে চপেটাঘাত করে বললেন :

'তোমার এতে কী আসে যায়? যাও যে কাজ করছিলে সে কাজে ফিরে যাও।'

আমার মালিকের এ দুর্ব্যবহার নীরবে সহ্য করে পরে একসময় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে আমি কিছু খেজুর নিয়ে সাক্ষাৎ করার জন্য রওয়ানা হলাম। তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললাম :

'যতদূর জেনেছি, আপনি একজন ভালো লোক, আপনার সাথী-সঙ্গীরা গরীব এবং অভাবী। এই সামান্য কিছু সদকার জন্য ছিল। মনে করলাম যে, অন্যের চেয়ে আপনিই এর উত্তম হকদার। এই বলে খেজুরগুলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করলাম।'

তিনি তাঁর সাহাবীদের বললেন : 'তোমরা খাও।'

তিনি তাঁর হাত সেদিকে সম্প্রসারণ করলেন না এবং এ খেজুর খেলেন না। আমি তা দেখে মনে মনে ভাবলাম, এটি একটি নিদর্শন। সেদিন তাঁর খিদমত থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম এবং আরো কিছু খেজুর সংগ্রহ করার কাজে লেগে গেলাম। ইতোমধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোবা থেকে মদীনা মুনাওয়ারাতে চলে গেলেন। আমি আবার মদীনায় তাঁর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করি :

'আমি সেদিন দেখলাম, আপনি সদকা খান না। তাই আজ আপনার সম্মানে কিছু হাদিয়া এনেছি।'

এবার তিনি তা খেলেন এবং সঙ্গীদেরও খেতে বললেন। তারাও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খেলেন। মনে মনে বললাম, এটি দ্বিতীয় নিদর্শন।

আমি যখন তৃতীয় বার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই, তখন তিনি জান্নাতুল বাকীতে 'গারকাদ' নামক স্থানে তাঁর কোনো এক সাহাবীর দাফনকার্য সম্পন্ন করছিলেন। তিনি সেখানে দু-দুটি বিশেষ ধরনের আরবী চাদর বা গাউন মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। এবার তাঁকে সালাম করে তাঁর পিঠে খাতমে নবুওয়াতের সেই চিহ্ন দেখার জন্য এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলাম, যে চিহ্নটি সম্পর্কে আম্মুরিয়ার সেই পাদ্রি আমাকে বলে দিয়েছিলেন। আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের দিকে বারবার তাকাচ্ছি দেখে তিনি আমার মতলব বুঝে ফেললেন। নিজ পিঠ থেকে চাদর দু'টি ফেলে দিলেন। এবার আমি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে

না করতেই মোহরের ছাপ দেখে তাঁকে নবী হিসেবে চিনতে পারলাম। কালবিলম্ব না করে সে মোহরে চুম্বন দিতে লাগলাম ও আনন্দে চক্ষু দিয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ল। আমার এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'কী ব্যাপার? তোমার কী হয়েছে?'

তখন আমি তাঁকে আমার সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম। সবকিছু শুনে তিনি আশ্চর্য হলেন এবং খুশি মনে তার সাথী-সঙ্গীদেরকেও তা পুনরায় শোনানোর নির্দেশ দিলেন। আমি তাদেরও সে কাহিনী আবারও শোনাই। তারা এসব ঘটনা শুনে যেমন আশ্চর্য হলেন, তেমনি আনন্দিতও হলেন।'

সালমান আল ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দীনে হকের সন্ধানে নানা স্থানে অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে সফর করার জন্য সালাম। সালমান ফারেসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সালাম তাঁর ঈমানের দৃঢ়তার জন্য। তাকে সালাম তার মৃত্যুর দিনে এবং আখিরাতের জীবনেও।

---


সালমান আল ফারেসী রাদিয়ায়ল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থসমুহ :

১. আল ইসাবাহ (আস্‌সাআদাহ সংস্করণ) : ৩য় খণ্ড, ১১৩-১১৪ পৃ.।
২. আল ইসতিয়াব (হায়দারাবাদ সংস্করণ) : ২য় খণ্ড, ৫৫৬-৫৫৮ পৃ.।
৩. আল জরহু ওয়াত তা'দীলু : ভূমিকা ১ম খণ্ড, ১ ২য় খণ্ড, ২৯৬-২৯৭ পৃ.।
৪. উসদুল গাবাহ্ : ২য় খণ্ড, ৩২৮-৩৩২ পৃ.।
৫. তাহযীব আত্ তাহযীব : ৪র্থ খণ্ড ১৩৭-১৩৯ পৃ.।
৬. তাকরীবুত তাহযীব : ১ম খণ্ড, ৩১৫ পৃ.।
৭. আল জম্‌উ বাইনা রিজালিস্ সহিহাইন : ১ম খণ্ড, ১৯৩ পৃ.।
৮. তাবাকাত আশ শ'রানী : ৩০-৩১ পৃ.।
৯. সিফাতুচ্ছাফওয়া :১ম খণ্ড, ২১০-২২৫ পৃ.।
১০. শাজরাতুয্‌যাহাব : ১ম খণ্ড, ৪৪ পৃ.।
১১. তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবী :২য় খণ্ড, ৫৮-১৬৩ পৃ.।
১২. শিয়ারু আলাম আন নুবালা : ১ম খণ্ড, ৩৬২-৪০৫ পৃ.।

# ইকরামা ইবনে আবী জাহল (রা)

*'কিছুক্ষণের মধ্যে ইকরামা মুমিন ও মুহাজির হিসেবে আগমন করবে, তোমরা তার পিতাকে গালি দেবে না। কারণ, মৃতকে গালি দিলে তা মৃতদের কাছে পৌঁছে না; কিন্তু জীবিতরা তাতে কষ্ট পায়।' 'স্বাগতম হে অশ্বারোহী মুহাজির, স্বাগতম'।*

*- নবী করীম (সা)-এর স্বাগত বাণী*

ইকরামার ইসলাম গ্রহণের ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে শেষ দিকের ঘটনাসমূহের অন্যতম। রহমতের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীনে হক ও হেদায়াতের দাওয়াত প্রকাশ্যে শুরু করেন, তখন ইকরামা ইবনে আবী জাহলের বয়স ত্রিশের কোঠায়। তখন ইকরামা ছিল কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী, সবচেয়ে সম্পদশালী এবং বংশগতভাবে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত।

যদি তাঁর পিতার প্রতিবন্ধকতা না থাকত, তাহলে এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, তার সমকক্ষ অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পরিবারের সমকক্ষ ব্যক্তিবর্গ যেমন সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, মুস'আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রমুখের মতো সেও ইসলাম গ্রহণ করত।

প্রিয় পাঠক! কে তার এই পিতা? শিরক সম্রাট, মক্কার সবচেয়ে ক্ষমতাধর, ভয়াবহ নিপীড়নকারী যে তার কঠোর কঠিন ও ভয়ঙ্কর নির্যাতনের দ্বারা মুমিনদের ঈমানের পরীক্ষায় ফেলেছিল এবং মুমিনরাও এ পরীক্ষায় ছিলেন অবিচল। সে

নানা চক্রান্তের মাধ্যমে মুমিনদের ঈমানকে চ্যালেঞ্জ করে চললে মুমিনরাও তাদের ঈমানের দৃঢ়তা ও শক্তি বার বার প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন। যার এতটুকু পরিচয়ই যথেষ্ট যে সে ছিল 'আবী জাহল।'

আর তার ছেলেই ইকরামা ইবনে আবী জাহল আল মাখযুমী। কুরাইশ বংশের হাতেগোনা কয়েকজন বীরপুরুষের অন্যতম। সুদক্ষ ঘোড়সওয়ার এবং বীর যোদ্ধা।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণ ও শত্রুতামূলক আচরণের শিক্ষা সে তাঁর শিক্ষাদাতা পিতা আবী জাহলের কাছ থেকেই লাভ করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চরম বিরোধিতায় লিপ্ত হয় এবং তাঁর সাহাবীদের ভীষণ কষ্ট দেয়। তার পিতা আবী জাহলকে সন্তুষ্ট করার জন্য মুসলমানদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানোই ছিল তার একমাত্র চিন্তা ও কাজ।

বদর যুদ্ধে তার পিতা আবী জাহল কুরাইশদের নেতৃত্ব দেয় এবং 'লাত' ও 'উয্‌যা' নামক মূর্তির নামে এই মর্মে শপথ করে :

'মুহাম্মদকে পরাস্ত না করে সে মক্কায় ফিরে আসবে না।'

তারপর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে সে বদর প্রান্তরে উপস্থিত হয় এবং তিন দিন পর্যন্ত মুসলিম বাহিনীর জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। সে অবস্থায় উট জবাই, মদ্যপান এবং নর্তকীদের নৃত্য উপভোগে নিমগ্ন থাকে।

বদর যুদ্ধে আবী জাহল মুশরিক কুরাইশদের নেতৃত্ব দান করে। তার পুত্র বীর যোদ্ধা ইকরামা ছিল তার শক্তিশালী বাহু, যার ওপর সে নির্ভর করত। 'লাত' ও 'উয্‌যা' আবী জাহলের আহ্বানে সাড়া দেয়নি। কারণ, শোনার ক্ষমতাই তো তাদের নেই, ফলে তারা তাদেরকে সাহায্যও করতে পারেনি। তারা ছিল নিতান্তই অসহায় ও অক্ষম।

বদর যুদ্ধে আবী জাহল নিহত হলো এবং তার পুত্র ইকরামা তা নিজ চোখেই দেখল। মুসলিমদের বর্শা তার রক্ত বইয়ে দিল। পিতা আবী জাহলের শেষ আর্তনাদও পুত্র ইকরামা নিজ কানে ভালো করেই শুনেছিল।

যুদ্ধ শেষে ইকরামা কুরাইশ নেতা আবী জাহলের লাশ ফেলে রেখেই মক্কায় ফিরে আসতে বাধ্য হলো। যুদ্ধের পরাজয় আবী জাহলের লাশ মক্কায় এনে দাফন করতে তাকে অক্ষম করে দিয়েছিল। মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাস্ত হওয়ায় পিতার লাশের সৎকাজের আশা পূরণ তো হলোই না; বরং লাশ রেখেই তাকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। বিজয়ী মুসলিম বাহিনী অগণিত লাশের সাথে আবী জাহলের লাশও 'কুলাইব' নামক একটি পরিত্যক্ত কূপে নিক্ষেপ করে মাটি চাপা দেয়।

বদর যুদ্ধে পরাজয়ের পর থেকে ইসলামের বিরুদ্ধে ইকরামার শত্রুতা ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করল। প্রথম প্রথম সে পিতার মর্যাদা রক্ষা ও তাকে খুশি রাখার জন্য ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করছিল; কিন্তু তখন থেকে সে তার হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ শুরু করে দিল।

ইকরামা এবং তার মতো আরো কয়েকজন যারা বদরের প্রান্তরে তাদের আত্মীয়-স্বজনের লাশ ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছিল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে মক্কার মুশরিকদের হৃদয়-মনে নতুনভাবে শত্রুতার বহ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত করে, স্বজনহারা কুরাইশদের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। ফলস্বরূপ সংঘটিত হয় ওহুদ যুদ্ধ।

ইকরামা ওহুদ রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়লে তার সাথে তার স্ত্রী উম্মু হাকিমও যুদ্ধে অংশ নিল। যাদের নিকটাত্মীয় বদর যুদ্ধে নিহত হয়েছিল তাদের স্ত্রীরাও যুদ্ধসারির পিছনে থেকে দফ বাজিয়ে ও শোকগাথা মরসিয়া গেয়ে গেয়ে অশ্বারোহী সৈন্যদের যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করতে থাকে, যেন তারা পশ্চাৎপসরণ না করে।

কুরাইশ বাহিনীর ব্যূহের ডানে খালেদ ইবনে ওয়ালিদ এবং বামে ইকরামা ইবনে আবী জাহল অশ্বারোহী বাহিনীর নেতৃত্ব দেয়। এই দুই বীর যোদ্ধৃদ্বয় মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এবং তাঁর সাহাবীদের জন্য এক মহা পরীক্ষার অবতারণা করেন এবং যুদ্ধে মুশরিকদের জন্য অতীব মূল্যবান ভূমিকা পালন করে। আবূ সুফিয়ানের ভাষায় তা ছিল 'বদরের প্রতিশোধ'।

খন্দকের যুদ্ধে কুরাইশ বাহিনী দীর্ঘদিন পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে রাখতে বাধ্য হওয়ায় ইকরামা ইবনে আবী জাহলের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে। সে কোনোভাবেই নিজেকে ধরে রাখতে পারছিল না। সে খন্দকের একটি সংকীর্ণ

স্থানের সন্ধান পেয়ে সে স্থান দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল, দেখতে না দেখতেই তার জানবাজদের কয়েকজন তার পিছনে পিছনে ছুটে আসে।

পরিণতিতে আমর ইবনে আবদ উদ্দ আল আমেরী নামক চৌকশ মুসলিম প্রহরীর হাতে মুহূর্তের মধ্যে ধরাশায়ী হয় এবং ইকরামা কোনো রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

মক্কা বিজয়ের দিন কুরাইশরা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের মোকাবেলা করার সাহস না পেয়ে মক্কার প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তাদের এ সিদ্ধান্ত গ্রহণের এটাও একটা কারণ ছিল যে, তারা দেখেছে কেউ আক্রমণ না করলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সেনাধ্যক্ষদের যুদ্ধ না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কিন্তু ইকরামা ইবনে আবী জাহল এবং কুরাইশদের আরো কিছু লোক এহেন শুভ সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে বিরাট মুসলিম বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছোট একটি সংঘর্ষেই তাদের পরাস্ত করেন। তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক নিহত হয় এবং বাকিরা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

এবার ইকরামা বিস্মিত ও অনুতপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু মুসলমান কর্তৃক মক্কা বিজিত হওয়ার পর সেখানে তার জন্য আশ্রয়ের স্থান থাকে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন; কিন্তু কয়েকজন গুরুতর অপরাধী সম্বন্ধে বলেন :

> 'তাদেরকে খানায়ে কাবার গিলাফের ভেতরে পাওয়া গেলেও যেন হত্যা করা হয়।'

ইকরামা ইবনে আবী জাহল ছিল সেই গুটিকয়েক অপরাধী লোকের অন্যতম। তাই সে মক্কা ত্যাগ করে ইয়ামেনের দিকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। আর পালানোর জন্য ইয়ামেন ছাড়া তার দ্বিতীয় কোনো আশ্রয়স্থলও ছিল না।

এদিকে ইকরামা ইবনে আবী জাহলের স্ত্রী উম্মু হাকিম, আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা অন্য আরো দশজন মহিলার সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণের জন্য উপস্থিত হয়।

এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর দুই স্ত্রী, ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা এবং বনূ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের কয়েকজন মহিলা

উপস্থিত ছিলেন। আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দ বিনতে উতবা মুখমণ্ডল আবৃত অবস্থায় আলাপের সূত্রপাত করে বলে :

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ তাআলা তাঁর পছন্দনীয় দীনকে বিজয় দিয়েছেন। এজন্য আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া। আপনার সাথে আমাদের যে রক্তের সম্পর্ক, সে সম্পর্কের কারণেই আশা করি আপনি আমাদের প্রতি দয়া করবেন, যেহেতু আমরা সবাই ঈমানদার নারী।'

এ বলে সে বোরকার নিকাব সরিয়ে বলল :

'হে আল্লাহর রাসূল! আমি হিন্দ বিনতে উতবা।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সুস্বাগতম জানিয়ে বললেন :

'মারহাবা! তোমাকে স্বাগতম!'

অতঃপর হিন্দ বিনতে উতবা বলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনার ঘরের চেয়ে আর প্রিয় কোনো ঘর আমার নেই, অথচ এই ঘরই একদিন আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণার ছিল।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন :

'আরো কি কেউ কিছু বলতে চাও?'

এ সুযোগে ইকরামার স্ত্রী উম্মু হাকিম ওঠে দাঁড়ায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে বলে :

'হে আল্লাহর রাসূল! ইকরামা প্রাণভয়ে ইয়ামেনের দিকে পালিয়ে গেছে। অনুগ্রহ করে তাকে ক্ষমা করে নিরাপত্তা দিন। আল্লাহ্ আপনাকেও নিরাপত্তা দেবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'তাকে নিরাপত্তা দান করা হলো।'

নিরাপত্তার আশ্বাস পেয়ে ইকরামার স্ত্রী উম্মু হাকিম সে মুহূর্তেই তাঁর স্বামীর সন্ধানে বের হয়ে পড়েন। তাঁর সাথে ছিল তাঁর রোমান ক্রীতদাস। ইয়ামেনের পথে অনেক দূর অগ্রসর হওয়ার পর ক্রীতদাসটি তাঁকে অসৎ কর্মের জন্য ফুসলাতে থাকে এবং তিনি টালবাহানার মাধ্যমেই কালক্ষেপণ করতে থাকেন।

অবশেষে, তারা এক আরব গোত্রে গিয়ে পৌছলে তিনি তাদের কাছে সাহায্য চান। তারা ক্রীতদাসকে বেঁধে রাখে এবং তিনি তাকে তাদের কাছে রেখে একাই

ইয়ামেনের পথে অগ্রসর হতে থাকেন। অবশেষে তিনি ইকরামাকে 'তিহামা' এলাকার সমুদ্র তীরে খুঁজে পান। সে মুহূর্তে ইকরামা নৌকার মাঝির সাথে তর্কে লিপ্ত ছিল। মাঝি তাকে বলছিল :

'পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে পার করব না।'

ইকরামা বলছিল :

'কিভাবে পবিত্র হব?'

মাঝি বলল :

'কালেমা শাহাদাত পড়ে পবিত্র হও।'

বল :

'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

ইকরামা উত্তর দিল :

'এ কালেমার সাক্ষ্য না দেওয়ার জন্যই তো আমি পালিয়েছি।'

বাদানুবাদের এক পর্যায়ে উম্মু হাকিম ইকরামার সামনে গিয়ে বললেন :

'ইকরামা! সবচেয়ে মহান, নিষ্পাপ এবং উত্তম ব্যক্তির নিকট থেকে আমি তোমার কাছে এসেছি। অর্থাৎ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর নিকট থেকে। তাঁর কাছে তোমার জন্য নিরাপত্তা চেয়েছিলাম। তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছেন। অতএব নিজেকে আর ধ্বংসের পথে ঠেলে দিও না।'

ইকরামা বলল :

'তুমি কি তার সাথে কথা বলেছ?'

তার স্ত্রী বললেন :

'হ্যাঁ, আমি নিজেই তাঁর সাথে কথা বলেছি এবং তিনি তোমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।'

উম্মু হাকিম তাকে নানাভাবে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিচ্ছিলেন।

পরিশেষে, ইকরামা ফিরে যেতে রাজি হলো। অতঃপর উম্মু হাকিম তাকে তাদের রোমান ক্রীতদাসের আচরণ সম্পর্কে অবহিত করলে সে ইসলাম গ্রহণের পূর্বে সেখানে এসে তাকে হত্যা করল।

পথে তাঁরা এক স্থানে রাত যাপনকালে ইকরামা তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করলে তিনি কঠোরভাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে বললেন :

'তা হতে পারে না। কারণ আমি মুসলমান আর তুমি মুশরিক।'

স্ত্রীর উত্তরে ইকরামা খুবই আশ্চর্যান্বিত হয়ে যায় এবং বলে :

'যে জিনিসটি তোমার ও আমার মিলনে বাধা হতে পারে তা নিঃসন্দেহে খুবই বড় ব্যাপার।'

ইকরামা মক্কার নিকটে এসে পৌছতেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের বললেন :

'কিছুক্ষণের মধ্যেই ইকরামা ইবনে আবী জাহল মুমিন ও মুহাজির হিসেবে তোমাদের মধ্যে উপস্থিত হচ্ছে। তোমরা তার পিতাকে মন্দ বলো না বা গালি দিও না। কেননা মৃত ব্যক্তিকে গালি দিলে জীবিতরা কষ্ট পায়, অথচ মৃতব্যক্তি তা শুনতে পায় না।'

দেখতে না দেখতেই ইকরামা এবং তার স্ত্রী উম্মু হাকিম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে বসেছিলেন, সেখানে এসে হাজির হলো। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখেই আনন্দে গায়ে চাদরহীন অবস্থায় ওঠে তাদেরকে স্বাগতম জানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলে ইকরামাও তাঁর সামনে বসে পড়ে, এবং বলে যে :

'হে আল্লাহর রাসূল! উম্মু হাকিম আমাকে জানিয়েছে যে, আপনি আমাকে নিরাপত্তা দান করেছেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দেন :

'হ্যাঁ সে ঠিকই বলেছে। তুমি এখন নিরাপদ।'

ইকরামা বলল :

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে কিসের দিকে আহ্বান করছেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'আমি তোমাকে আহ্বান করছি এই সাক্ষ্য দিতে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। আমি আল্লাহর বান্দাহ ও তাঁরই রাসূল, নামায কায়েম করতে এবং যাকাত দিতে।'

এভাবে তিনি ইসলামের সমস্ত রুকনগুলো এক এক করে উল্লেখ করলেন।

ইকরামা বলল :

'আল্লাহর শপথ! আপনি ন্যায় ও সত্য ছাড়া আর কিছুর আহ্বান জানাননি এবং ভালো কাজ ছাড়া অন্য কিছুর নির্দেশও দেননি।'

সে আরো বলল :

'ইসলামের দিকে আহবান করার আগেও আপনি একজন সত্যবাদী ও অত্যন্ত নেক লোক ছিলেন।'

অতঃপর ইকরামা বলল :

'আমি বলতে পারি, এরূপ সর্বোত্তম কথা আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'তুমি বল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দাহ ও রাসূল।'

ইকরামা বলল :

'অতঃপর কী?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'তুমি বল, আমি আল্লাহকে এবং তারপর উপস্থিত সবাইকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি যে, আমি মুসলিম মুজাহিদ ও মুহাজির।'

ইকরামা অনুরূপ ঘোষণাই দিলেন। এ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

'আজ তুমি চাইলে, আমি অন্যদেরকে যা দিয়েছি, তোমাকেও তার চেয়ে কম দেব না।'

তখন ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'জীবনে আপনার সাথে যে দুশমনি করেছি কিংবা আপনার বিরুদ্ধে যত যুদ্ধ-বিগ্রহে অংশ গ্রহণ করেছি এবং আপনার সাক্ষাতে বা অনুপস্থিতিতে যত কটুবাক্য বলেছি বা কুৎসা রটিয়েছি তার জন্য আল্লাহর কাছে আমার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।'

তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য আল্লাহর দরবারে ইসতিগফার করে বলতে লাগলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ كُلَّ عَدَاوَةٍ عَادَانِيهَا، وَكُلَّ مَسِيْرٍ سَارَ فِيْهِ إِلٰى مَوضِعٍ يُرِيدُ بِهِ إِطْفَاءَ نُورِكَ، وَاغْفِرْلَهُ مَانَالَ مِنْ عِرْضِى فِى وَجْهِى أَوْ أَنَا غَائِبٌ عَنْهُ.

'হে আল্লাহ! ইকরামা আমার সাথে যত দুশমনী করেছে তা ক্ষমা করে দাও! তোমার দ্বীনের আলো নিভিয়ে দেয়ার জন্য যত চেষ্টা সাধনা করেছে, তা মাফ করে দাও। আমাকে যত গালমন্দ ও গীবত করেছে, তাও তাকে ক্ষমা করে দাও।'

তাঁর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আ ও ইসতিগফার শুনে ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হয়ে উঠল, তার অন্তর খুশিতে ভরে গেল। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ, এতদিন আল্লাহর দীনের প্রতিবন্ধকতায় যত ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি, এখন থেকে তাঁর দীনের প্রচার ও প্রসারে তার দ্বিগুণ খরচ করবো। দীনের বিজয়কে ঠেকানোর জন্য যত যুদ্ধ করেছি, এখন থেকে দীনের বিজয়ের জন্য তার চেয়ে দ্বিগুণ জিহাদ করবো।'

এক সময়ের শ্রেষ্ঠ অশ্বারোহী বীর, ঐদিন থেকে আল্লাহর পথে আহ্বানকারী হিসেবে দাওয়াতে দীনের কাফেলায় শরীক হলেন। সার্বক্ষণিক ইবাদত-বন্দেগী এবং মসজিদে কুরআন তিলাওয়াতে নিরন্তর মশগুল থাকতে শুরু করলেন। মুখমণ্ডলে কুরআন শরীফ চেপে ধরে চুম্বন দিতেন এবং আল্লাহর ভয়ে কেঁদে কেঁদে বলতেন :

'আমার প্রভুর কিতাব, আমার প্রভুর বাণী... ।'

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কৃত ওয়াদা হুবহু পালন করেন। ইসলাম গ্রহণের পর তিনি ইসলামের সমস্ত জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। এমন কোনো দাওয়াতী কাফেলা প্রেরণ করা হতো না, যে কাফেলার অগ্রভাগে তিনি থাকতেন না।

ইয়ারমুকের যুদ্ধের এক পর্যায়ে মুসলিম বাহিনীর ওপর যখন শত্রুপক্ষের প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হচ্ছিল, কালবিলম্ব না করে তিনি দ্রুতগামী ঘোড়া থেকে নেমে নিজ তলোয়ারের কোষ ভেঙে ফেলেন, জীবনে যেন কোনোদিন আর তলোয়ার কোষে আবদ্ধ করতে না হয়। তারপর রোমান সৈন্যদের ব্যূহ ভেদ করে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হন। তা দেখে খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দ্রুতগতিতে তাঁর নিকটে গিয়ে তাঁকে বলেন :

'এভাবে ভেতরে ঢুকবেন না। কেননা আপনার নিহত হওয়া মুসলমানদের জন্য ভীষণ ক্ষতির কারণ হবে।'

ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন :

'হে খালিদ! আমাকে ছেড়ে দিন, আপনি আমার পূর্বেই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান এনেছেন। কিন্তু আমি ও আমার পিতা আবী জাহল তখন ইসলামের ঘোর দুশমন ছিলাম। অতএব আমাকে ছেড়ে দিন। আমাকে আমার অতীত কৃতকর্মের কাফফারা আদায় করতে দিন।'

অতঃপর তিনি আবার বলে উঠেন :

'আল্লাহর রাসূলের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধ করেছি। আর আজ রোমান সৈন্যদের ভয়ে পালাব! তা কক্ষনো হতে পারে না।'

অতঃপর তিনি মুসলিম সৈন্যদের আহ্বান করে বললেন :

'তোমাদের মধ্যে কে মৃত্যুর জন্য আমার হাতে হাত দিয়ে শপথ করতে রাজি আছ? এতে চার শত সৈনিক তার হাতে হাত দিয়ে শপথ করে। তাদের মধ্যে ছিলেন তার চাচা হারিস ইবনে হিশাম এবং দিরার ইবনুল আযওয়ার রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা। তাঁর আহ্বানে তারা মুসলিম বাহিনীর প্রধান সেনাপতি খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর চারপাশে থেকে তার প্রতিরক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে থাকেন এবং তাঁকে ভালোভাবেই রক্ষা করে চলেন।'

ইয়ারমুকের এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধশেষে মুসলমান বাহিনীর বিজয় লাভের পর দেখা গেল, তিনজন মুসলমান বীর যোদ্ধা শত্রু বাহিনীর হাতে ভীষণভাবে আহত হয়ে পড়ে ছটফট করছেন।

তাঁরা হলেন :

১. হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু,

২. আইয়াশ ইবনে আবী রাবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং

৩. ইকরামা ইবনে আবী জাহল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্তিম সময়ে পানি পানি বলে চিৎকার করছিলেন। যখন দৌড়ে তাঁর কাছে পানি পৌঁছানো হলো, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তৃষ্ণার্ত অবস্থায় ইকরামা ইবনে আবী জাহল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেদিকে তাকাচ্ছেন, তা দেখে হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমার আগে ইকরামাকে পানি পান করাও।'

দৌড়ে যখন ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পানি আনা হলো তখন ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও দেখতে পেলেন যে আইয়াশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার দিকে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তাকাচ্ছেন। ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আগে আইয়াশকে পানি পান করাও।'

আইয়াশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পানি আনা হলে দেখতে পেলেন, আইয়াশ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

অতঃপর ইকরামা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকট পানি আনা হলে দেখা গেল, তিনিও আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন।

তাঁর কাছ থেকে হারিস ইবনে হিশাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পানি আনা হলে দেখা গেল, আল্লাহ তাঁকেও নিজের কাছে নিয়ে গিয়েছেন।

জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজের চেয়ে অপর দীনি ভাইকে প্রাধান্য দেওয়ার কারণে আল্লাহ তাঁদের ওপর সন্তুষ্ট হোন এবং তাদের সবাইকে হাউজে কাওসার থেকে পানি পান করান। তাঁরা যেন আর তৃষ্ণার্ত না থাকেন। হে আল্লাহ, বিশেষ করে তাঁদেরকে জান্নাতুল ফিরদাউস-এর বাগ-বাগিচা দান করো, যেন তারা অনন্তকাল সেখানে বিচরণ করতে পারেন। আমীন।

ইকরামা ইবনে আবী জাহ্ল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থসমূহ :

১. আল ইসাবাহ : ৫৬৪০ নং জীবনী।
২. তাহ্যীবুল আসমা; ১ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃ.।
৩. খুলাসাতুত্ তাহযীব; ২২৮ পৃ.।
৪. যাইলুল মুজীল; ৪৫ পৃ.।
৫. তারীখুল ইসলাম লিয্যাহাবী : ১ম খণ্ড, ৩৮০ পৃ.।
৬. রাগবাতুল আমাল : ৭ম খণ্ড, ২২৪ পৃ.।

# যায়েদ আল খাইর (রা)

*'তুমি নিশ্চয়ই ধৈর্য ও উদারতার মতো এমন দুটি গুণে গুণান্বিত, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিকট খুবই প্রিয়।'*

*- মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

এখন এমন একজন প্রসিদ্ধ সাহাবীর জীবনের দুটি দিকের ওপর আলোচনা করতে চাই, যিনি ইসলাম পূর্বকালে যেমন আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন এবং ইসলাম গ্রহণের পরের জীবনেও তেমনি এক মহান ও মহৎ ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

তিনি ছিলেন যায়েদ আল খাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। ইসলাম পূর্বকালে তাকে যায়েদ আল খাইল বলে ডাকা হতো। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যায়েদ আল খাইর নামে আখ্যায়িত করেন।

জাহেলী জীবনের যে অধ্যায় সম্পর্কে উপরে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে তা আরবী সাহিত্যে এভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা বনূ আমের গোত্রের সর্দারের বরাত দিয়ে শায়বানী বর্ণনা করেছেন :

> 'আমরা এক বছর অনাবৃষ্টি ও অজন্মার সম্মুখীন হই। ক্ষেত-খামার যেমন জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়, তেমনি পশু-খাদ্যের অভাবে গবাদিপশুর স্তনের দুধও শুকিয়ে যায়। অভাবের তাড়নায় আমাদের গোত্রের এক ব্যক্তি সপরিবারে হিরায় চলে যায়। সেখানে সে পরিবার-পরিজনকে রেখে তাদেরকে বলে যায়, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তোমরা এখানেই অবস্থান করতে থাক।'

সে শপথ নেয় যে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে ফিরে আসবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না সে ধন-দৌলত অর্জন করতে পারে, এমনকি এ পথে যদি তার মৃত্যুও হয়।

অতঃপর সফরের জন্য খাবার ও পানি নিয়ে সে অজ্ঞাত মনযিলের দিকে রওনা হয়। সারাদিন পথ চলার পর সে রাতের আঁধারে একটি তাঁবু দেখতে পায়, যার কাছেই ছিল একটি ঘোড়ার বাচ্চা বাঁধা। সে মনে মনে ভাবল, 'যাক এই প্রথমবারের মতো গণিমতের একটি মাল পেলাম।' সে ঘোড়ার রশির বাঁধন খোলার জন্য অগ্রসর হলো। রশি খুলে যখন পিঠে চড়তে উদ্যত হলো তখন হঠাৎ আওয়াজ এল :

> 'খবরদার! যদি বাচঁতে চাও তাহলে ঘোড়া থেকে নেমে নিজের জীবনকে গনীমতের মাল বলে মনে কর।'

তখন সে ঘোড়া থেকে নেমে জীবন বাঁচাতে নিজ পথেই রওনা হয়ে গেল। অতঃপর ক্রমাগত সাত দিন পথ চলার পর হঠাৎ সে একস্থানে উটের খোঁয়াড় দেখতে পেল, যার পাশেই বিরাট একটি তাঁবু এবং তার ভিতর চামড়ার তৈরি ঘর, যা প্রাচুর্য ও বিলাসিতার ইঙ্গিত বহন করছিল।

সে ভাবল :

> 'এ খোয়াড়টি নিশ্চয়ই উট রাখার জন্যই তৈরি, আর এ তাঁবুতে নিশ্চয়ই মানুষও থাকে।'

তখন সূর্য প্রায় ডুবু ডুবু। তাঁবুর ভেতর উঁকি মেরে সে দেখতে পেল, অতিশয় বৃদ্ধ এক ব্যক্তি সেখানে বসে আছে। সে ভিতরে ঢুকে বৃদ্ধের পিছনে ঘাপটি মেরে বসে পড়ল। বৃদ্ধটি তা বুঝতে পারল না। একটু পরই সূর্য অস্ত গেল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে একজন ঘোড়সওয়ার এসে উপস্থিত হলো। সে এক বিশাল দেহী স্বাস্থ্যবান ঘোড়সওয়ার, যার দু'পাশে দু'জন খাদেম হেঁটে চলে আসছে। সে তাকে দেখতেই পায়নি। যেমন আরোহী তেমনি তার বিরাট ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠ থেকে নামার জন্য এগিয়ে দেওয়া হল উচ্চাসন। এর দু'পাশে দু'জন খাদেম ঘোরাফেরা করছে। তাদের তত্ত্বাবধানে প্রায় ১০০টি উট এবং উটবহর, যাদের সামনে অবস্থান করছে বিরাট এক উট, যাকে অনুসরণ করে বাকি উটগুলো চলে থাকে। উটগুলোর সর্দার বসে পড়তেই বাকি সব উটও বসে

পড়ল। এই অশ্বারোহী তার এক খাদেমকে বড় একটি উটনীর দিকে ইশারা করে বলল :

'একে দোহন কর এবং তাঁবুতে অবস্থানরত শেখকে পান করাও।'

নির্দেশ পাওয়ামাত্রই খাদেম একটি পাত্রে উট দোহন করল এবং বৃদ্ধের সামনে রেখে অন্য কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। বৃদ্ধটি সেখান থেকে সামান্য কিছু পান করে বাকিটুকু রেখে দিলে বৃদ্ধের পেছনে লুকিয়ে থাকা এ লোকটি কি করল, তার বর্ণনা থেকেই শোনা যাক :

সে বর্ণনায় বলে :

'লুকিয়ে থেকে আমি সব দেখতে থাকি। আস্তে আস্তে অত্যন্ত সাবধানে অগ্রসর হয়ে দুধের পাত্রখানা হস্তগত করে সবটুকু দুধ পান করে খালি পাত্রটি বৃদ্ধের সামনে রেখে দেই। কিছুক্ষণ পর খাদেম ফিরে এসে দেখল যে, পাত্রের সমস্ত দুধই শেষ। সে বলে উঠল :

'হে মালিক! উনি তো সবটুকুই পান করে ফেলেছেন।

একথা শুনে অশ্বারোহী ব্যক্তির আর আনন্দের সীমা রইল না। সে খাদেমকে অন্য আরেকটি উট দোহন করে পাত্রখানা আবার বৃদ্ধের সামনে রাখার নির্দেশ দিল, খাদেম হুকুম তামিল করল।

এবারে বৃদ্ধ এক চুমুক পান করে বাকিটুকু সেবারের মতোই রেখে দিল। আমি ভাবলাম, এবার এখান থেকে অর্ধেক দুধ পান করি। কারণ, অশ্বোরোহীর মনে কোনো সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে।

এবার অশ্বারোহী খাদেমকে একটি বকরি যবেহ করার নির্দেশ দিল। বকরি যবেহ হয়ে গেলে অশ্বারোহী নিজেই গোশত ভুনা করল এবং নিজ হাতে বৃদ্ধকে খাওয়াল। বৃদ্ধকে খাওয়ানোর পরে সে এবং তার খাদেম খেতে বসল। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই সবাই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এবং নাক ডাকতে থাকল।

সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি সর্দার উটটির রশি খুলে তার পিঠে চড়ে বসি, সর্দার উটকে চালিয়ে নিতেই অন্য উটগুলোও পেছনে পেছনে চলতে আরম্ভ করল। সারা রাত ধরে চললাম।

সকাল হলে চতুর্দিকে ভালো করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখলাম :

'কেউ আমার সন্ধানে আসছে কি না? কেউ খুঁজতে আসছে বলে আমার মনে হলো না। আমি চলতেই থাকলাম। এমনকি দুপুর হয়ে গেল। এবার চারদিকে আরো ভালো করে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে লাগলাম। উদ্দেশ্য, কেউ খুজঁতে আসছে কি না, তা লক্ষ্য করা।'

এবার দেখতে পেলাম :

'অনেক দূরে যেন একটি শকুন বা বড় পাখি আমার দিকে ছুটে আসছে। তা ক্রমেই আমার নিকটবর্তী হতে থাকল এবং তারপর স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে একজন অশ্বারোহী। আমার বুঝতে বিলম্ব হলো না যে, অশ্বারোহী তার উটগুলো উদ্ধার করার জন্যই এসেছে। আমি তড়িঘড়ি করে উটটিকে বেঁধে ফেললাম এবং তীরের থলি থেকে তীর বের করে পজিশন অনুযায়ী আমার চতুষ্পার্শ্বে রেখে দিয়ে অন্য একটি তীর ধনুকে স্থাপন করে উটগুলোকে পেছনে রেখে আগন্তুক অশ্বারোহীর দিকে তাক করে ধরলাম।'

অশ্বারোহী বেশ দূরে অবস্থান নিয়ে আমাকে বলল :

'সর্দার উটটির রশি খুলে দাও।'

আমি বললাম :

'কক্ষনো নয়। আমি হীরাতে অনেক ক্ষুধার্ত স্ত্রী ও সন্তানদের রেখে এসেছি এবং শপথ করেছি যে, আমি অর্থ-সম্পদ নিয়ে ফিরব, কিংবা আমার মৃত্যু হবে।'

সে বলল :

'তোমার নির্ঘাত মৃত্যুই হবে। তুমি সর্দার উটটির রশি খুলে দাও।'

আমি বললাম : 'আমি কখনোই রশি খুলে দেবো না।'

তখন সে বলল : 'তুমি ধ্বংস হও। তুমি বড়ই বিভ্রান্ত।'

সে আবার বলল :

'সর্দার উটটির রশির গিরা কোথায়? উটটির রশিতে তিনটি গিরা দিয়ে বাঁধা ছিল।'

সে বলল :

'উটের রশিটি দেখিয়ে দাও এবং বল কোন্ গিরাটিতে তীর নিক্ষেপ করব?'

আমি তাকে গিরাটি দেখিয়ে দিলাম। অশ্বারোহী সেই গিরাটিতে তীর নিক্ষেপ করল, যেন সে নিজ হাত দিয়ে সেটি সেখানে রাখল। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় গিরাটিতেও লক্ষ্য ভেদ করল।

এ কাণ্ড দেখে আমি তীরগুলো থলেতে রাখলাম এবং আত্মসমর্পণ করলাম। অশ্বারোহী এবার এগিয়ে এসে আমার তরবারিখানা নিয়ে নিল এবং বলল :

'আমার পেছনে আরোহণ কর।'

আমি তার পেছনে আরোহণ করলে সে বলল :

'তোমার সাথে কেমন ব্যবহার করব বলে তুমি ধারণা করছ?'

আমি উত্তর দিলাম : 'খারাপ ধারণাই করছি।'

অশ্বারোহী বলল : 'কেন?'

আমি বললাম :

'আপনার সাথে যে ব্যবহার করেছি, তার জন্য কোনো ভালো ব্যবহার আশা করতে পারি না। তাছাড়া আপনাকে যে কষ্ট দিয়েছি, তার জন্য। এখনতো আল্লাহ্ আপনাকে বিজয় দান করেছেন।'

অশ্বারোহী বলল :

'তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার সাথে খারাপ আচরণ করব? অথচ তুমি আমার পিতা 'মুহালহালের সাথে পানাহারে অংশ নিয়েছ এবং সে রাতে তার সাথে এক পাত্রে দুধ পান করেছো' এবং সে রাতে তার সঙ্গী হয়েছ।'

আমি মুহালহালের নাম শোনামাত্রই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম :

'আপনি কি যায়েদ আল খাইল?

উত্তর এল : 'হ্যাঁ।'

উত্তর শুনে আমি বললাম : 'আপনি উত্তম কয়েদকারী হোন।'

অশ্বারোহী বলল :

'চিন্তার কোনো কারণ নেই– এ অভয় দিয়ে আমাকে নিজ আস্তানায় নিয়ে চলল।'

তিনি বললেন :

'আল্লাহর কসম! এ উটগুলো যদি আমার নিজের হতো, তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে দিয়ে দিতাম। কিন্তু এগুলো আমার এক বোনের। আমাদের এখানে কিছু দিন থাক। আমি লুটতরাজের উদ্দেশ্যে সহসাই একগোত্রে হামলা করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। আশা করি, বহু সম্পদ ছিনিয়ে আনতে পারব। সেখানে তোমাকে যা দেওয়ার দিয়ে দেব।'

তিন দিন যেতে না যেতেই যায়েদের দলবল বনূ নুমাইর গোত্রের ওপর হামলা করে প্রায় ১০০টির মতো উট লুট করে আনল এবং সবগুলোই আমাকে দিয়ে দিল। এমনকি আমার নিরাপত্তার জন্য যতক্ষণ 'হীরাতে' আমি না পৌঁছি, ততক্ষণের জন্য কিছুসংখ্যক লোককেও সাথে দিয়ে দিল।'

যায়েদ আল খাইলের এটা হলো জাহেলী যুগের চিত্র। আর তার ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনাবলি তো সীরাতের কিতাবসমূহে এভাবে বর্ণিত হয়েছে :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ যায়েদ আল খাইলের কানে পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের যে যৎকিঞ্চিৎ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে, তার উপরই গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করে সে সফরের জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও ঘোড়া তৈরি করে এবং স্বগোত্রের নেতাদের তার সাথে সফর করার এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার আহ্বান জানাল। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে 'বনূ তাঈ' গোত্রের এক বিরাট প্রতিনিধি দল তাদের অনুগামী হয়। তাদের মধ্যে যুর ইবনুস সাদুস, মালেক ইবনে জুবাইর এবং আমর ইবনে জুয়াইন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিরাট কাফেলা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছে এবং মসজিদের দরজার সাথে উটগুলো বসানো হয়।

মসজিদে প্রবেশ করেই তারা দেখতে পায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে বসে সমবেত মুসলমানদের উদ্দেশ্যে খুতবা দিচ্ছেন। তাঁর কথাগুলো ছিল যেমন হৃদয়গ্রাহী, তেমনি তাঁর প্রতি মুসলমানদের শ্রদ্ধা-ভক্তি ও আনুগত্যের উদাহরণও ছিল অনন্য। যেন তাঁর কথাগুলো শ্রোতাদের অন্তরে পৌঁছে গেঁথে যাচ্ছে।

খুতবা দানরত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টি যায়েদ ও তার সঙ্গী-সাথীদের ওপর পড়লে, তিনি খুতবার ভেতরেই বলে ওঠেন :

إِنِّىْ خَيرٌ لَّكُمْ مِنَ الْعُزَّى وَمِنْ كُلِّ مَا تعبُدون... إِنِّىْ خَيرٌ لَّكُمْ مِنَ الْجَمَلِ الْاَسْوَدِ الَّذِى تعبدونَهٗ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

> 'উয্‌যা ও অন্যান্য যেসব মূর্তির তোমরা পূজা করছ, তাদের সবার চেয়ে তোমাদের জন্য আমি উত্তম। আল্লাহ ছাড়া যেমন তোমরা কালো উটের ইবাদত করে থাকো এর চেয়েও আমি তোমাদের জন্য উত্তম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা যায়েদ আল খাইল এবং তার দলবলের ওপর দু'ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাদের মধ্যে অনেকেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তার দাওয়াত গ্রহণ করল। আর কিছুসংখ্যক তাঁর দাওয়াতে কর্ণপাত না করে অহংকারের সাথে তা প্রত্যাখ্যান করল। দ্বিধাবিভক্ত কাফেলার অর্ধেক রওয়ানা হলো জান্নাতের পথে, আর বাকিরা জাহান্নামের দিকেই তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখল। 'যুর ইবনুস সাদুস' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হীনদৃষ্টিতে দেখছিল, যা কখনোই অন্তর দিয়ে কামনা করার মতো ছিল না। আর তাই তখন তার আচরণেও এর প্রতিফলন ঘটল। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সে ভাবছিল এমন যেন না হয় যে, তাকে খারাপ পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়।

সে তার সঙ্গী-সাথীদের উদ্দেশ্য করে বলল :

> 'আমি দেখতে পাচ্ছি যে, সারা আরব এ ব্যক্তির করতলে আসবে। খোদার শপথ! আমি চাই না, তিনি আমার উপর কর্তৃত্ব করুন।'

অতঃপর সে সিরিয়ায় চলে যায় এবং মাথা ন্যাড়া করে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

এদিকে যায়েদ আল খাইল ও তার অন্যান্য সাথীদের দৃশ্য ছিল ভিন্ন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খুতবা শেষ হতে না হতেই যায়েদ আল খাইল মুসলিম জনতার সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন, সবারই দৃষ্টি পড়ল লম্বা-চওড়া স্বাস্থ্যবান এক আকর্ষণীয় চেহারার এ ব্যক্তির ওপর। এতো লম্বা যে, তিনি ঘোড়ায় চড়লে

দু'পা মাটি স্পর্শ করত। যেমন কেউ গাঁধার পিঠে চড়লে হয়। তিনি অত্যন্ত দৃঢ়কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে বলে ওঠেন :

'হে মুহাম্মদ! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই এবং আপনি আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে একটু অগ্রসর হলেন এবং প্রশ্ন করলেন :

'তুমি কে?'

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন :

'আমি যায়েদ আল খাইল ইবনে মুহালহাল।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে বললেন :

'না, তুমি এখন থেকে আর যায়েদ আল খাইল নও; বরং তুমি এখন থেকে যায়েদ আল খাইর। সেই আল্লাহর প্রশংসা, যিনি পাহাড়-পর্বত এবং সমতল ভূমির লুটতরাজের বিভীষিকা থেকে ফিরিয়ে এনে ইসলামের ছায়াতলে তোমাকে পৌঁছে দিয়েছেন।'

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদ আল খাইরকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে যান। ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং অন্য একজন সাহাবা তাঁর সাথে গেলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হুজরা মুবারকে পৌঁছলে তিনি যায়েদ আল খাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আরাম করে বসার জন্য খেজুরের ছোবড়াভরা চামড়ার তৈরি একটি বালিশ সাদৃশ্য গদি এগিয়ে দেন। এটা যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে একটি খুবই অসম্ভব ব্যাপার ছিল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে তিনি আরাম গদিতে বসবেন। তাই তিনি এটা পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকেই এগিয়ে দিলেন। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গদিটি আবার তার দিকেই এগিয়ে দেন এবং তিনিও পুনরায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ঠেলে দেন। এমনি করে তিনবার গদিটির দিক পরিবর্তন হলো, যথাযথভাবে বৈঠকের কর্মসূচি আরম্ভ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'হে যায়েদ আল খাইর! কেউ আমার কাছে যে ব্যক্তিরই বর্ণনা দেয় পরে সাক্ষাৎ হলে দেখি সে বর্ণনার চেয়ে অনেক নিচে। একমাত্র তুমিই তার ব্যতিক্রম।'

তারপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'হে যায়েদ! তোমার মধ্যে দুটি গুণ বিদ্যমান, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের খুবই প্রিয়।'

যায়েদ জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল, কী সে গুণ?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'উদারতা ও ধৈর্য।'

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাকে এমন গুণ দিয়েছেন, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছে প্রিয়।'

অতঃপর যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে বললেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে মাত্র তিনশত অশ্বারোহী দিন, যাতে আমি রোমান সাম্রাজ্যে আক্রমণ চালিয়ে তাদের যেন পরাজিত করতে পারি। পতনের জন্য ওরাই যথেষ্ট হবে।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার এই সাহসকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখলেন এবং বললেন :

'হে যায়েদ! নিঃসন্দেহে তোমার এ সাহস অতীব পছন্দনীয়, সত্যিই তুমি একজন সাহসী পুরুষ।'

অতঃপর যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে তাঁর সব সহযোগীরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করেন।

অতঃপর যায়েদ আল খাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নজদ-এ তার বাড়িতে ফেরার জন্য মনস্থ করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেশে

ফেরার অনুমতি দিলেন, যায়েদ বিদায় হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'সে কতই না ভালো ব্যক্তি! কতই না ভালো হতো! যদি মদীনার সংক্রামক ব্যাধি থেকে সে নিরাপদ থাকত।'

সে সময় মদীনায় এক প্রকার মারাত্মক সংক্রামক জ্বরের আবির্ভাব ঘটে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই উক্তি করার পরদিনই যায়েদ আল খাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জ্বরে আক্রান্ত হলেন। অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি তার সঙ্গী-সাথীদের বললেন :

'কাইসের গোত্র থেকে দূরের পথ ধরে চল। জাহেলী যুগে তাদের সাথে আমাদের ভীষণ যুদ্ধ হয়েছে। এমন না হয়, তাদের সাথে কোনো সংঘাতও বেধে যায়। কারণ আল্লাহর নামে শপথ করছি, মৃত্যুর পূর্বে আমার দ্বারা কোনো মুসলিমের রক্তপাত সম্ভব নয়।'

তাঁকে নিয়ে তাঁর সাথীরা নজদ-এর উদ্দেশ্যে দ্রুতগতিতে পথ অতিক্রম করছিল। তাঁর জ্বরও প্রহরে প্রহরে বেড়েই চলছিল। বড় আশা ছিল যে, তিনি ফিরে যাবেন এবং নিজ গোত্রের অন্যান্য লোকদের নিজ হাতে ইসলামে দীক্ষিত করবেন। এরপরই তাঁর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠল। তিনি ভীষণভাবে জ্বরে আক্রান্ত হলেন। অবশেষে তিনি পথিমধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর গুনাহ করার তিনি সময়ও পাননি। বেগুনাহ এ সাহাবী পরম শান্তিতে জান্নাতের পথ ধরলেন।

যায়েদ আল খাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :

---


১. আল ইসাবাহ্ : ২৯৪১ নং জীবনী ।
২. আল ইসতিয়াব : ১ম খণ্ড, ৫৬৩ পৃ. (আস সায়াদ সংস্করণ)।
৩. আল্ আগানী: (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৪. তাহজীব ইবনে আসাকির : (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৫. সামতুল লালিই: (সূচিপত্র দ্রষ্টব্য)।
৬. খাযানাতুল আদাব আল বাগদাদী : ২য় খণ্ড, ৪৪৮ পৃ.।
৭. যাইলুল মাযিল : ৩৩ পৃ.।
৮. সিমারুল কুলুব : ৮৭ পৃ.।
৯. আসশের ওয়াশ শুআরা: ৯৫ পৃ.।
১০. হুসনুস সাহাবা : ২৪৮ পৃ.।

# আদী ইবনে হাতেম আত্ তাঈ (রা)

*'যখন তারা কুফরীর পথ অবলম্বন করেছে, তখন তুমি ঈমান এনেছ। যখন তারা রাসূলুল্লাহ (স)-কে অস্বীকার করেছে, তখন তুমি তাকে অনুসরণ করেছ, যখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন তুমি পূর্ণ আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছ, এবং যখন তারা পশ্চাৎপদ হয়েছে তখন তুমি বীর বিক্রমে এগিয়ে চলেছ।'*

*-ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু*

নবম হিজরীতে আরবের এক প্রভাবশালী বাদশাহ ইসলামের বিজয়ে ভীত হয়ে দেশ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় দীর্ঘদিন নির্বাসিত জীবনযাপন করেন। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর এই ধর্মান্তরের ঘটনা খুবই চমৎকার ও বিরল এক দৃষ্টান্ত। ইসলামী দাওয়াতের বিরুদ্ধে তাঁর প্রবল বিরোধিতা একে একে ব্যর্থ হলে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলামে তাঁর এই আত্মসমর্পণ নিঃসন্দেহে অত্যন্ত দুর্লভ এক ঘটনার অন্তর্ভুক্ত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধাচরণকারী সেই বাদশাহ হলেন, ইতিহাস বিখ্যাত হাতেম আত তাঈ'র ছেলে 'আদী'। আদী শুধু বাদশাহ হিসেবেই নন; বরং দানবীর হিসেবেও ছিলেন, পিতার যোগ্য উত্তরসূরি। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি 'তাঈ' রাজ্যের বাদশাহ হয়েছিলেন। লুটতরাজকৃত সম্পদের এক-চতুর্থাংশ সম্পদ তাঁর জন্য নির্ধারিত ছিল। তিনি শুধু দেশের বাদশাহই ছিলেন না; বরং সেনাপতির দায়িত্বও তিনি পালন করতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আরবের সর্বত্র হক ও হেদায়াতের দাওয়াত দিতে শুরু করেন, তখন চতুর্দিকে ইসলামের দাওয়াত এর সম্প্রসারণ ঘটতে থাকে। একের পর এক অঞ্চল ইসলামের দাওয়াতী পতাকার ছায়ায় আসতে থাকে। আদী ইবনে হাতেম আত তাঈ উপলব্ধি করতে পারেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নেতৃত্বের কাছে তাঁর বংশানুক্রমে প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। নবপ্রতিষ্ঠিত ইসলামী রাষ্ট্রীয় সীমানায় তাঁর রাজ্য নিশ্চিত অন্তর্ভুক্ত হবে। ঠাণ্ডা মাথায় তিনি এ আশঙ্কার কথা চিন্তা করে নতুন ইসলামী রাষ্ট্র এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তীব্র বিরুদ্ধাচরণ আরম্ভ করেন। অথচ তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। না দেখে না জেনে জঘন্যভাবে বিরোধিতা করতে লাগলেন। দীর্ঘ ২০ বছর অব্যাহতভাবে ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকেন। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাঁকে হেদায়েতের পথ দেখালেন ও সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য তাঁর অন্তরকে প্রশস্ত করে দিলেন।

আদী ইবনে হাতেমের ইসলাম গ্রহণের ঘটনা অবিস্মরণীয়। তাঁর নিজের বর্ণনা থেকেই আমরা এখন বিস্তারিত জানতে পারব। কারণ, তিনি নিজেই তাঁর ঘটনা বস্তুনিষ্ঠভাবে বর্ণনা করার জন্য যথেষ্ট।

আদী ইবনে হাতেম আত তাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করছেন :

আরব বিশ্বে আমার চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যাপারে অন্তরে বিদ্বেষ পোষণকারী আর কেউ ছিল কি না সন্দেহ। আমি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী এক সম্ভ্রান্ত রাজপরিবারের যুবরাজ ছিলাম। অন্যান্য রাজা-বাদশাহর মতো আমিও লুটতরাজকৃত ধন-সম্পদের এক চতুর্থাংশ পেতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আবির্ভাবের সংবাদ শুনে তাঁকে বড়ই ঘৃণা করতে লাগলাম। অথচ তাঁর শক্তি বিশেষভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এমনকি তাঁর সৈন্যবাহিনী আরবের পূর্বপ্রান্ত থেকে পশ্চিমপ্রান্ত পর্যন্ত ছোট-বড় সব যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে দাপটের সাথে চলাফেরা করত। তখন একদিন আমার উটের রাখালকে বললাম :

> 'সাবাস গোলাম! দ্রুতগামী মোটাতাজা একটি উট আমার সফরের জন্য প্রস্তুত কর। এই উটকে আমার কাছেই সর্বক্ষণ বেঁধে রাখ। মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনী বা ক্ষুদ্র কোনো সৈন্যদলের কথাও যদি জানতে পার তাহলে আমাকে তৎক্ষণাৎ সংবাদ দিও।'

কোনো একদিন সকালে গোলাম এসে আমাকে সংবাদ দিল :

'হে আমার মনিব! মুহাম্মদের সৈন্য আপনার ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে। আপনি যে উটের কথা বলেছিলেন, সে ইচ্ছা এখন পূরণ করতে পারেন।'

তাকে বললাম :

'কেন? কী দুঃসংবাদ এনেছ?'

সে বলল :

'পতাকাবাহী কিছু সৈন্যকে আমাদের ভূখণ্ডে ঘোরাফেরা করতে দেখে তাঁদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, এরা মুহাম্মদের সৈন্যবাহিনী।'

তাঁকে বললাম :

'আমার জন্য যে উটটি তৈরি করে রেখেছ সেটি কাছে আনো। অতঃপর উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে লাগলাম। সবাইকে আমাদের প্রিয় ভূমি ছেড়ে পালানোর আহবান জানালাম এবং খুব দ্রুত সিরিয়ার দিকে রওনা দিলাম। উদ্দেশ্য ছিল এই যে, সেখানকার সমধর্মী খ্রিস্টানদের সাথে মিলিত হয়ে সেখানেই যেন বসবাস করতে পারি।

অত্যন্ত ব্যস্ততার সঙ্গে পরিবার-পরিজনকে একত্রিত করলাম। বিপদ নিশ্চিত জেনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু আমাদের জন্মস্থান নজদে আমার সহোদর বোন এবং তার সাথে বনূ তাঈ-এর বাদ বাকি লোক রয়ে গেল। আমার পক্ষে বোনকে আনার জন্য সেখানে যাওয়া সম্ভব ছিল না। সুতরাং আমার কাছে যারা উপস্থিত ছিল, তাদের নিয়েই সিরিয়ায় পৌঁছি এবং অন্যান্য খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ভাইদের সাথে বসবাস করতে থাকি। আমার বোনের ব্যাপারে যা আশঙ্কা করেছিলাম ঠিক তা-ই হয়েছিল। সিরিয়ায় অবস্থানকালে জানতে পারলাম, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অশ্বারোহী বাহিনী আমাদের বাড়ি-ঘরে হামলা করে মাল-সামান লুটতরাজ করে নিয়েছে। আমার বোন ও অন্যান্য মহিলাকে বন্দী করে ইয়াসরিবে নিয়ে যাওয়া হয়। মসজিদে নববীর দরজা সংলগ্ন নির্ধারিত স্থানে তাদের রাখা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এখান দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন আমার বোন সামনে দাঁড়িয়ে যায় এবং আরয করে :

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতা ইনতিকাল করেছেন। যিনি আমাকে সাহায্য করার জন্য আসার কথা তিনি গায়েব হয়েছেন। অতএব আপনি আমার ওপর করুণা করুন, আল্লাহ আপনার ওপর করুণা করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন :

'তোমাকে সাহায্য করার জন্য কার আসার কথা ছিল?'

আমার বোন উত্তর দেয় :

'আদী ইবনে হাতেমের।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :

'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কাছ থেকে যে পলায়ন করেছে, সেই ব্যক্তি কী?'

এ কথোপকথনের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্বাভাবিক গতিতে চলে যান। পরদিন যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে আবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে গতকাল যে আরয করেছিল, তারই পুনরাবৃত্তি করে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও গতকালের মতোই উত্তর দেন।

পরদিন আবার যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন সে নিরাশ হওয়ায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আর কিছু আরয করল না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছন থেকে এক ব্যক্তি আমার বোনকে আবার আবেদন করার জন্য ইশারা করলেন। ঐ ব্যক্তিটির ইশারা পেয়ে আমার বোন দাঁড়িয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পূর্ব দু'দিনের মতোই আবেদন করে :

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! পিতা ইনতিকাল করেছেন, সাহায্যের জন্য যার আসার কথা ছিল সে গায়েব হয়ে গেছে। অতএব আপনি আমার ওপর করুণা করুন, আল্লাহ আপনার ওপর করুণা করবেন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন :

'হ্যাঁ, করলাম।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা পেয়ে আমার বোন তাঁর খিদমতে আরয করল :

'আমার পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সাথে মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি সিরিয়ায় চলে যেতে চাই।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন :

'ব্যস্ত হয়ো না। ততদিন এখানে অপেক্ষা করতে থাক, যতদিন না তোমাদের সমগোত্রীয় নির্ভরযোগ্য কোনো কাফেলা না পাও। যে কাফেলা তোমাকে পরিজনের নিকট পৌঁছে দিতে পারে। যদি এমন কোনো কাফেলার সন্ধান পাও, তাহলে আমাকে অবহিত করো।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখান থেকে চলে যাওয়ার পর ইশারাকারী ব্যক্তি সম্পর্কে জানতে চাইলে উপস্থিত লোকেরা বললেন :

'তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।'

বিশ্বস্ত এক কাফেলার আগমন হলে, আমার বোন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে আরয করল :

'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার স্বগোত্রীয় একটি কাফেলা এখানে এসেছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু বিশ্বস্ত ব্যক্তি রয়েছে। যারা আমাকে আমার পরিজনের নিকট পৌঁছে দিতে পারে।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বোনকে কাপড়-চোপড় সেলাই করে দেন। আরোহণের জন্য একটি উট এবং প্রচুর পরিমাণ খাদ্য ও পানীয় সঙ্গে দেন। অতঃপর সে কাফেলার সাথে আমার বোন সিরিয়ার পথে রওনা হয়।

আদী ইবনে হাতেম আত তাঈ বলেন :

'এরপর থেকে নানাভাবে আমাদের কাছে তার সংবাদ আসতে থাকে, এবং তার আসার ব্যাপারে আশার সঞ্চার হয়; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার বোনের প্রতি যে সম্মান ও ভদ্রসুলভ আচরণ করেছেন, এমন খবর আমি মোটেও বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। তাছাড়া তাঁর প্রতি আমার কোনো ভালো ধারণাও ছিল না।'

একদিন আমি পরিবারের সদস্যদের নিয়ে বসেছিলাম। এ অবস্থায় দেখতে পেলাম হাউদায় উপবিষ্ট এক মহিলাকে নিয়ে একটি উট আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

আমি বলে উঠলাম :

'হাতেমের মেয়ে?'

সত্যি সত্যি সে উট থেকে নেমেই আমাকে বলছিল :

'ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক ছিন্নকারী যালিম! স্ত্রী, পরিবার, সন্তান-সন্ততি নিয়ে চলে এসেছ, আর অন্যদের মান-সম্মান ও সম্ভ্রমের কী হলো সে চিন্তাও করলে না?'

তাকে বললাম :

'সত্যি বলছি বোন, আমার যে পরিস্থিতি ছিল, সে পরিস্থিতিতে তা করা সম্ভব ছিল না। আমাকে গালমন্দ করো না, জীবনে বেঁচে যে এসেছি, এটাই কি যথেষ্ট নয়?'

নানাভাবে তাকে বোঝাতে চেষ্টা করি। অবশেষে, তার ক্রোধ উপশম হলো, শান্ত হয়ে সে সব ঘটনা শোনাল। নিঃসন্দেহে সে একজন বুদ্ধিমতী, সাহসী ও চতুর মহিলা। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম :

'মুহাম্মদ সম্পর্কে তোমার কী ধারণা?'

সে উত্তর দিল :

'খোদার শপথ! আমি মনে করি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তুমি তাঁর সাথে দেখা করো। তিনি যদি নবী হন, তাহলে তাঁর কাছে শীঘ্রই যাওয়া শ্রেয়, আর যদি তিনি শাহানশাহ হন তাহলে তুমি যেভাবে ছিলে সেভাবেই মর্যাদা পাবে।'

আদী ইবনে হাতেম বলেন :

'আমি দ্রুত প্রস্তুতি নিয়ে কোনোরূপ নিরাপত্তা বা চিঠিপত্র ছাড়াই মদীনা মুনাওয়ারায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হই, শুধু আমার এতটুকু আশা ছিল যে, আমি জানতে পেরেছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উপস্থিতির প্রত্যাশা করেন।'

তিনি বলেছেন :

'আমি আশা করছি যে, আল্লাহ আদী ইবনে হাতেমের হাতকে আমার হাতের সাথে মিলিয়ে দেবেন। বুকভরা আশা নিয়ে মসজিদে নববীতে অবস্থানরত অবস্থায় তাঁকে গিয়ে সালাম করি।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন : 'কে?'

উত্তর দিলাম :

'আদী ইবনে হাতেম আত তাঈ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে অভ্যর্থনার উদ্দেশ্যে ওঠে দাঁড়ালেন এবং আমার হাত ধরে সোজা তাঁর বাড়ির দিকে রওয়া হলেন।'

শপথ করে বলছি, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সঙ্গে নিয়ে তার বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন, এমন সময় অশীতিপর এক বৃদ্ধা একটি শিশু ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড় করালেন। তার সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে কথাবার্তা বললেন, বৃদ্ধার সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তিনি তাঁর সাথেই রইলেন। আমিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে দাঁড়িয়েই রইলাম। আর মনে মনে বলতে লাগলাম :

'খোদার শপথ! এ ব্যক্তি তো কোনো বাদশাহ হতে পারেন না।'

অতঃপর আবার হাত ধরে রওয়া দিলেন। আমরা তাঁর বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ভিতরে খেজুরের ছোবড়া ভরা চামড়ার তৈরি (তার বাসভবনের একমাত্র ফার্নিচারস্বরূপ) বালিশ সাদৃশ্য গদিখানা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বসতে বললেন। আমি লজ্জিত হয়ে বললাম :

'না, না আপনি বসুন।'

তিনি বললেন :

'না তুমিই বসো, পরিশেষে বেয়াদবি না হয় মনে করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ মেনে নিয়ে তাতেই বসে পড়লাম।'

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেঝেতে বসলেন। তাঁর ঘরে এছাড়া বসার আর দ্বিতীয় কিছুই ছিল না। মনে মনে বলছিলাম :

'এ কোন বাদশাহর বাড়ি হতে পারে না।'

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে সম্বোধন করে বলেন :

'আদী, তুমি কি খ্রিস্টান ও পৌত্তলিকতার মাঝামাঝি রুকুসিয়া ধর্মাবলম্বী নও?'

আমি বললাম : 'জি হ্যাঁ।'

অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন :

'তুমি কি তোমার রাজ্যে এক-চতুর্থাংশ গ্রহণকারী নামে পরিচিত ছিলে না? তাদের নিকট থেকে যে এক-চতুর্থাংশ সম্পদ নিতে তা কি তোমার ধর্মে নিষিদ্ধ ছিল না?

আমি উত্তর দিলাম :

'জি হ্যাঁ, এবং আমার বুঝতে আর বাকি রইল না, তিনি অবশ্যই প্রেরিত রাসূল।'

তিনি আবার আমাকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন :

'হে আদী! সম্ভবত মুসলমানদের আর্থিক হীনতা ও অভাব-অনটন আজ তোমার ইসলামে প্রবেশের পথে প্রধান বাধা।

'খোদার শপথ! সেদিন অতি নিকটে, যখন তাদের ধন-সম্পদের এতো প্রাচুর্য হবে যে, যাকাত-খয়রাত নেওয়ার মতো লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না।

'হে আদী! সম্ভবত, আজ মুসলমানদের সংখ্যাস্বল্পতা ও তাদের বিরুদ্ধে সীমাহীন শত্রুতা তোমার ইসলামে প্রবেশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।'

'খোদার শপথ! অচিরেই দেখতে পাবে, একজন মহিলা কাদেসিয়ার শেষ প্রান্ত থেকে একাকী উটে আরোহণ করে বায়তুল্লাহর যিয়ারতে আসবে, অথচ আল্লাহ ছাড়া তার আর কোনো ভয় থাকবে না।

'হে আদী! ইসলাম গ্রহণে বাধা দানকারী, 'রাজা বাদশাহগণ সবাই অমুসলিম।'

'খোদার শপথ! অনতিবিলম্বেই দেখবে, ইরাকের বাবেলের শুভ্র রাজপ্রাসাদ মুসলমানদের করতলগত। কিসরা ইবনে হুরমুযের ধন-ভাণ্ডারও তাদের হস্তগত।'

আমি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেসা করলাম : 'কিসরা ইবনে হুরমুয়ের ধন-ভাণ্ডার?'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তর দিলেন :

'হ্যাঁ, কিসরা ইবনে হুরমুযের ধন-ভাণ্ডার।'

এ শুনে আমি কালেমা শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম গ্রহণ করলাম।

আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন। তিনি বলতেন :

> 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুটি ভবিষ্যদ্বাণী তো স্বচক্ষে সংঘটিত হতে দেখলাম। আমি দেখেছি, কাদেসিয়া থেকে মহিলারা তাদের উটের পিঠে আরোহণ করে এসে নির্দ্বিধায় খোদার এই ঘর যিয়ারত করে যাচ্ছে। কিসরা সম্রাটের ধনভাণ্ডারে আক্রমণকারীদের মধ্যে আমিই অগ্রভাগে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার ছিলাম। খোদার শপথ! তৃতীয়টিও সংঘটিত হবে।'

আল্লাহ তাঁর প্রিয় নবীর ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়ন করেই দেখালেন। তৃতীয় ভবিষ্যদ্বাণী ইসলামের পঞ্চম খলীফা ওমর ইবনে আব্দুল আযীয রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সময় বাস্তবে সংঘটিত হয়। আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের এত ধনদৌলতের প্রাচুর্য দান করেন যে, সরকারি দায়িত্বে নিয়োজিত যাকাত বণ্টনকারীগণ যাকাত গ্রহণকারীদের তালাশের জন্য রাস্তায় রাস্তায় আহ্বান করে বেড়াতেন; কিন্তু তা গ্রহণ করার মতো কোনো অভাবীকে পেতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণীকে আল্লাহ সত্যি সত্যি প্রমাণ করে দেখালেন এবং আদী ইবনে হাতেম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শপথকেও আল্লাহ সম্মান দিলেন।

---

আদী ইবনে হাতেম আত তাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ (আস সায়াদা সংস্করণ)-৪র্থ খণ্ড, ২২৮-২২৯ পৃ.।
২. আল ইসতিয়াব। (হায়দরাবাদ সংস্করণ)-২য় খণ্ড, ৫০২-৫০৩ পৃ.।
৩. উসদুল গাবাহ-৩য় খণ্ড, ৩৯২-৩৯৪ পৃ.।
৪. তাহযীবুত তাহযীব-৭ম খণ্ড, ১৬৬-১৬৭ পৃ.।
৫. তাক্বরিবুত তাহযীব-২য় খণ্ড, ১৬ পৃ.।
৬. খুলাসাতু তাযহীব তাহযীবুল কামাল-২৬৩-২৬৪ পৃ.।
৭. তাজরীদু আসমাউস সাহাবা-১ম খণ্ড, ৪০৫ পৃ.।

৮. আল জামউ বাইনা রিজালিস সহীহাইন-১ খণ্ড, ৩৯৮ পৃ.।

৯. আল ইবরু-১ম খন্ড, ৭৪ পৃ.।

১০. আত তারীখুল কাবীর-৪র্থ খণ্ড, (ভমিকা), ১ম খণ্ড, ৪৩ পৃ.।

১১. তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী-৩য় খণ্ড, ৪৬-৪৮ পৃ.।

১২. শাজরাতুয্‌যাহাব-১ম খণ্ড, ৭৪ পৃ.।

১৩. আল মায়ারেফ-১৩৬ পৃ.।

১৪. আল মুয়াম্মারুন-৪৬ পৃ.।

# আবূ যর গিফারী (রা)

*'আবূ যর গিফারীর চেয়ে অধিক সত্যবাদী কোনো ব্যক্তি এ পর্যন্ত পৃথিবীতে না জন্মগ্রহণ করেছে, আর না আকাশ তাকে ছায়াদান করেছে।'*

*-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

মক্কার সাথে বহির্বিশ্বের যাতায়াতের একমাত্র মরুপথ 'ওয়াদীয়ে ওয়াদ্দান' নামক স্থানে গিফার নামক একটি গোত্রের বসবাস ছিল। কুরাইশদের তেজারতী কাফেলা সিরিয়া যাতায়াতকালে তারা যা কিছু সাহায্য-সহযোগিতা করত এবং তাদের খিদমতের বিনিময়ে যা তারা পেত, তা দিয়েই এ গোত্রের কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ হতো। যদি কোনো কাফেলা কোনো কারণে সাহায্য করতে অনীহা দেখাত, তাহলে সে কাফেলা তাদের লুটতরাজের শিকার হতো।

'জুনদুব ইবনে জুনাদাহ' যাকে আবূ যর বলে সম্বোধন করা হতো, তিনি এই গিফার গোত্রেরই সন্তান। কিন্তু গোত্রের অন্যান্য লোকের তুলনায় তাঁর সততা, ন্যায়পরায়ণতা, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতা ছিল খুব বেশি। মূর্তিপূজার প্রতি তাঁর ছিল প্রচণ্ড ঘৃণা। তাঁর গোত্রের লোকজন আল্লাহ ছাড়া এসব দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করুক, তা তিনি আদৌ পছন্দ করতেন না। কুসংস্কারাচ্ছন্ন আরবরা যেদিকে ছিল আগ্রহ সহকারে ধাবমান, তিনি তাঁর ঈমান নিয়ে অবস্থান নিয়েছিলেন এর সম্পূর্ণ বিপরীতে।

এ পথে বিভিন্ন কাফেলার যাতায়াত এবং তাদের সঙ্গে মেলামেশার কারণে তিনি জানতে পারেন যে, আরবে এক নবীর আবির্ভাব ঘটেছে, যার কথাবার্তা যুক্তিসঙ্গত এবং বিবেকের মানদণ্ডে গ্রহণযোগ্য। এ নবী তাঁর অনুসারীদের আলোর পথ, সত্যের পথ দেখান। তিনি আরও সংবাদ পেলেন যে, এ নবী আরবের মক্কাতেই জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি মক্কাতেই দীন প্রচার করছেন।

তিনি তার ভাই আনিসকে বললেন :

'তুমি মক্কায় যাও, যে ব্যক্তি সেখানে নবুওয়াতের দাবি করছেন, তাঁর সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে এস, তার ওপর নাকি ওহীও নাযিল হয়ে থাকে। কী অবতীর্ণ হয় তার কিছু নমুনা নিয়ে আসবে।'

একদিন আনিস মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলেন। মক্কায় পৌঁছে তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পবিত্র কালাম থেকে কিছু শোনে নিয়ে আবার 'ওয়াদীয়ে ওয়াদ্দান'-এর গিফার গোত্রে ফিরে এলেন। আবেগভরা মন নিয়ে আনিসকে অভ্যর্থনা জানিয়ে আবূ যর গিফারী নতুন নবীর সংবাদ জানতে চাইলেন। আনিস মক্কায় গিয়ে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন, সবই বর্ণনা করলেন এবং আরও বললেন :

'আল্লাহর কসম! তিনি সকলকে উন্নত চরিত্রে চরিত্রবান হওয়ার উপদেশ দেন। তাঁর কথাবার্তা কবিতা নয়, অতি বাস্তব।'

তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'লোকেরা তার সম্পর্কে কি বলে?'

আনিস বললেন :

'তারা বলে, তিনি একজন জাদুকর বা গণক বা কবি হবেন।'

আবূ যর আনিসকে বললেন :

'তুমি আমার মনের ক্ষুধা মেটাতে পারলে না, আমার পিপাসাও তুমি নিবৃত্ত করতে পারলে না। যাক, তুমি যদি পরিবার-পরিজনের দেখাশোনা করতে পার, তাহলে আমি নিজে গিয়েই বিস্তারিত অবগত হই।'

আনিস বললেন :

'হ্যাঁ, পারব। তবে মক্কাবাসী থেকে খুবই সতর্ক থাকবেন।'

আনিস থেকে এ আশ্বাস পেয়ে আবূ যর পরদিন সকালে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সাথে নিলেন, বকরির চামড়ার তৈরি পানি রাখার মশক এবং পথচলার কিছু পাথেয়। মক্কায় পৌঁছেই তিনি সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসু দৃষ্টিকে পাশ কাটিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে থাকেন। তিনি বুঝতে পারেন, মক্কার কুরাইশরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ। তিনি কুরাইশদের মূর্তিগুলোকে পছন্দ করেন না।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারীদের তারা আদৌ বরদাশত করতে পারছে না। অধিকন্তু তাদের ওপর নিপীড়ন নির্যাতন করত এসব খবর তিনি আগেই পেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি মক্কায় পৌঁছে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করা মোটেই পছন্দ করলেন না। কারণ, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি হতে পারে শত্রুদলভুক্ত। শেষে কোন্ মুসিবতেই না পড়তে হয়। নানা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়েই দিন অতিবাহিত হলো, রাত এল। মসজিদে হারামেই শুয়ে পড়লেন। তখন তার পাশ দিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যাচ্ছিলেন। একজন ভিনদেশী মুসাফিরকে দেখে তাকে বললেন :

'এখানে শুয়ে আছেন। আমার মেহমান হোন না কেন?'

আবূ যর সম্মতি দিলেন, মেহমান হিসেবে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে রাত্রি যাপন করতে গেলেন। পারস্পরিক কুশল বিনিময় ছাড়াই রাত কাটালেন। সকালে আবূ যর পানির মশক ও তার অন্যান্য পাথেয় নিয়ে মসজিদে হারামে চলে এলেন। দ্বিতীয় দিনও আবূ যর মসজিদে হারামেই কাটালেন; কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেখা পেলেন না। এ রাতেও তিনি মসজিদে হারামেই ঘুমিয়ে পড়লেন। সে রাতেও আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নজরে পড়লে তিনি আবূ যরকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'আপনি কি এখনো গন্তব্য স্থানের সন্ধান পাননি?'

একথা বলে তাকে গতরাতের মতো এ রাতেও মেহমান হিসেবে নিজ বাড়িতে আনলেন। সে রাতেও তারা পরস্পরকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। তৃতীয় রাতেও আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মেহমান হলেন আবূ যর গিফারী। এবার আলী

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ যরকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'সম্মানিত অতিথি, কী উদ্দেশ্যে আপনি মক্কা এসেছেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি?'

আবূ যর বললেন :

'যদি আমাকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, আমি যেখানে যেতে চাই সেখানে পৌঁছে দেবেন, তাহলে বলতে পারি।'

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে সে প্রতিশ্রুতি দিলে আবূ যর গিফারী বলতে লাগলেন :

'বহুদূর থেকে মক্কায় এসেছি, নতুন নবীর সাথে দেখা করে তাঁর ওপর অবতীর্ণ কিছু আয়াত শোনার উদ্দেশ্যে।'

একথা শোনামাত্রই আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মন খুশিতে ভরে উঠল। তিনি বললেন :

'আল্লাহর শপথ! তিনি অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, অবশ্যই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। সকালে আপনি আমাকে অনুসরণ করে চলবেন। যদি আপনার জন্য কোনো বিপদের আশঙ্কা করি, তাহলে আমি পানি ফেলানুর ভান করব। আর যখন ফের চলা আরম্ভ করব, আপনিও আমাকে অনুসরণ করে চলতে থাকবেন এবং আমি যেখানে প্রবেশ করব, আপনিও সেখানে প্রবেশ করবেন।'

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াত এবং তাঁর ওপর অবতীর্ণ আয়াত শ্রবণের আকাঙ্ক্ষায় সারা রাত আবূ যরের ঘুম হলো না। সকালে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মেহমানকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ির দিকে রওনা হলেন এবং আবূ যর তাঁকে অনুসরণ করে চললেন এবং কোনো দিকে না তাকিয়ে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে গিয়ে হাজির হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামেকে উদ্দেশ্য করে বললেন :

'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ!'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও উত্তরে বললেন :

'ওয়া আলাইকাসসালামু ওয়া রাহ্‌মাতুহূ ওয়াবারাকাতুহূ।'

আবূ যর ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বপ্রথম সালাম দেন এবং তখন থেকেই ইসলামের এই সালামপ্রথা মুসলমানদের মধ্যে প্রচার ও প্রসার লাভ করে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যরকে পবিত্র কুরআনের অংশবিশেষ তিলাওয়াত করে শোনান এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করলে তিনি সাথে সাথে কালেমা শাহাদাত পাঠের মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁকে নিয়ে মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়াল তখন ৩-৪ বা ৪-৫ জন মাত্র।

আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা তাঁর ভাষায়ই এখন আমরা জানতে পারব। আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'ইসলাম গ্রহণের পর মক্কাতেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবস্থান করতে থাকি। তিনি প্রতিদিন আমাকে ইসলামের শিক্ষা দান করতেন ও আল কুরআনের অবতীর্ণ কিছু অংশ হিফ্‌য করাতেন।

তিনি আমাকে বললেন :

'মক্কায় তোমার ইসলাম গ্রহণের সংবাদ কাউকে জানতে দিও না। কেননা, আমি আশঙ্কা করছি, তারা তোমাকে হত্যা করে ফেলবে।'

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে আরয করলাম :

'যে সত্তার হাতে আমার জীবন, সেই সত্তার শপথ করে বলছি, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত মক্কা ত্যাগ করব না; যতক্ষণ না মসজিদে হারামে উপস্থিত হয়ে কুরাইশদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদের ইসলামের দাওয়াত না দেব।'

আমার একথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব রইলেন। মসজিদে হারাম বা খানায়ে কা'বায় এসে দেখতে পেলাম, কুরাইশনেতারা আসর জমিয়ে পরস্পরে গল্পে ব্যস্ত। আমি তাদের ভিতরে ঢুকে পড়লাম এবং উচ্চৈঃস্বরে বললাম :

'হে কুরাইশগণ জেনে রাখো। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।'

আমার আওয়াজ তাদের কানে পৌঁছামাত্রই তারা তাদের গল্পের আসর ত্যাগ করে আমার দিকে ছুটে এসে বলতে থাকে, ধুর্মচ্যুত এই ব্যক্তিকে আজ জনমের শিক্ষা দেওয়া উচিত। এ বলে তারা সম্মিলিতভাবে আমার ওপর এমনভাবে চড়াও হয় যে, তাতে আমি মৃত্যুর সম্মুখীন হই। এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব আমাকে রক্ষা করার লক্ষ্যে দৌঁড়ে আসেন এবং তাদের হাত থেকে আমাকে ছাড়িয়ে নেন ও কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলতে থাকেন :

'তোমরা নিজ হাতে নিজেদের ধ্বংস ও বিপদ টেনে আনছ। গিফার গোত্রের এ লোককে মেরে ফেলতে চাচ্ছ? অথচ তাদের নাকের ডগার ওপর দিয়ে তোমাদের তেজারতী কাফেলা যাতায়াত করে! তোমরা তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

উত্তেজনা প্রশমিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে আসি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার রক্তাক্ত অবস্থা দেখে বললেন :

'তোমাকে কি ইসলাম গ্রহণের সংবাদ জানাতে নিষেধ করিনি?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উত্তর দিলাম :

'হে আল্লাহর রাসূল! আমার জন্য এ ঘোষণা দেওয়া প্রয়োজন ছিল।'

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন :

'তোমার গোত্রের লোকদের মাঝে চলে যাও, যা কিছু দেখলে ও শুনলে, তা তাদের জানাও এবং তাদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে থাক। আশা করছি, দাওয়াত সম্প্রসারিত হবে এবং এর জন্য আল্লাহ তোমাকেও উত্তমভাবে পুরস্কৃত করবেন। তুমি যখন জানতে পারবে যে, আমি প্রকাশ্যভাবে দীনের আহ্বান জানাচ্ছি ও দীনের বিজয় হয়েছে, তখন তুমি আমার নিকট চলে এস।'

অতঃপর আমি আমার গোত্রের লোকজনের নিকট চলে আসি। প্রথমে আমার ভাই আনিস আমার সাথে সাক্ষাৎ করে বলে :

'কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?'

উত্তর দিলাম :

'সিদ্ধান্ত এই যে, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছি ও ইসলাম গ্রহণ করেছি।'

মুহূর্তের মধ্যে আল্লাহ তার অন্তরও ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দিলেন। সেও বলে উঠল :

'আমাদের পৌত্তলিক ধর্মের অসারতায় আমার মোটেই মন বসছে না। তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে আমিও ইসলাম গ্রহণ করছি।'

অতঃপর আমরা আমাদের মায়ের নিকট গেলাম। তাঁকেও ইসলামের দাওয়াত দিলাম। তিনিও আমাদের দু'জনের দীনের প্রতি আন্তরিকতার পরিচয় দিয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হলেন। সেদিন থেকেই আমাদের পরিবার একটি মুসলিম পরিবার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। গিফার গোত্রের অন্যান্য লোকদেরকেও আল্লাহর পথে আহবান জানাতে থাকলাম। গিফার গোত্রের বিরাট জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এমনকি তারা জামাআতের সাথে নামায কায়েম করতে থাকে। সে গোত্রের আবার অনেকেই শর্ত আরোপ করে যে, ততদিন পর্যন্ত আমাদের ধর্ম ত্যাগ করব না, যতদিন না রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করলে, তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেন :

'আল্লাহ গিফার গোত্রকে ক্ষমা করুন। আর আসলাম গোত্রকে আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তা দান করুন।'

আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নিজ পল্লির গিফার গোত্রেই বসবাস করতে থাকেন। সেখানে বসবাসকালেই বদর, ওহুদ ও খন্দক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। খন্দক যুদ্ধের পর তিনি মদীনায় আগমন করেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভের জন্য অন্য সবকিছু থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

সার্বক্ষণিক খিদমতে নিয়োজিত থাকার অনুমতি প্রার্থনা করলে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তার পবিত্র সংশ্রবের নিয়ামত থেকে তৃপ্ত হওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। তিনিও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সার্বক্ষণিক খিদমতের মাধ্যমে নিজেকে ধন্য করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ যর গিফারীকে অন্য সবার ওপর যেমন প্রাধান্য দিতেন, তেমনি তাঁকে সবচেয়ে বেশি সম্মানও করতেন। তাদের পরস্পরে এমন কোনো সাক্ষাৎ সংগঠিত হতো না, যে সাক্ষাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাথে মোছাফাহা না করতেন, কিংবা মুচকি হাসির সাথে তাঁকে খোশ আমদেদ না জানাতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকাল তাঁকে অস্বাভাবিকভাবে পীড়া দেয়। তাঁর মহান নেতার হেদায়াতের মজলিশ ও পবিত্র সাহচর্য থেকে বঞ্চিত হওয়ায় তাঁর মন ভেঙে যায়। পরিশেষে আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করে সিরিয়ায় এক গ্রামে গিয়ে বসবাস আরম্ভ করেন। আবূ বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার খিলাফতের সময়ে তিনি সেখানেই অবস্থান করেন।

উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের সময় আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেখান থেকে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে চলে আসেন। দামেস্কের মুসলমানদের অসাধারণ বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ও ধন-দৌলতের প্রতি তীব্র মোহের অবস্থা দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং কঠোর ভাষায় তাদের এই নৈতিক অধঃপতনের প্রতিবাদ জানাতে থাকেন; কিন্তু জনসাধারণ তাঁর আহবানে সাড়া না দিয়ে বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হয়। এ অবস্থা দেখে উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে মদীনা মুনাওয়ারায় ডেকে পাঠালেন। খালীফাতুল মুসলিমীনের আহবানে সাড়া দিয়ে তিনি মদীনায় চলে আসেন। কিন্তু দেখতে না দেখতে এখানকার জনসাধারণের প্রতি তাদের বস্তুবাদী ধ্যান-ধারণা ধন-দৌলতের প্রতি মোহের কারণে বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেন এবং জনসাধারণও নিজেদের সংশোধন না করে তাকে চরমপন্থী হিসেবে অপবাদ দিতে থাকে।

পরিশেষে, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে মদীনা শহরের পরিবেশ থেকে সামান্য দূরে 'আর রাবযা' নামক একটি ছোট গ্রামে গিয়ে বসবাস করার নির্দেশ দিলেন। তিনিও শহরাঞ্চলের জনপদ থেকে দূরে 'আর রাবযা' গ্রামে গিয়ে দুনিয়ার ধন-সম্পদের চাকচিক্য থেকে দূরে থেকে ইবাদত-বন্দেগীতে ডুবে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম ও দ্বিতীয় খলীফাদের মতো দুনিয়া ত্যাগী ও পরকালমুখী জীবন যাপন করতে লাগলেন।

একবার এক ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর ঘরের ভেতরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু তাঁর ঘরে কোনো আসবাবপত্র ও সাজ-সরঞ্জাম না দেখে আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করে :

'হে আবূ যর! আপনার ঘরের আসবাবপত্র কোথায়?।'

তিনি উত্তর দিলেন :

'সেখানে (আখিরাতে) আমাদের আর একটা বাড়ি আছে, ভালো ভালো ফার্নিচার ও জিনিসগুলো আমরা সেখানেই পাঠিয়ে দেই।'

সে ব্যক্তি আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে আবার জিজ্ঞাসা করল :

'দুনিয়ায় যতদিন আছেন, জীবনযাপনের জন্য তো অত্যাবশ্যকীয় কিছু বস্তু তো নিশ্চয়ই প্রয়োজন?'

আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'কিন্তু বাড়ির মালিক তো আমাদের এ বাড়িতে থাকতে দেবেন না এবং সহসাই সেখানে পাঠিয়ে দেবেন।'

একবার সিরিয়ার গভর্নর তাঁর খিদমতে ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে আরয করেন :

'আপনার প্রয়োজনীয় খরচাদিতে স্বর্ণমুদ্রাগুলো ব্যয় করতে অনুরোধ করছি।'

আবূ যর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়ার গভর্নরকে ঐ মুদ্রাগুলো ফেরত দিয়ে বললেন :

'সিরিয়ার গভর্নর কি আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আমার চেয়েও দুর্বল ও নিকৃষ্টতম কাউকে পাননি?'

হিজরী ৩২ সনে এই বুযর্গ ও আবেদ সাহাবী ইহলোক ত্যাগ করে জান্নাতবাসী হন। তাঁর সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন :

مَاأَقَلَّتِ الغبراءُ وَلاأَظَلَّت الخَضْرَاءُ مِنْ رَجُلٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبِى ذَرٍّ.

'আসমানের নিচে এ পৃথিবীতে আবূ যরের চেয়ে অধিক সত্যবাদী কোনো ব্যক্তির জন্ম হয় নাই।'

---

আবূ যর গিফারী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি:


১. আল ইসাবাহ-আস্‌সায়াদাহ সংস্করণ-৩য় খন্ড, ৬০-৬৩ পৃ.।
২. আল ইসতিআব-হায়দরাবাদ সংস্করণ-২য় খন্ড, ৬৪৫-৬৪৬ পৃ.।
৩. তাহযীবুত তাহজিব-২য় খণ্ড, ৪২০ পৃ.।
৪. তাজরীদ আসমাউস সাহাবা-২য় খণ্ড, ১৭৫ পৃ.।
৫. তাজকিরাতুল হুফ্‌যাজ-১ম খণ্ড, ১৫-১৬ পৃ.।
৬. হুলিয়াতুল আওলিয়া-১ম খণ্ড, ১৫৬-১৭০ পৃ.।
৭. সিফাতুস সাফওয়া-১ম খণ্ড, ২৩৮-২৪৫ পৃ.।
৮. তাবাকাতুস শা'রানী-৩২ পৃ.।
৯. আল মা'আরিফ-১১০-১১১ পৃ.।
১০. শাজারাতুজ্জাহাব -১ম খণ্ড, ৩৯ পৃ.।
১১. আল ইবরু-১ম খণ্ড, ৩৩ পৃ.।
১২. যু আমাউল ইসলাম-১৬৭-১৭৩ পৃ.।

# আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা)

*'আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রা) এমন এক জন্মান্ধ ব্যক্তি, যার সম্মানে আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ১৬টি আয়াত অবতীর্ণ করেছেন। অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে যার তিলাওয়াত আরম্ভ হয়েছে, অদ্যাবধি চলছে, এবং যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিনই রাত দিন 'এর তিলাওয়াত অব্যাহত থাকবে।'*

*–মুফাসসিরীনের উক্তি।*

কে সেই ব্যক্তি? যার জন্য সপ্তম আকাশের ওপর থেকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কঠোর ভাষায় ভর্ৎসনা করা হয়েছিল? জানেন কি, সে ব্যক্তি কে? যার সম্পর্কে জিবরাঈল আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ওহী নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন?

হ্যাঁ, সেই ব্যক্তিই হলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুয়াযযিন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লালাহু তাআলা আনহু।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাক্কী, কুরাইশী এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আত্মীয়। উম্মুল মুমিনীন খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খালাত ভাই। তাঁর পিতা কায়েস ইবনে যায়েদ ও মা 'আতিকাহ বিনতে আবদুল্লাহ। 'আতিকাহ বিনতে আবদুল্লাহকে জন্মান্ধ সন্তানের মা হওয়ার কারণে উম্মে মাকতূম বলে সম্বোধন করা হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কাতেই ইসলামের আলোতে উদ্ভাসিত হন। আল্লাহ্ তাঁর অন্তরকে ইসলামের জন্য প্রশস্ত করেছেন। ইসলাম গ্রহণকারী প্রথম যুগের ব্যক্তিবর্গের অন্যতম ছিলেন তিনি। মক্কার অন্যান্য মুসলমানদের মতো যুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনের স্টীম রোলারের নিষ্পেষণে অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল, ধৈর্য ও নিষ্ঠার পরিচয় দেন তিনি।

সীমাহীন বিপদ-মুসিবতে তার পদস্খলনের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা ছিল না কিংবা দীপ্ত ঈমানী চেতনা ও মনোবলে ছিল না কোনো ভাঁটা। এসব নির্যাতন-নিপীড়ন তাকে আল্লাহর দীনকে মযবুত করে আঁকড়ে ধরার, আল কুরআনের সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করার, পরিপূর্ণভাবে শরীআতের জ্ঞান অর্জন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সার্বক্ষণিক সম্পর্ক গড়ার পথেই সহায়তা করে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ছিল, যার কারণে আল কুরআন হিফয করার ও যে কোনো প্রয়োজন বা ঘটনায় তাঁর দ্রুত উপস্থিতি সুনিশ্চিত করত। এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর মনের উদ্বেগের ভিত্তিতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হওয়াটা অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমের চেয়ে সৌভাগ্যের কারণ হতো।

এক সময়ের ঘটনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদের সদা সর্বদা ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতেন, তারা ইসলাম গ্রহণ করুক এ ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। এ উদ্দেশ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন কুরাইশ নেতৃবর্গ অর্থাৎ উতবা ইবনে রাবী'য়া, তাঁর ভাই শাইবা ইবনে রাবী'আ, আমর ইবনে হিশাম বা আবূ জাহল, উমাইয়া ইবনে খালফ এবং খালেদ সাইফুল্লার পিতা ওয়ালীদ বিন মুগীরার সাথে বসলেন এবং তাঁদের সামনে ইসলাম পেশ করে তাদেরকে বোঝাতে থাকলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশা করছিলেন যে, তারা ইসলাম গ্রহণ করবে, কিংবা অন্তত সাহাবী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুদের ওপর অব্যাহত নির্যাতন বন্ধ করবে।

এমতাবস্থায় আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে এসে তাঁকে আল কুরআন থেকে পাঠ

করে শোনাতে আরয করেন। তিনি বলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহ আপনার ওপর যেসব আয়াত অবতীর্ণ করেছেন, তা আমাকে শিক্ষা দিন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে কর্ণপাত না করে কুরাইশ নেতাদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখেন ও তাঁর কথায় বিরক্তির ভাব প্রকাশ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছিলেন, যদি এসব নেতা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদের ইসলাম গ্রহণ ইসলামের জন্য গৌরবজনক হবে এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাওয়াতী কাজের সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশ নেতাদের সাথে তাঁর আলোচনা শেষ করে বাড়ি ফিরতে মনস্থ করলে হঠাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনুভব করলেন যে, কোনো কিছু তাঁকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে ফেলছে। অতঃপর আল্লাহ তাঁর প্রতি নাযিল করলেন :

عَبَسَ وَتَوَلّٰى - اَنْ جَآءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَآءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى - كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ - فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ - فِىْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ - مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ م - بِاَيْدِىْ سَفَرَةٍ - كِرَامٍ م بَرَرَةٍ -

'ভ্রূকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল। এ কারণে যে, অন্ধ লোকটি তাঁর কাছে এল। তুমি কেমন করে জানবে সে হয়তো পরিশুদ্ধ হয়ে যেত। অথবা উপদেশ গ্রহণ করত। ফলে উপদেশ তার জন্য উপকারী হতো। অথচ যে বেপরোয়া ভাব দেখায়, তুমি তার দিকে মনোযোগ দিচ্ছ! অথচ সে না শোধরালে তোমার তার ব্যাপারে কোনো দায়িত্ব নেই। পক্ষান্তরে তোমার কাছে ছুটে এল ভীত-সন্ত্রস্ত চিত্তে। তার প্রতি তুমি অমনোযোগী হলে। কক্ষনো নয়, তা একটি উপদেশ বাণী। যার ইচ্ছা সে গ্রহণ করবে। এটা এমনসব সহীফায় লিপিবদ্ধ আছে, যা সম্মানিত। যা উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, পবিত্র। এ সম্মানিত পূত পবিত্র চরিত্র লেখকদের হাতে লিখিত।'

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে ১৬টি আয়াত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে অবতীর্ণ করলেন, যা অবতীর্ণ হওয়ার সময় থেকে অদ্যাবধি তিলাওয়াত করা হচ্ছে এবং দুনিয়া যতদিন থাকবে ততদিনই তিলাওয়াত হতে থাকবে। এরপর থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যখনই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসতেন, তখনই তিনি তাকে সম্মান করতেন। কোনো বৈঠকে উপস্থিত হলে তাঁকে কাছে বসাতেন, খবরাখবর নিতেন এবং প্রয়োজন পুরো করতেন। যার কারণে সপ্ত আসমানের ওপর থেকে চরমভাবে তিরস্কার করা হয়েছিল তা কি বিস্ময়কর নয়?

যখন কুরাইশরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর ঈমানদার সঙ্গী-সাথীদের ওপর সীমাহীন নির্যাতন চালাল, তখন আল্লাহ মুসলমানদেরকে হিজরতের অনুমতি দান করলেন, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দীনের হেফাযতে জন্মভূমি ত্যাগে ছিলেন প্রথম কাফেলার অন্তর্ভুক্তদের অন্যতম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে তিনি ও মুস'আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হলেন সর্বপ্রথম মদীনায় হিজরতকারী সাহাবী।

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইয়াসরিবে পৌঁছার পর পালাক্রমে তিনি ও তাঁর হিজরতের সাথী মুস'আব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জনগণের কাছে গিয়ে কুরআন পাঠ করে শোনাতেন এবং আল্লাহর দীন সম্পর্কে শিক্ষাদান করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করার পর বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মুসলমানদের মুয়াযযিন নিযুক্ত করেন। তাঁরা প্রতিদিন পাঁচবার করে সুউচ্চ কণ্ঠে তাওহীদের ঘোষণা শোনাতেন এবং সবাইকে কল্যাণ ও সাফল্যের দিকে আহ্বান করতেন।

বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিলে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইকামত দিতেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযান দিলে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইকামত দিতেন।

রমযান মাসে বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ব্যাপার সম্পূর্ণই ভিন্ন হয়ে যেত। মদীনাতে মুসলমানরা বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আযান শুনে সাহরী খেতেন ও আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আযান শুনে রোযার নিয়ত করতেন। বেলাল রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশ রাত থাকতে আযান দিয়ে লোকদের জাগাতেন, কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আযানের জন্য ফজর পর্যন্ত অপেক্ষা করতেন, এতে তিনি ভুল করতেন না।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে অসম্ভব সম্মান করতেন। নিজের অনুপস্থিতিতে দশ বারের অধিক আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মদীনায় তাঁর খলীফা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। এবং এর মধ্যে অন্যতম ছিল মক্কা বিজয়ের জন্য যাত্রার সময়।

বদর যুদ্ধের পর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মুজাহিদদের সুউচ্চ মর্যাদার কথা উল্লেখ করে কতিপয় আয়াত নাযিল করেন। ঐ সব আয়াতে জিহাদে অংশ গ্রহণে অক্ষমদের তুলনায় জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের মর্যাদা বর্ণনা করে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। বিশেষ করে যারা ইচ্ছা বা আলস্য করে জিহাদে অংশ নেয়নি তাদের ওপর জিহাদে অংশ গ্রহণকারীদের প্রাধান্য দেওয়া হয়। এ আয়াত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মনে দাগ কাটে এবং তিনি যে বিরাট একটি মর্যাদার কাজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, এ কথা ভেবে তাঁর ভীষণ কষ্ট হয়। তাই তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করেন।

> 'হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমার পক্ষে জিহাদে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হতো, তাহলে অবশ্যই অংশগ্রহণ করতাম।'

তারপর অত্যন্ত বিনীত হৃদয়ে তাঁর ও তাঁর মতো লোকদের সম্পর্কে কুরআনে বিধান নাযিলের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে থাকেন এই বলে :

> 'হে আল্লাহ! আমার অক্ষমতা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে বিধান নাযিল করো, হে আল্লাহ! আমার অক্ষমতা গ্রহণ করে সে সম্পর্কে বিধান নাযিল করো।'

মহান আল্লাহ কত ত্বরিৎগতিতে তার এই দু'আ কবুল করেছেন, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওহী লেখক যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেছেন :

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে বসেছিলাম। হঠাৎ তিনি নীরব-নিথর হয়ে পড়লেন। এ সময় আমার উরুর ওপর তার উরুর চাপ পড়ে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উরুর চেয়ে অধিক ভারী কিছু দেখিনি।'

অতঃপর এ অবস্থা কেটে গেলে তিনি আমাকে বললেন :

'হে যায়েদ লিখ!'

আমি লিখলাম :

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ

যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে এবং যারা জিহাদ না করে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান হতে পারে না, তখন আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দাঁড়িয়ে বললেন :

'হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাকাস সালাম! যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম তাদের ব্যাপারটা কেমন হবে?'

তার কথা শেষ হতে না হতেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর আবার নীরবতা ছেয়ে গেল। এবারও তাঁর উরু আমার উরুর ওপর এসে পড়ল। এবারও আমি তেমনি ওজন অনুভব করলাম যেমন প্রথমবার করেছিলাম।

এ অবস্থা দূর হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'যায়েদ কী লিখেছো পড়ে শোনাও।'

আমি পাঠ করে শোনালাম :

لَايَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ .

'মু'মিনদের মধ্যে যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি, তারা পরস্পরে সমান হতে পারে না।'

অতঃপর তিনি বললেন, এখানে লেখ :

غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ.

'যাদের কোনো অসুবিধা রয়েছে, সে সব মুমিনগণ ছাড়া।'

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাদেরকে ব্যতিক্রমী হিসেবে বাদ দিয়ে আয়াত নাযিল হলো। এভাবে মহান আল্লাহ আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর মতো আর যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করতে অক্ষম তাদেরকে জিহাদ থেকে অব্যাহতি দিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জিহাদে অংশগ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাঁকে জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে পারেনি।

তিনি আল্লাহর পথে জিহাদে অংশগ্রহণের দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। কেননা, মহৎ কর্ম ছাড়া মহৎ ব্যক্তিদের হৃদয়মন তৃপ্ত হতে পারে না। সেদিন থেকে তিনি এ মর্মে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, কোনো যুদ্ধেই অংশগ্রহণ থেকে তাকে বিরত থাকতে না হয়, যুদ্ধের ময়দানে তিনি কী কাজ করতে চান তাও পূর্বে থেকেই নির্ধারিত করে নিলেন। তিনি বললেন :

> 'আমাকে মুসলিম বাহিনী ও শত্রুবাহিনীর মাঝে দাঁড় করিয়ে ঝাণ্ডা বহনের দায়িত্ব দাও। আমি তা বহন করব এবং হেফাযত করব। আমি তো অন্ধ, আমি যুদ্ধের ময়দান থেকে পালাতে পারব না।'

১৪ হিজরীতে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্য সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি সিদ্ধান্তকর যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত এবং মুসলিম বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথ উম্মুক্ত করে দিতে চাইলেন। তাই তিনি গভর্নরদের নির্দেশ দিয়ে লিখলেন :

> 'যেসব লোকের অস্ত্র, ঘোড়া এবং বীরত্ব বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা আছে, তাদের কাউকেই আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিতে বাদ রেখ না। অতি দ্রুত এ কাজ করবে।'

এ আহ্বানের প্রেক্ষিতে মুসলিম জাহানের সর্বত্র থেকে দলে দলে মুসলমানরা মদীনায় এসে সমবেত হতে লাগলেন। এই মুজাহিদ বাহিনীতে আবদুল্লাহ ইবনে

উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুও যোগ দিলেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ বিরাট বাহিনীর প্রধান সেনাপতি হিসেবে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নিযুক্ত করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও হেদায়াত দান করে বিদায় জানান। এ বাহিনী কাদেসিয়ায় পৌঁছলে দেখা গেল, আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে লৌহবর্ম পরিধান করে মুসলিম বাহিনীর পতাকা বহন ও তা হেফাযতের জন্য কিংবা শাহাদাত বরণের জন্য নিজেকে সজ্জিত করে ময়দানে হাজির হয়েছেন।

উভয়পক্ষ তিন দিন ধরে প্রচণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে কাদেসিয়া প্রান্তরকে উত্তপ্ত করে রাখে। উভয়পক্ষ এমনভাবে যুদ্ধ করে, যার কোনো নজির যুদ্ধের ইতিহাসে নেই। তৃতীয় দিনে এই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। বৃহৎ একটি সাম্রাজ্য ধ্বসে পড়ে এবং অতি মূল্যবান একটি সিংহাসনের পতন ঘটে। এভাবে মূর্তির দেশে ইসলামের পতাকা উড্ডীয়মান হয়। এ বিজয় অর্জিত হয়েছিল শত শত শহীদের জীবনের মূল্যে। আর এসব শহীদদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিনিময় ছিল অন্যতম।

তিনি রক্তমাখা দেহে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিলেন; কিন্তু তখনো তার হাতে জাপটে ধরা ছিল মুসলিম বাহিনীর পতাকা।

---

আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ জীবনী নং - ৫৭৬৪।
২. আত্ তাবাকাতুল কুবরা - ৪র্থ খণ্ড, ২০৫ পৃ.।
৩. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খন্ড, ২৩৭ পৃ.।
৪. যাইলুল মযীল-৩৬-৪৭ পৃ.।
৫. হাযাতুস সাহাবা : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।


বি:দ্র: ইবনে উম্মে মাকতূম বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। মদীনাবাসীরা তাঁকে শুধু আবদুল্লাহ নামেই ডাকতো। ইরাকবাসীরা তাঁকে ওমর নামে ডাকতেন। এবং তাঁর পিতার নাম সর্বসম্মতভাবে কায়েস বিন যায়েদ ছিল।

# মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদূসী (রা)

*'মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইতিহাস বিখ্যাত সেই যোদ্ধা, যিনি দেড় বছর স্থায়ী শুধুমাত্র মল্লযুদ্ধেই শতাধিক মুশরিক যোদ্ধাকে হত্যা করেছিলেন। কাজেই যুদ্ধের ময়দানে তাঁর দ্বারা অগণিত শত্রু সৈন্যের নিহত হওয়াতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'*

*–ঐতিহাসিকদের উক্তি*

আল্লাহর রাহে নিবেদিত মুসলিম বীর যোদ্ধাদের অপূর্ব ত্যাগ ও কুরবানীর বিনিময়ে আল্লাহ্ কাদেসিয়ার যুদ্ধে মুসলমানদের অকল্পনীয় বিজয় দান করেন। এ বিজয়ের আনন্দে মুসলিম বাহিনী যেমন হয় আনন্দিত, যুদ্ধেও হয়েছিল তেমনি রণক্লান্ত। অনেক যোদ্ধার দেহে তখনো যখম দগদগ করছিল। চিকিৎসার অপেক্ষায় ছিলেন তাঁরা। শাহাদাতপ্রাপ্ত সাথীদের কথা স্মরণ করে তাঁদেরও বড়ই লোভ শাহাদাতের গৌরব লাভ করার। কাদেসিয়ার যুদ্ধের মতোই ভয়াবহ আরেকটি যুদ্ধের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকেন তাঁরা।

পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের চির পতন ঘটানোর জন্য আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পক্ষ থেকে কখন নির্দেশ আসে, সে অপেক্ষায়ও আছেন তাঁরা। ধৈর্যের বাঁধ যেন আর আটকিয়ে রাখা যাচ্ছে না, শুধু আমীরুল মুমিনীনের একটা নির্দেশের প্রয়োজন। শাহাদাতের জন্য অপেক্ষমাণ

জিহাদের জন্য শাণিত তরবারি সজ্জিত বীর যোদ্ধাদের আর বেশী দিন অপেক্ষা করতে হলো না। অপেক্ষার প্রহর কাটল। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশেষ দূত কুফায় এসে উপস্থিত হলেন। হাতে তাঁর কুফার শাসক আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উদ্দেশ্যে প্রেরিত খালীফাতুল মুসলিমীনের ফরমান।

নির্দেশ হলো, 'সত্বর যেন তিনি তাঁর বাহিনী নিয়ে বসরা থেকে আগত মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে পারস্য সেনাপতি হুরমুযানকে সমুচিত শিক্ষা দিতে 'আহওয়াজ' প্রদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন এবং পারস্য সম্রাটের মুকুট ও সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড নামে খ্যাত 'তুস্তার' শহর দখল করেন।'

এ নির্দেশনামায় বিশেষভাবে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, বনূ বকর গোত্রের অবিসংবাদিত নেতা, খ্যাতনামা অশ্বারোহী, বীর যোদ্ধা 'মাজযাআত ইবনে সাওর আস্ সাদূসীকে'ও যেন এ অভিযানে সাথে নেওয়া হয়। আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ফরমান অনুযায়ী পারস্য সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন। সাথে সাথে যুদ্ধের দামামা বেজে উঠল। মুসলিম বাহিনী দ্রুত সমরসজ্জায় সজ্জিত হলেন। সেনাবাহিনীকে পুনর্বিন্যস্ত করা হলো। আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদূসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সহকারী কমান্ড হিসেবে তৎকালীন যুদ্ধ-কৌশল অনুযায়ী তাঁর বাম পার্শ্বের বাহিনী প্রধান নিযুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি ও মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদূসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বীর মুজাহিদদেরকে সাথে নিয়ে বসরা থেকে আগত বাহিনীর সাথে মিলিত হয়ে তুস্তার শহরের দিকে রওয়ানা হলেন।

মুসলিম বাহিনী একের পর এক পারস্যের শহর, বন্দর ও নগর বিজয় করতে করতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। পারস্য সম্রাটের সেনাপতি ও তার বাহিনী মুসলিম বাহিনীর আক্রমণের মুখে টিকতে না পেরে এক দুর্গ থেকে অন্য দুর্গে পলায়নের পথ ধরে পিছু হটতে থাকে। পরিশেষে তারা প্রতিরক্ষার জন্য দুর্ভেদ্য নগরী তুস্তারে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তুস্তার ছিল শিক্ষা-সংস্কৃতি, কৃষ্টি-সভ্যতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আবহাওয়া এবং আধুনিকতায় পারস্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরী। নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দানে সে এক সীসাঢালা প্রাচীরবেষ্টিত শহর এবং পারস্য সম্রাটের জন্য এক নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

ভূমি থেকে উঁচুতে অবস্থিত সুদৃশ্য অশ্বাকার সাদৃশ্যের প্রাচীনতম শহর তুস্তারকে খরস্রোত দুজাইল নদী তার সুপেয় পানি দিয়ে সর্বদা সতেজ রেখেছিল। শহরটির সর্বোচ্চ স্থানে প্রাচীন যুগে 'সম্রাট শাহপুর' সিংহসদৃশ এমন একটি ফোয়ারা তৈরি করেন, যেন শহরের তলদেশে সুড়ঙ্গপথে প্রবাহিত দুজাইল নদীর স্রোতধারা সেই ফোয়ারা দিয়ে প্রবাহিত হয়।

তুস্তার নগরীর তলদেশে তৈরি এ সুড়ঙ্গ ঝর্নাপথ, অশ্বাকার সদৃশ শহরটি এবং সিংহসদৃশ ফোয়ারা যেমন ছিল নয়নাভিরাম, তেমনি অনন্য কারুকার্যমণ্ডিত। বৃহদাকার শিলাখণ্ডকে কেটে কেটে তা প্রস্তুত করা হয়েছিল। লৌহ এবং অন্যান্য ধাতব মিশ্রিত মযবুত পিলার দ্বারা স্থিতিশীল করে সুড়ঙ্গ পথকে সীসা দ্বারা প্লাস্টার মুজাইক করে দেওয়া হয়েছিল। সে শহরের চতুষ্পার্শ্বে উঁচু প্রাচীরের বেষ্টনি দ্বারা দুর্ভেদ্যভাবে ঘেরাও করে রাখা হয়েছিল। ঐতিহাসিকদের মতে :

> 'পৃথিবীর সর্বপ্রথম ও সর্ববৃহৎ প্রাচীর এটি। এ প্রাচীরের চারপাশে পারস্য সেনাপতি হরমুযান এমন বিরাট খন্দক খনন করে রেখেছিল, যা অতিক্রম করা ছিল যে কোনো আক্রমণকারী বাহিনীর জন্য দুঃসাধ্য ব্যাপার।'

বিভিন্ন এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে পারস্য সেনাপতি হরমুযান এর ভিতরে আশ্রয় নেয় এবং খন্দককে রক্ষার জন্য পারস্যের সেরা চৌকস সৈন্যদের পাহারায় নিয়োজিত করে।

সুদক্ষ মুসলিম বাহিনী এর চারপাশে অবস্থান নিয়ে দীর্ঘ ১৮ মাস এ খন্দককে অবরোধ করে রাখেন। এ অবরোধে পারস্য সৈন্যদের বিরুদ্ধে পরপর ৮০টি যুদ্ধ হয়; কিন্তু সফলতা আসেনি তাতে। যার প্রতিটিই মল্লযুদ্ধ থেকে শুরু করে রক্তাক্ত যুদ্ধে রূপান্তরিত হতে থাকে। মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এসব সংঘর্ষে এক কঠিন অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন, যা একই সাথে শত্রু-মিত্র উভয় বাহিনীকেই স্তম্ভিত করে দেয়।

এসব মল্লযুদ্ধে পারস্য সৈন্যদের বাছাইকৃত যুদ্ধবাজ বীর পাহলোয়ানদের শতাধিককে তিনি একাই হত্যা করে ইতিহাস রচনা করেন। যে কারণে পারস্য সৈন্য বাহিনীর প্রতিটি সৈনিকের মনে তাঁর সম্পর্কে ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। অপরদিকে মুসলিম বাহিনীর মনোবলও বৃদ্ধি পায়। ফলে মুসলিম বাহিনী আরও অধিক ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে।

ইতঃপূর্বে যারা মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে চিনতেন না তারাও বীরত্বের কারণে তাঁকে চিনে ফেলেন এবং সবাই এটা ভালো করে বুঝতে সক্ষম হন যে, কেন আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ যুদ্ধে উপস্থিতির জন্য বিশেষভাবে মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর এতো গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

৮০টি খণ্ডযুদ্ধের সর্বশেষ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী শত্রুবাহিনীর ওপর মারাত্মক এক ঝটিকা আক্রমণ করে বসে। যে আক্রমণের মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা খন্দকের ওপর তৈরি সেতু ছেড়ে পিছু হটতে বাধ্য হয়। তারা শহরের ভিতর প্রবেশ করে দুর্গের ফটক বন্ধ করে দেয়। এবার মুসলিম বাহিনী অধিকতর কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। এতদিনের বিজয় নৈপুণ্য ও ত্যাগ যেন ব্যর্থ হওয়ার উপক্রম। পূর্বের চেয়ে এবার তারা আরো অধিক দুর্ভোগের সম্মুখীন হলেন।

শত্রুবাহিনী কেল্লার ওপর থেকে মুসলিম বাহিনীর ওপর অব্যাহতভাবে তীর নিক্ষেপ ও এমনসব লোহার শিকল নিক্ষেপ করতে থাকে যেসব শিকলের মাথায় সংযুক্ত ছিল বঁড়শির মতো কুঁকড়ানো আংটা, যা আগুনে জ্বালিয়ে লাল করে নেওয়া হতো। মুসলিম বাহিনীর প্রাচীর অতিক্রমকারী কোনো সৈনিকের শরীরে তা বিঁধে গেলেই তাঁকে সজোরে ওপরে টেনে তোলা হতো। যাদের টেনে তুলতে পারত না তারা আংটায় বিদ্ধ হয়ে পুড়ে যেতেন এবং শরীরের গোশত গলে নিচে পড়ে শহীদ হয়ে যেতেন।

মুসলিম বাহিনী সীমাহীন এই দুর্ভোগের এক পর্যায়ে আল্লাহর কাছে এ কঠিন অগ্নিপরীক্ষা থেকে নাজাত এবং শত্রুদের ওপর বিজয় লাভের জন্য একাগ্রচিত্তে দু'আ করতে লাগলেন। এদিকে বারবার প্রাচীর ভেদে ব্যর্থ হয়ে মুসলিম সেনাপতি আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তুস্তার নগরীর

ঐতিহাসিক প্রাচীর কী করে ভেদ করা যায় সে বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন। কিন্তু কোনো কূল-কিনারা না পেয়ে তিনি বারবার ব্যর্থতার শিকার হতে থাকলেন। এমতাবস্থায় প্রাচীরের ওপর থেকে হঠাৎ একটি তীর তাঁর সামনে এসে পড়ল। তীরটির দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পেলেন যে, তার সাথে একটি পত্র সংযুক্ত। তাতে লেখা রয়েছে :

> 'মুসলিমগণ! আপনাদের প্রতি আমি দৃঢ় আস্থা পোষণ করছি। আমি ও আমার পরিবারসহ বাকি সঙ্গী-সাথীদের জান ও মালের নিরাপত্তা আরয করছি। যার বিনিময়ে আপনাদেরকে 'তুস্‌তার নগরীর' গোপন প্রবেশ পথ দেখিয়ে দিতে চাই।'

আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাথে সাথে পত্র-প্রেরক তীরন্দাযকে লক্ষ্য করে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দিয়ে উত্তর সম্বলিত জবাবী তীর নিক্ষেপ করলেন।

পারস্যবাসীরা মুসলমানদের সত্যবাদিতা, প্রতিশ্রুতির প্রতি শ্রদ্ধা এবং ওয়াদা ভঙ্গ না করা সম্পর্কে পূর্ব থেকেই ওয়াকিবহাল ছিল। এ জন্য সে আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জবাবে মোটেই সন্দেহ পোষণ করল না। রাতের অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়ে সে মুসলিম বাহিনীর প্রহরীদের কাছে উপস্থিত হলো এবং সেনাপতি আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে দেখা করে নিম্নোক্ত বক্তব্য তুলে ধরল :

> 'আমরা আমাদের সম্প্রদায়ের সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবর্গ। হরমুযান আমার বড় ভাইকে হত্যা করেছে। তার পরিবার-পরিজনের ওপর চরম নির্যাতন চালিয়েছে এবং আমার ব্যাপারেও তার অন্তরে বিদ্বেষের আগুন জ্বলছে। এমনকি তার হাতে আমার ও আমার সন্তানদের জীবনের কোনো নিরাপত্তা নেই। সে জন্য তার নির্যাতন ও যুলুমের ওপর আপনার ন্যায়নীতি ও ইনসাফকে প্রাধান্য দিচ্ছি। যেমন প্রাধান্য দিচ্ছি তার বিশ্বাসঘাতকতার ওপর আপনার প্রতিশ্রুতিকে। সে কারণেই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, আমি তুস্‌তার নগরীতে প্রবেশের গোপন পথ আপনাদের দেখিয়ে দেব, যে পথ দিয়ে আপনারা ভিতরে প্রবেশ করতে পারবেন। অতএব আপনি খুবই

বিচক্ষণ, সাহসী এবং সাঁতারে পটু এমন এক ব্যক্তিকে সঙ্গে দিন, যাকে আমি সেই গোপন পথটি দেখিয়ে দিতে পারি।'

একথা শুনে আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদূসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি বিস্তারিত বর্ণনা করলেন :

'এখন তোমার গোত্র থেকে চতুর, সাহসী এবং সাঁতারে পটু এমন একজনকে বেছে দাও।'

মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'হে আমীরুল মুজাহিদীন! অন্য কাউকে না খুঁজে আপনি আমাকেই এ কাজে নিযুক্ত করতে পারেন।'

আবূ মূসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন :

'তুমি যদি স্বেচ্ছায় যেতে চাও, তাহলে আল্লাহর ফযলে খুবই ভালো হয়।'

অতঃপর তিনি মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে পরামর্শ দিলেন :

'রাস্তা ভালো করে চিনে নিতে হবে। প্রবেশদ্বার ও হরমুযানের অবস্থান সম্পর্কেও নিশ্চিত হতে হবে। তার জনশক্তি সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং এ সংবাদ কাউকে বলা যাবে না।'

অতঃপর রাতের অন্ধকারে মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ইরানী পথ-প্রদর্শকের সাথে রওয়ানা হলেন। তুস্‌তার নগরী ও দুজাইল নদীর মাঝখানে বিদ্যমান খন্দক দিয়ে তারা প্রবেশ করলেন একটি সুড়ঙ্গে। খরস্রোত এ সুড়ঙ্গপথের অবস্থা ছিল বড়ই বন্ধুর ও বিপজ্জনক। হেঁটে যেতে যেতে হঠাৎ পথ এমন গভীর হতো যে, ভূগর্ভস্থ পানির ওপর দিয়ে সাঁতরিয়ে চলতে হতো। আবার হঠাৎ এমন সরু হয়ে আসতো যে, হামাগুড়ি দিয়ে এগুতে হতো। কখনো পথটি প্রশস্ত নদীতে পরিণত হতো। কখনো তা আঁকাবাঁকা হয়ে যেত, আবার দেখতে না দেখতেই পুনরায় সোজাসুজি রূপ নিত। এভাবে চলতে চলতে পরিশেষে তারা তুস্‌তার নগরীর প্রবেশদ্বারের কাছে উপনীত হলেন।

এ গোপন অভিযানে মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পথ প্রদর্শনকারীর বড় ভাইয়ের হত্যাকারী পারস্য সেনাপতি হরমুযান এবং তার অবস্থানস্থল ভালো করে দেখে নিলেন। প্রথম বার হরমুযানকে দেখা মাত্রই মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বিষাক্ত তীরবিদ্ধ করে হত্যার মনস্থ করলেন; কিন্তু সে মুহূর্তে তাঁর সেনাপতি আবূ মূসা আল আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পরামর্শের কথা স্মরণ হলো। তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন :

'একথা যেন প্রকাশ না পায় এবং অভিযান যাতে গোড়াতেই বিফল না হয়।'

তাই তিনি অতিকষ্টে নিজেকে সংবরণ করে নিলেন এবং সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহের পর সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহূর্তে সেই বিপজ্জনক সুড়ঙ্গপথে যথাস্থানে ফিরে এলেন।

আবূ মূসা আল্ আশ'আরী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মুসলিম বাহিনী থেকে বেছে বেছে সাহসী, বীর, বিপদ-মুসীবতে ধৈর্যশীল ও সাঁতারে পারদর্শী ৩০০ যোদ্ধাকে এ সুড়ঙ্গপথে অভিযান চালানোর জন্য মনোনীত করলেন এবং মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে এই কমান্ডো বাহিনীর 'আমীরুল জিহাদ' নিযুক্ত করলেন। তিনি নিজে তাঁদের সাথে কিছুদূর অগ্রসর হলেন ও গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশাবলি দেওয়ার পর বিদায় দিলেন এবং 'আল্লাহু আকবার'কে শত্রুবাহিনীর ওপর আক্রমণের 'পাসওয়ার্ড' বা গোপন সংকেতশব্দ নির্ধারণ করে দিলেন।

মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীর সদস্যদের নিজ কাপড়-চোপড় আঁটসাঁট করে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন যেন সুড়ঙ্গপথের পানিতে সাঁতরাতে তাঁদের কোনো অসুবিধা না হয়। সৈন্যদের তরবারি ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র সঙ্গে নিতেও নিষেধ করে দিলেন এবং তরবারিকে দেহের সাথে এমনভাবে বেঁধে নিতে বললেন যেন সহজে খুলে না যায়। অতঃপর তিনি তাঁর বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে রাত গভীর হওয়ার পূর্বেই সুড়ঙ্গপথের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

এই ভয়াবহ সুড়ঙ্গপথে মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর দুঃসাহসী বীর কমান্ডো বাহিনীকে নিয়ে প্রায় দুই ঘণ্টা পথ চললেন। কখনো বা তারা এ দুর্গম পথের খরস্রোতকে উপেক্ষা করে বিজয়ী বেশে সামনে অগ্রসর হতেন। আবার কখনো বা নাকে-মুখে পানি ঢোকার কারণে তীব্র খরস্রোতের কাছে পরাভূত হতেন।

এভাবে পথ চলতে চলতে মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তুস্‌তার নগরীর প্রবেশদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে পৌঁছে দেখতে পেলেন যে, তাঁর ৩০০ জন সাথী যোদ্ধাদের ২২০ জনই এ সুড়ঙ্গপথে খরস্রোতের শিকার হয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন এবং তাঁর সাথে জীবিত রয়েছেন মাত্র ৮০ জন। তিমিরাচ্ছন্ন ভয়াবহ এ সুড়ঙ্গপথে যে ৮০ জন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত সাথী জীবিত ছিলেন, তাঁদের নিয়েই তিনি তুস্‌তার নগরীর ভিতরে প্রবেশ করার সাথে সাথে তরবারি উন্মুক্ত করে মুহূর্তের মধ্যেই অসতর্ক প্রহরীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তাদের তীক্ষ্ণধার তরবারির আঘাত বিদ্যুৎবেগে প্রহরীদের দ্বিখণ্ডিত করে চলল। মুহূর্তের মধ্যেই প্রহরীদের নিরাপত্তা ব্যূহ ভেদ করে তারা তুস্‌তার নরগীতে প্রবেশের সবক'টি ফটক খুলে দিতে সক্ষম হলেন। মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাহিনী ভিতর থেকে এবং মুসলিম বাহিনী দুর্গের বাইর থেকে এক সঙ্গে 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে তুস্‌তার নরগীকে কাঁপিয়ে তুললেন।

ফজরের পূর্ব মুহূর্তে মুসলিম বাহিনী বাঁধভাঙা স্রোতের ন্যায় তুস্‌তার নগরীতে প্রবেশ করল। প্রচণ্ড সংঘর্ষ বেধে গেল। সে কি ভয়াবহ সংঘর্ষ। যেমন ভীতিকর, তেমনি রক্তক্ষয়ী। ইতিহাস এমন সংঘর্ষ খুব কমই প্রত্যক্ষ করেছে।

এ ভয়াবহ যুদ্ধের এক চরম পর্যায়ে মাজযাআত ইবনে সাওর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃষ্টি পড়ল পারস্য সেনাপতি হুরমুযানের ওপর। তিনি দেখতে পেলেন যে, সে এক উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে সৈন্য পরিচালনা করছে। কালবিলম্ব না করে তিনি তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তরবারির আঘাত হানা মাত্রই উভয় বাহিনীর ভিড়ের এক ফাঁকে অল্পের জন্য হুরমুযান বেঁচে গিয়ে সহযোদ্ধাদের মধ্যে আত্মগোপন করে ফেলল। যুদ্ধের এক ফাঁকে সে আবার

মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দৃষ্টিতে পড়ে গেল। তাকে দেখামাত্রই মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবারও হরমুযানের ওপর আক্রমণ চালালেন। এবার মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও হুরমুযানের মধ্যে সরাসরি যুদ্ধ বেধে গেল। একে অপরকে বীরবিক্রমে আঘাতের পর আঘাত হেনে চললেন। তাদের পরস্পরের যেমন আক্রমণ-ভঙ্গি, তেমনি প্রতিহত-কৌশল। আঘাতের পর আঘাতের এক পর্যায়ে মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তরবারি পিছলে গেলে হরমুযানের তরবারি আঘাত করল বীর সেনাপতি মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে। যে আঘাতে তিনি ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন। শাহাদাতের এ মুহূর্তে তাঁরই নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর এ বিজয় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করতে করতে যুদ্ধের ময়দানেই তিনি চির বিদায় গ্রহণ করলেন।

বিজয়ের এই শুভ মুহূর্তে সেনাপতির শাহাদাত মুহূর্তের জন্যও মুসলিম বাহিনীকে দ্বিধাগ্রস্ত করল না। বীরবিক্রম এ আক্রমণকে তারা আরো বেগবান করে তুললেন। দেখতে না দেখতেই পারস্য সেনাপতি হরমুযান মুসলিম বাহিনীর হাতে বন্দী হলো ও মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহ চূড়ান্ত বিজয় দান করলেন।

অধীর আগ্রহে অপেক্ষমাণ খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বিজয়ের সুসংবাদ জানানোর জন্য দ্রুতগামী সংবাদ বাহককে মদীনা মুনাওয়ারা প্রেরণ করা হলো। চৌকস মুজাহিদ বাহিনীর মাধ্যমে বন্দী পারস্য সেনাপতিকে মদীনা মুনাওয়ারায় পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো। সামনে সামনে চলতে থাকল বন্দী পারস্য সেনাপতি হরমুযান। তার মাথায় ছিল হীরা-মণি-মুক্তাখচিত মুকুট ও তার কাঁধে শোভা পাচ্ছিল স্বর্ণের তৈরি ব্যাজ ও পদকসমূহ, যেন খালীফাতুল মুসলিমীন তা প্রত্যক্ষ করতে পারেন।

খালীফাতুল মুসলিমীনের দরবারে পারস্য বিজয় এবং হরমুযানকে বন্দী করার এ আনন্দ সংবাদের সাথে সাথে তারা মাজযাআত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মতো বীর অশ্বারোহী যোদ্ধার শাহাদাতের শোক-সংবাদও বহন করে নিয়ে যাচ্ছিলেন।

---

মাজযাআত ইবনে সাওর আস সাদূসী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. তারীখুল উমাম ওয়াল মুলূক : আত্‌তাবারী - ৪র্থ খণ্ড, ২১৬ পৃ.।

২. তারীখ খলীফা বিন খায়্যাত : ১ম খণ্ড, ১১৭ পৃ. ।
৩. তারীখুল ইসলাম লিয্‌যাহাবী : ২য় খণ্ড, ৩০ পৃ. ।
৪. মু'জামুল বুলদান লিল ইয়াকুত : মাদ্দা  তাস্‌তুর ।
৫. আল ইসাবাহ  : ৭৭৩ নং জীবনী  ।
৬   উস্‌দুল গাবা : ৪র্থ খণ্ড, ৩০ পৃ. ।

# উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা)

*'হে উসাইদ! ফেরেশতারা তোমার মধুর সুরে পবিত্র কুরআনের তিলাওয়াত শুনতে এসেছিল।'*

*-মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা)*

ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম দাঈ ইলাল্লাহর অন্যতম হলেন মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। প্রিয়নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের সংবাদ নিয়ে মক্কার এ যুবক ইয়াসরিবে (বর্তমান মদীনা মুনাওয়ারায়) উপস্থিত হন। তিনি খাযরাজ গোত্রের এক প্রভাবশালী নেতা আস'আদ ইবনে যুরারাহ'র অতিথি হিসেবে তাঁর বাড়িতে উঠেন। এ বাড়িকেই তাঁর অবস্থানস্থল এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত ও ইসলামী দাওয়াত প্রচারের কেন্দ্র হিসেবে বেছে নেন।

ইয়াসরিবের যুবকরা ইসলামের এই মহান মুবাল্লিগ মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাওয়াতী সমাবেশগুলোতে খুবই উৎসাহের সাথে যোগ দিতে থাকে। এদিকে এই নূরানী চেহারার মানুষটি তাঁর সুমধুর কণ্ঠে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় ইসলামের দাওয়াত দিতে থাকেন। সমাবেশের কলেবর দিনে দিনে বড় হতে থাকে। তাঁর চারিত্রিক গুণাবলির আকর্ষণ ছাড়াও যে শক্তিটি শ্রোতাদের সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করত, তা হলো সুমিষ্ট সুরে আল কুরআনের তিলাওয়াত। তিনি আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে সংশ্লিষ্ট কুরআনের আয়াতগুলো মধুর সুরে তিলাওয়াত করতেন। যা শুনে কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়ে যেত,

শ্রোতাদের অনুশোচনার অশ্রু ঝরত। তাঁর এমন কোনো সমাবেশ ছিল না, যে সমাবেশে দলবদ্ধভাবে লোকজন ইসলাম গ্রহণ করে ঈমানী কাফেলার এ সংগঠনে শরীক না হতো।

একদা আসআদ ইবনে যুরারাহ তাঁর মেহমান মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সাথে নিয়ে বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের জনশক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে রওয়ানা হলেন। বনূ আবদুল আশহাল গোত্রের একটি বাগানে সুপেয় পানির কূপের সন্নিকটে খেজুর গাছের ছায়ায় এসে তাঁরা বসে পড়লেন। যারা ইতঃপূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তারা এবং আগ্রহী অন্যান্যরাও ইসলামের মর্মবাণী শোনার জন্য একত্রিত হলেন। মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ আলোচনায় আল্লাহর ডাকে সাড়া দানকারীদের পুরস্কারস্বরূপ জান্নাতের সুসংবাদ ছিল। তাঁর আলোচনা শোনার জন্য চারপাশ থেকে লোকজন এসে ভিড় জমাল এবং তাঁর জ্ঞানগর্ভ ও মূল্যবান আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগল।

এমন সময় এক ব্যক্তি গিয়ে আওস গোত্রের প্রখ্যাত দুই সরদার উসাইদ ইবনে হুদাইর এবং সা'দ ইবনে মুআযকে সংবাদ দিল যে :

> 'আসআদ ইবনে যুরারাহ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় মক্কা থেকে আগত ইসলামের এক প্রচারক আপনাদের বাড়ির কাছেই এসে সমাবেশ করছে।'

এ সংবাদ শুনেই উসাইদ ইবনে হুদাইর ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল।

সা'দ ইবনে মুআয তাঁকে আরো উৎসাহিত করে বলল :

> 'চলো, মক্কা থেকে আগত সেই যুবকের কাছে, যে আমাদের বাড়ির সীমানায় বসে গরীব-নিঃস্বদের ওপর প্রভাব বিস্তার করছে ও তাদের ইসলাম গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করছে। আমাদের দেব-দেবীকে মন্দ বলছে ও ভর্ৎসনা করছে। তাকে এ কাজ থেকে বিরত কর, তাকে সতর্ক করে দাও। এরপর থেকে যেন সে আর কখনো আমাদের বাড়ির ধারে-কাছেও না আসে।'

সে তার প্রতিবাদী কণ্ঠকে কোনো বিরতি না দিয়ে আরো বলল :

> 'যদি সে আমার খালাত ভাই উসাইদ ইবনে যুরারাহর অতিথি না হতো ও তার ছত্রছায়ায় না চলত, তাহলে তাকে প্রতিহত করার জন্য আমিই যথেষ্ট ছিলাম।'

আর সময় ক্ষেপণ না করে উসাইদ তার বর্শাখানা হাতে নিয়ে বাগানের সেই সমাবেশের দিকে রওয়ানা হলো।

আসআদ ইবনে যুরারাহ তাকে সভার দিকে অগ্রসর হতে দেখেই মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে লক্ষ্য করে বললেন :

'হে মুসআব! আপনার কল্যাণ হোক এবং আপনি সফল হোন। আগন্তুক তার গোত্রের সরদার। গোত্রের সবচাইতে বিচক্ষণ, জ্ঞানী, সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিই উসাইদ ইবনে হুদাইর! যদি সে ইসলাম গ্রহণ করে, তাহলে তার অনুসরণে অগণিত লোক ইসলাম গ্রহণ করবে। তাকে আল্লাহর প্রভুত্বের ব্যাপারে সঠিক ধারণা দিন এবং সুন্দরভাবে তার নিকট ইসলামের দাওয়াত উপস্থাপন করুন।'

উসাইদ ইবনে হুদাইর সভাস্থলে এসে দাঁড়াল এবং মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ও তাঁর সাথীর দিকে ক্রোধান্বিত হয়ে বলল :

'আমাদের বাড়ির সীমানায় তোমরা কী উদ্দেশ্যে এসেছো? কেনই বা গরীব ও নিঃস্ব সহজ-সরল লোকদের প্রতারিত করছ? যদি বাঁচতে চাও তোমরা দু'জন এখনই এ জনপদ ছেড়ে চলে যাও।'

জ্যোতির্মান চেহারা ও ঈমানী চেতনায় বলীয়ান, দৃঢ় মনোবলসম্পন্ন মিষ্টভাষী দাঈ মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আওস সরদার উসাইদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর স্বভাবসুলভ ভাবগম্ভীর ও স্পষ্ট ভাষায় বললেন :

'হে আওস গোত্রের নেতা! আমি কি আপনাকে এর চেয়েও উত্তম একটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারি ?'

আওস সর্দার উসাইদ বলল :

'সেটা আবার কী?'

মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'আমাদের এ সভায় একটু বসুন এবং আমরা যা বলছি তা একটু শুনুন। যা কিছু আলোচনা করছি, যদি মনে করেন যে, এসব কথা যুক্তিযুক্ত, তাহলে তা

আপনিও গ্রহণ করুন। আর যদি মনে করেন, এসব কথা যুক্তিসঙ্গত ও বিবেকসম্মত নয়, তাহলে আমরা অবশ্যই এখান থেকে চলে যাবো এবং আর কখনো এখানে আসব না।'

উসাইদ ইবনে হুদাইর বলল :

'হ্যাঁ, তুমি যথার্থই বলেছ।'

তারপর সে তার বর্শাখানা মাটিতে রেখে বসে পড়ল।

মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে উদ্দেশ্য করে তাওহীদের মর্মবাণী সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে লাগলেন এবং আলোচনার মাঝে মাঝে পবিত্র কুরআন মাজীদ থেকে কিছু কিছু আয়াত তিলাওয়াত করে শোনাতে থাকলেন।

আওস সরদার উসাইদ ইবনে হুদাইর মনোযোগ সহকারে তাঁর আলোচনা শুনতে লাগল। আলোচনার আকর্ষণে ভিতরে ভিতরে মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হাতে তার হাত রেখে বায়'আতের জন্য যেন প্রস্তুত হলো।

এক পর্যায়ে সে সজোরে বলে উঠল :

'আহ! তুমি যা বলছ, তা কী সুন্দর! আর যা তুমি তিলাওয়াত করছ! তা কতই না মধুর!'

এ বলেই পুনরায় প্রশ্ন করল :

'যদি কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে চায়, তাহলে সে কিভাবে ইসলামে প্রবেশ করবে?'

মুসআব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'গোসল করে নিতে হবে এবং পাক-পবিত্র কাপড়-চোপড় পরিধান করে ঘোষণা দিতে হবে :

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। অতঃপর দু'রাকআত নামায আদায় করতে হবে।'

অতঃপর আওস গোত্রের একচ্ছত্র এই নেতা নিকটস্থ কূপে গোসল করে পাকসাফ হয়ে কালেমা শাহাদাতের ঘোষণার মাধ্যমে ইসলাম গ্রহণ এবং শুকরিয়াস্বরূপ দু'রাকআত নামায আদায় করলেন। যেভাবে তিনি ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করেন আরবের বিস্ময় যে, তাঁর মতো একজন বীর সৈনিক কী করে ইসলামে দীক্ষিত হলো? তিনি ছিলেন আওস গোত্রের হাতেগোনা বিনয়ী, ভদ্র, বিচক্ষণ, চতুর, বিজ্ঞ ও খ্যাতনামা একমাত্র নেতা। তিনি অশ্বারোহী এবং তীরন্দাযীতেও ছিলেন অতুলনীয়। তাঁর গোত্রের লোকেরা তাঁকে 'কামেল' বা সর্বগুণে গুণান্বিত উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তৎকালীন সমাজে তিনি ছিলেন শিক্ষা-দীক্ষায় এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

তাঁর ইসলাম গ্রহণের সাথে সাথে সা'দ ইবনে মুআযও কালেমা শাহাদাতের ঘোষণা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। এ দুই নেতার একত্রে ইসলাম গ্রহণের ঘটনায় প্রভাবিত হয়ে আওস গোত্রের নারী-পুরুষ অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করলেন। তাঁদের এই প্রশংসনীয় ভূমিকার প্রভাবে ইয়াসরিবে ক্রমশ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকল এবং খুব শীঘ্রই তা ইসলামী রাষ্ট্রের রাজধানীতে পরিণত হলো।

মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াতে মুগ্ধ হয়ে তাঁর তিলাওয়াতের অনুকরণে নিষ্ঠার সাথে সর্বদা কুরআন তিলাওয়াতে তিনি নিমগ্ন থাকতেন। তাঁর প্রাণপ্রিয় বন্ধু মুসআব ইবনে উমাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াতকে তিনি এমনভাবেই গ্রহণ করেন, যেমনটি মরুপ্রান্তরের প্রচণ্ড গরমে তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি প্রাণরক্ষায় ব্যাকুল হয়ে শীতল সুপেয় পানির পাত্রের প্রতি আকৃষ্ট হয়। মনোযোগ সহকারে কুরআন তিলাওয়াতকেই তিনি জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করেন। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র একজন অগ্রগামী মুজাহিদের বেশে অথবা মধুর সুরে কুরআন তিলাওয়াত ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় তাঁকে খুব কমই দেখা যেত।

উসাইদ ইবনে হুদাইরের ছিল সুমধুর কণ্ঠ ও স্পষ্ট বাচনভঙ্গি এবং ভাব প্রকাশের বিরল যোগ্যতা। তাঁর কালামে পাকের তিলাওয়াত খুবই শ্রুতিমধুর ছিল। তাঁর তিলাওয়াত আরো মনোমুগ্ধকর রূপ নিত, যখন তিনি গভীর রাতের নিস্তব্ধ পরিবেশে তিলাওয়াত করতেন। গভীর রাতে তাঁর তিলাওয়াত শোনার জন্য

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম ঔৎসুক্য নিয়ে প্রতীক্ষায় থাকতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর যে মধুর সুরে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই অপূর্ব কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছিল তাঁকে। সেদিক দিয়ে তিনি কতই না সৌভাগ্যবান! উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তিলাওয়াত শুধু সাহাবীরাই উপভোগ করতেন না; বরং আকাশের ফেরেশতারাও তাঁর তিলাওয়াত উপভোগ করতেন।

কোনো এক গভীর রাতে উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাড়ির আঙিনায় বসেছিলেন। তাঁর পাশেই তাঁর ছেলে ইয়াহ্ইয়া ঘুমাচ্ছিল। নিকটেই জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ'র জন্য সর্বদা প্রস্তুত রাখা ঘোড়াটি বাঁধা ছিল ।

রাত ছিল নীরব-নিস্তব্ধ। পরিচ্ছন্ন আকাশের তারকারাজি ছিল পৃথিবীকে মৃদু আলোদানে রত। নিঝুম ও স্নিগ্ধ পরিবেশের এ চমৎকার দৃশ্যে তিলাওয়াতের জন্য উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। তিনি মধুর ও নরম সুরে তিলাওয়াত আরম্ভ করলেন :

الٓمّٓ ـ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ـ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ـ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ـ

(سورة البقرة : ١ ـ ٤)

এ পর্যন্ত তিলাওয়াত করতে না করতেই তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর ঘোড়াটি যেন কিসের আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে লাফালাফি করছে। বাঁধনের রশি ছিঁড়ে যাওয়ার আশঙ্কা হচ্ছিল। এ দেখে তিনি তিলাওয়াত বন্ধ করলেন। সাথে সাথে ঘোড়াটিও স্থির ও শান্ত হয়ে গেল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত শুরু করলেন :

اُولٰٓئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ـ (سورة البقرة : ٥)

তিলাওয়াত আরম্ভ করতে না করতেই এবার আরও দ্বিগুণ জোরে ঘোড়াটি লাফালাফি আরম্ভ করে দিল। তিনি পুনরায় তিলাওয়াত বন্ধ করলে ঘোড়াটিও শান্ত হয়ে গেল। এভাবে তিনি বারবার তিলাওয়াত করছিলেন এবং ঘোড়াটিও বারবারই লাফাচ্ছিল। আর তিনি থেমে গেলে ঘোড়াটিও থেমে যাচ্ছিল।

এ অবস্থায় ঘোড়াটি তাঁর ঘুমন্ত ছেলেকে পদপিষ্ট করতে পারে এ আশঙ্কায় কাছে গিয়ে তাকে জাগাতে চাইলেন। এ সময় হঠাৎ আকাশের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লে দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য!

> 'যা আকাশে ছায়াপথের মতো অনুপম আলোকচ্ছটা জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত অভাবনীয় সৌন্দর্য শোভা ছড়াচ্ছিল।'

তিনি তো পূর্বে কখনো এ অপরূপ শোভা প্রত্যক্ষ করেননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে :

> 'জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত অসংখ্য প্রদীপ প্রজ্বলিত হয়ে সুশোভিত করে তুলেছে। সমস্ত নভোমণ্ডল আলোকিত হয়ে পড়েছে। সে জ্যোতি ও শুভ্রতা নভোমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বেই উঠে চলেছে।'

ভোর হলে উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে রাতের ঘটনা বর্ণনা করলেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন :

> 'হে উসাইদ! তারা ছিল ফেরেশতা। তারা তোমার তিলাওয়াত শোনার জন্য অবতীর্ণ হয়েছিল। তুমি যদি তোমার তিলাওয়াত অব্যাহত রাখতে, তাহলে অন্য লোকজনও তা প্রত্যক্ষ করত এবং ফেরেশতারাও তাদের দৃষ্টির আড়ালে যেত না।' (স্মর্তব্য : এ ঘটনাটি বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে)

উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পবিত্র কুরআন শরীফের তিলাওয়াতে যেমন প্রগাঢ় ভালোবাসা গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথেও তাঁর ভালোবাসা ছিল অত্যন্ত গভীর। আল কুরআন তিলাওয়াত ও শোনার সময় তিনি বিশেষভাবে পূত পবিত্র হয়ে ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতেন। যখন তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে দৃষ্টি দিতেন, তখন দেখতে পেতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হয়তো বা বক্তৃতা করছেন অথবা দীন ইসলামের ব্যাখ্যা দান করছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে একত্রে উপবেশনকালে তিনি মনে মনে ভাবতেন, যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গা ঘেঁষে বসেন।

সে উদ্দেশ্যে তিনিও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হয়েই বসতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে কয়েক বার তিনি গা ঘেঁষে বসার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

কোনো একদিন উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর গোত্রের লোকজনের উদ্দেশ্যে আলোচনা পেশ করছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর পবিত্র আঙুল দ্বারা তাঁকে মৃদু গুঁতো দিয়ে আলোচনার প্রশংসা ও সমর্থন জানালেন। আলোচনা শেষে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন :

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ গুঁতোর মাধ্যমে আমাকে ব্যথা দিয়েছেন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে উত্তর দিলেন :

> 'উসাইদ! তাহলে তুমিও আমাকে অনুরূপ গুঁতোর মাধ্যমে প্রতিশোধ নাও।'

উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

> 'আপনার পরিধানে তো জামা রয়েছে। যখন আমাকে গুঁতো দিয়েছিলেন তখন আমার গায়ে জামা ছিল না।'

এ কথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জামা খুলে উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রতিশোধ গ্রহণের সুযোগ দিলেন। এতে উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললেন :

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোন এবং সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বগল ও পাঁজরের মধ্যবর্তী স্থানে চুম্বন দিতে দিতে বললেন :
>
> 'এটি ছিল আমার আকাঙ্ক্ষা। ইসলাম গ্রহণের প্রথম দিন থেকেই আমি এর অপেক্ষায় ছিলাম, এ মুহূর্তে আমি আমার সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে ধন্য হলাম।'

প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণকারী হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁকে খুব ভালোবাসতেন এবং সর্বদাই তাঁকে অন্যদের চেয়ে বেশী প্রাধান্য দিতেন। উহুদ যুদ্ধে তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দেহরক্ষী দলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লামের দেহরক্ষী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তাঁর ওপর শত্রুবাহিনী পরপর বর্শার সাত সাতটি আঘাত হানে! তিনি প্রতিটি আঘাত অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে মুকাবিলা করেন। নিজ গোত্রেও তিনি সকলের অত্যন্ত আস্থাভাজন ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি গোত্রের কারো ব্যাপারে সুপারিশ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করতেন। সুপারিশ সংক্রান্ত একটি ঘটনার বর্ণনা উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এভাবে দেন :

'একদা আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে এক আনসার পরিবারের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্টের বর্ণনায় বলি, 'পরিবারের অধিকাংশই অসহায় মহিলা এবং অন্যরা গরীব-মিসকীন, তাদের উপার্জনক্ষম বলতে কেউ নেই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সম্পর্কে আমার বর্ণনা শুনে বললেন :

'উসাইদ! অনেক বিলম্বে এসেছ। গনীমতের অর্থ-কড়ি যা কিছু হাতে ছিল তা বিতরণ করে ফেলেছি। আবার কোনো গনীমতের অর্থ-কড়ি আসার সংবাদ পেলে সে পরিবারের কথা স্মরণ করে দিও।'

'কিছুদিন পর খায়বার থেকে গনীমতের মাল মদীনায় এসে পৌঁছলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা আনসারদের মধ্যে বেশি বেশি করে বিতরণ করেন এবং আমার বর্ণনা দেওয়া আনসার পরিবারকেও প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেন। এতে আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলি :

'হে আল্লাহর রাসূল! সেই পরিবারের পক্ষ থেকে আল্লাহ আপনাকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।'

প্রত্যুত্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :

وَاَنْتُمْ مَعْشَرَالْاَنصَار جَزَاكُمُ اللّٰهُ اَطْيَبَ الْجَزَاءِ فَاِنَّكُمْ. مَاعَلِمْتُ.
أَعِفَّةٌ صُبُرٌ، وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ أَثَرَةً بَعْدِىْ فَاصْبِرُوا حَتّٰى تَلْقَوْنِىْ
وَمَوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ.

'তোমরা আনসার। আল্লাহ্ তোমাদেরও উত্তম পুরস্কার দান করুন। কেননা, আমার জানামতে দীর্ঘদিন যাবৎই তোমরা সবর ও ধৈর্যের এক জ্বলন্ত উদাহরণ সৃষ্টি করেছো। কিন্তু আমার পর তোমরা অচিরেই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদেরকে তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে দেখবে।' সে ক্ষেত্রে তোমরা হাওযে কাওসারে আমার সাথে সাক্ষাৎ হওয়া পর্যন্ত ধৈর্যধারণ করো। (দ্রষ্টব্য : বুখারী ও মুসলিম শরীফে বিষয়টি বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে)

উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে তিনি কোনো এক সময়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রচুর ধনসম্পদ বিতরণ করেন। আমার জন্যও উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একখণ্ড কাপড় পাঠিয়ে দেন। সে কাপড়খানা একটি জামা তৈরির জন্য যথেষ্ট ছিল না। ইতোমধ্যে আমি মসজিদে নববীতে অবস্থানকালে দেখতে পাই যে, উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমার জন্য কাপড়ের যে খণ্ডটি পাঠিয়েছিলেন, ঠিক সে কাপড়েরই এমন একটি লম্বা পোশাক পরিধান করেন, যা মাটি স্পর্শ করছে, এক কুরাইশ যুবক আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছে। তা দেখে আমার পাশের ব্যক্তির কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি উল্লেখ করলাম যে :

'তোমরা আমার পরে অচিরেই ভুল তথ্যের ভিত্তিতে অন্যদেরকে তোমাদের ওপর অগ্রাধিকার দিতে দেখবে।'

লোকটি আমার এ মন্তব্য শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে তা বর্ণনা করে। একথা শুনে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তৎক্ষণাৎ আমার কাছে চলে আসেন। তখন আমি মসজিদেই নামায আদায় করছিলাম।

তিনি বলেন :

'উসাইদ নামায পড়ে নাও।'

নামায শেষ করতেই তিনি আমার কাছে এসে বললেন :

'উসাইদ! তুমি ঐ কুরাইশ যুবককে দেখে কী বলেছ ?'

আমি যা বলেছিলাম, আমীরুল মুমিনীনকে তা জানালে তিনি বললেন :

'হে উসাইদ! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। যে কাপড়টি তুমি দেখেছ তা অমুক লোকের জন্য পাঠিয়েছিলাম। তিনি এমন এক আনসার সাহাবী, যিনি আকাবার শপথ অনুষ্ঠানে এবং বদর ও উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সৌভাগ্যবান গাযী সাহাবীদের অন্যতম। তাঁর থেকে এই কুরাইশ যুবক এ কাপড়খণ্ড ক্রয় করে পরিধান করেছে। হে উসাইদ! তুমি কি মনে করছ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, তা আমার খিলাফতের যুগেই বাস্তবায়ন হবে?'

উসাইদ বললেন :

'হে আমীরুল মুমিনীন! আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, তা আপনার শাসনামলে সংঘটিত হবে না।'

এ ঘটনার পর উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের সময়ই তিনি ইনতিকাল করেন।

তাঁর ইনতিকালের পর দেখা গেল যে, তাঁর চার হাজার দিরহাম ঋণ রয়েছে। তাঁর পরিবারের লোকজন তাঁর একখণ্ড জমি বিক্রি করে সে ঋণ পরিশোধ করার সিদ্ধান্ত নেন।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ খবর শুনে বললেন,

'আমার ভাই উসাইদের সন্তানদেরকে অপরের দয়া ও করুণার ওপর নির্ভরশীল রাখতে আমি পারি না। অতঃপর তিনি উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঋণদাতাদের সাথে আলোচনা করে তাদেরকে এ সিদ্ধান্তে সম্মত করেন যে, ঋণদাতারা উসাইদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর রেখে যাওয়া জমি থেকে প্রত্যেক বছর এক হাজার দিরহাম মূল্যের ফলমূল খরিদ মূল্যে নেবে। এভাবে চার বছরে চার হাজার দিরহাম পরিশোধ হবে।'

উসাইদ ইবনে হুদাইর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. সহীহ আল বুখারী ও মুসলিম শরীফ (সাহাবীদের ফযীলত অধ্যায়)।
২. জামেউল উসূলঃ ৯ম খণ্ড, ৩৭৮ পৃ.।
৩. তাবাকাত ইবনে সা'দঃ ৩য় খণ্ড, ৬০৩ পৃ.।
৪. তাহযীব আত তাহযীবঃ ১ম খণ্ড, ৩৪৭ পৃ.।
৫. উসদুল গাবাহঃ ১ম খণ্ড, ৯২ পৃ.।
৬. হায়াতুস সাহাবাঃ ৪র্থ খণ্ডের সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৭. আল আ'লাম এবং তাতে উল্লিখিত সহায়ক গ্রন্থাবলি।

# আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা)

*নিঃসন্দেহে তিনি তরুণ। কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা অভিজ্ঞ জ্ঞানবান বৃদ্ধের ন্যায়। যেমন জ্ঞানপিপাসু, তেমনি মহান।*

*–উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)*

শীর্ষস্থানীয় শ্রদ্ধাভাজন ও মর্যাদাবান যেসব সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুম সকলের কাছে ছিলেন অতি সম্মানিত, আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদের অন্যতম। এতদসত্ত্বেও তাঁর ছিল পৃথক কিছু বৈশিষ্ট্য। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সার্বক্ষণিক সাহচর্য লাভে ধন্য হয়েছিলেন।

সম্পর্কের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আপন চাচাত ভাই। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। এজন্য তাঁকে বলা হতো উম্মতের শ্রেষ্ঠ আলেম বা 'হাবরুল উম্মাহ'। তিনি নিয়মিত নফল রোযা রাখতেন, তাওবা-ইসতিগফার করতেন এবং রাতভর নফল ও তাহাজ্জুদ নামায আদায় করতেন। আল্লাহর ভয়ে তিনি এমনভাবে ক্রন্দন করতেন যে দু'চোখের পানিতে বুক ভেসে যেত।

নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ খোদাপ্রেমিক।

আল কুরআনের অর্থ অনুধাবনের ক্ষেত্রে তিনি যেমন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, তেমনি এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণেও ছিলেন উলামায়ে সাহাবীদের শীর্ষস্থানীয় ও

অদ্বিতীয়। জটিল বিষয়ের নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁর প্রজ্ঞা ছিল খুবই প্রখর। নৈতিক প্রভাব বিস্তারেও তার জুড়ি ছিল না।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইনতিকালের সময় তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো বছর। এতদসত্ত্বেও উম্মতে মুসলিমার জন্য তিনি এক হাজার ছয়শত ষাটটি হাদীস হিফয করে রাখেন। সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে যা সংযোজিত হয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাঁর মা তাঁকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হন। উদ্দেশ্য 'তাহ্নীকা' করণ বা তাঁর মুখের পবিত্র লালামিশ্রিত চর্বিত খেজুরের অংশবিশেষ নবজাতকের মুখে দিয়ে বরকত লাভ করা। মুখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখের চর্বিত খেজুরের মাধ্যমে সর্বপ্রথম তাকওয়া ও হিকমত তাঁর দেহে প্রবেশ করে।

وَمَنْ يُّؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا.

'যাকে হিকমত দান করা হয়েছে নিঃসন্দেহে তাকে অশেষ কল্যাণ দান করা হয়েছে।'

হাশেমী গোত্রের এই শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সেবায় নিমগ্ন থাকাকেই অধিক পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তিনি ওযূর পানি এনে দিতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযে দাঁড়িয়ে গেলে তাঁর পেছনেই নামাযে দাঁড়াতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরে বের হলে একই উটে তাঁর পিছনে বসে পড়তেন। এক কথায় উঠাবসা, চলাফেরা, যাতায়াত সব সময়ই আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ঠিক ছায়ার মতো লেগে থাকতেন।

তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে হাদীস শুনতেন, সাথে সাথেই তা মুখস্থ করে নিতেন।

একবার একটি ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন :

'একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওযূর ইচ্ছা করলে আমি বিষয়টি আঁচ করে তৎক্ষণাৎ ওযূর পানি এনে দেই। আমার তৎপরতা ও অনুধাবনশক্তির এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই আনন্দিত হন। তিনি নামাযের প্রস্তুতি নিলে আমাকে তাঁর পাশে দাঁড়ানোর জন্য ইঙ্গিত করেন। আমি তাঁর পাশে না দাঁড়িয়ে পিছনে গিয়ে দাঁড়াই।

নামাযশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লক্ষ্য করে বললেন :

'আবদুল্লাহ! তুমি কেন আমার পাশে না দাঁড়িয়ে পিছনের সারিতে দাঁড়ালে?'

আমি উত্তরে আরয করলাম :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিতে আপনি সম্মানিত ও শ্রদ্ধাভাজন হওয়ায় আমি আপনার পাশে দাঁড়ানো বেয়াদবী মনে করেছি।

আমার উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দভরে তাঁর দু'হাত আকাশের দিকে তুলে দু'আ করলেন :

اَللّٰهُمَّ اٰتِهِ الْحِكْمَةَ ـ

'হে আল্লাহ, তুমি তাকে হিকমত, বিচক্ষণতা ও প্রজ্ঞা দান করো।'

সাথে সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ দু'আ কবুল করলেন। সে যুগের বহু খ্যাতিমান, বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবানের চেয়ে হাশেমী গোত্রের এ শিশুটিকে আল্লাহ তাআলা শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার বিচক্ষণতার অনেক উদাহরণ আছে। নিম্নোক্ত উদাহরণটি সবিশেষ উল্লেখ্য :

মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরোধকে কেন্দ্র করে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক যোদ্ধা যখন তাঁর থেকে আলাদা হয়ে গেল, তখন আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রস্তাব দিলেন :

'আমীরুল মুমিনীন! আপনি অনুমতি দিলে আপনার থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের সাথে আলোচনা করে আমি তাদের বোঝানোর চেষ্টা করতে চাই।'

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি আশঙ্কা করছি যে, তারা তোমার ওপর কোনো অন্যায় না করে বসে।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'তা হতেই পারে না।'

আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে অনুমতি নিয়ে যখন তিনি খারেজী সম্প্রদায় অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে আলাদা হয়ে যাওয়া যোদ্ধাদের কাছে পৌঁছেন, তখন দেখতে পেলেন, তারা নামায ও ইবাদত-বন্দেগীতে খুবই একাগ্র ও একান্ত মনোযোগী।

তারা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মোবারকবাদ জানিয়ে বললেন :

'কি উদ্দেশ্যে আপনার আগমন ?'

তিনি বললেন :

'আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্য এসেছি।'

ইবনে আব্বাসের আলোচনার কথা জানতে পেরে তারা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

কেউ কেউ বলল :

'ইবনে আব্বাসের সাথে কোনো আলোচনা করা যাবে না।'

অপর পক্ষ থেকে বলা হলো :

'আহ্! কেন বাধা দেওয়া হচ্ছে? তিনি কী বলতে এসেছেন বলতে দিন।'

পরিশেষে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আলোচনার অনুমতি দেওয়া হলো।

তখন তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন :

'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই ও তাঁর জামাতা আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, যিনি সর্বপ্রথম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান এনেছেন। আমি জানতে চাই, তাঁর বিরুদ্ধে আপনাদের কী কী অভিযোগ ও কেনই বা আপনারা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে চলে এসেছেন?'

তারা সমস্বরে উত্তর দিল :

'যেসব অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেছি, তা প্রধানত তিনটি।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা জিজ্ঞেস করলেন :

'অভিযোগগুলো কী কী?'

তারা উত্তর দিল :

'তাঁর ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মধ্যকার বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য প্রথমত দুই ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নিয়ে তিনি শরীআতের সীমারেখা লঙ্ঘন করেছেন।

দ্বিতীয়ত, তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা ও মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন অথচ এ যুদ্ধে 'গনীমতের মাল' গ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি ও পরাজিত মহিলাদের বন্দিনী করতেও দেননি।

তৃতীয়ত, তিনি নিজের নামের শেষাংশ থেকে 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি বাদ দিয়েছেন অথচ মুসলমানেরা তাঁর হাতে বাইআত গ্রহণ ও তাঁকে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছেন।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আমি যদি কুরআন ও হাদীসের দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে সমর্থ হই, তাহলে কি আপনারা আপনাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবেন? আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে আবার যোগ দেবেন?

তারা উত্তর দিল :

'অবশ্যই।'

তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

'আপনাদের অভিযোগ যে, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুই ব্যক্তিকে বিচারক মেনে নিয়ে শরীআতের সীমা লঙ্ঘন করেছেন। অথচ আল্লাহ্ পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে :

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْتُلُوا۟ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُۥ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِۦ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ.

'হে ঈমানদারগণ! ইহরাম বাঁধা অবস্থায় শিকার করো না। তোমাদের কেউ যদি জেনে-বুঝে এরূপ অপরাধ করে, তবে শিকারের সমপরিমাণ একটি জন্তু তাকে কুরবানী করতে হবে। সে সম্পর্কে ফায়সালা করবে তোমাদের মধ্য হতে দু'জন সুবিচারক ব্যক্তি।' (সূরা মায়িদা : ৯৫)

হে ভায়েরা! আল্লাহর কসম দিয়ে আপনাদের বলছি, সিকি দিরহামের খরগোশের তুলনায় মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সংশোধন, কলহ-বিবাদের পরিসমাপ্তি, তাদের পারস্পরিক রক্তপাত বন্ধের এবং বিবদমান দু'পক্ষের মধ্যে নিষ্পত্তির জন্য দু'ব্যক্তির ওপর ফায়সালার ভার দেওয়াটাই কি অধিক যুক্তিসঙ্গত নয়? এ জন্য দু'জন বিচারক নির্ধারণ করা কি শরীআত লঙ্ঘিত অপরাধ?

তারা উত্তর দিল :

'হ্যাঁ! তাহলে মুসলমানদের রক্তপাত বন্ধের ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের খাতিরে বিচারক নিযুক্ত করাটাই নিঃসন্দেহে অধিক যুক্তিসঙ্গত।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'যথার্থ উত্তর দানের মাধ্যমে কি আপনাদের প্রথম প্রশ্নের পরিসমাপ্তি ঘটাতে পেরেছি ?'

তারা উত্তর দিলো :

'আল্লাহর শপথ! অবশ্যই আমরা প্রথম প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধ করেছেন অথচ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারিণীদেরকে বন্দী করেননি, অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেছেন। আপনারা কি চেয়েছেন যে, আপনাদের মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে বন্দী করা উচিত ছিল? যেমনটি করা হতো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে? যে যুগে এ ধরনের বন্দিনীদের বাঁদী ও স্ত্রী হিসেবে যোদ্ধাদের জন্য বৈধ করে দেওয়া হতো?'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'যদি আপনারা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেন, সে ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে কাফির হয়ে যাবেন। আর যদি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে 'মা' বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন, তবু কাফির হয়ে যাবেন। কেননা, পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেছেন :

اَلنَّبِىُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗ اُمَّهٰتُهُمْ -

'নিশ্চয়ই নবী ঈমানদার লোকদের পক্ষে তাদের নিজেদের অপেক্ষাও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য এবং নবীর স্ত্রীগণ তাদের 'মা'। (সূরা আহযাব : ৬)

এখন আপনারা এ দুটি উত্তরের যে কোনো একটি বেছে নিন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ প্রশ্নে সবাই নীরব ও নিশ্চুপ হয়ে গেল। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'আপনারা কি আপনাদের দ্বিতীয় প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছেন?'

তারা সমস্বরে উত্তর দিল :

'খোদার শপথ! আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের অত্যন্ত সন্তোষজনক উত্তর পেয়েছি।'

তখন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে বললেন :

'আপনাদের অভিযোগ যে, আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর নাম থেকে 'আমীরুল মুমিনীন' উপাধি মুছে ফেলেছেন। এ ক্ষেত্রে হুদাইবিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৃষ্টান্ত আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। মুশরিকীনে মক্কার সাথে হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তাবলিতে এ কথা উল্লেখ করা হয় যে, এই চুক্তি মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে সম্পাদিত হচ্ছে। তখন মক্কার মুশরিকরা আপত্তি করে বলেছিল, আমরা যদি আপনাকে রাসূলই মেনে নেই, তাহলে মক্কায় প্রবেশে বাধা কেন? এবং আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধেই বা লিপ্ত কেন? তাই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর স্থলে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখুন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ শর্ত এই বলে মেনে নেন যে :

وَاللّٰهِ إِنِّىْ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُوْنِىْ .

'আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল, তোমরা যতই অস্বীকৃতি জানাও না কেন?'

এ উদাহরণ পেশ করার পর ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন :

'তৃতীয় অভিযোগের যথার্থ উত্তর পেয়েছেন কি?'

তারা সমস্বরে বলে উঠল :

'আল্লাহর শপথ! আমরা সন্তোষজনক জবাব পেয়েছি।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিচক্ষণতা, প্রজ্ঞা এবং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এ আলোচনা চলার ফলে দলছুট ২০,০০০ (বিশ হাজার) যোদ্ধা সঙ্গীসাথী পুনরায় আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে যোগদান করে বৈধ ও ইসলামী সরকারের আনুগত্য স্বীকার করলেন। অবশিষ্ট ৪,০০০ (চার হাজার) যোদ্ধা প্রতিহিংসা, হঠকারিতা ও জিদের বশবর্তী হয়ে খারেজী সম্প্রদায় পরিচয়ে বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শিশুকাল থেকেই অসাধারণ বিদ্যানুরাগী ছিলেন। বিদ্যার্জনের পথে ধারণাতীতভাবে প্রচেষ্টা ও নানাবিধ সাধনা অব্যাহত রেখেছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবিতাবস্থায় যতদিন সম্ভব হয়েছে, সরাসরি নবুওয়াতের ঝর্নাধারা থেকে জ্ঞানের পিপাসা নিবৃত্ত করেছেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পর তিনি সে পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্য 'উলামাউস্ সাহাবা' বা সাহাবীদের মধ্যে যারা আলেম ছিলেন, তাঁদের সাহচর্যে এসে তাঁদের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন।

তিনি নিজের শিক্ষা জীবনের ঘটনা উল্লেখপূর্বক বলেন :

> 'একবার আমার কাছে সংবাদ পৌঁছল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর কাছে এমন একটি হাদীস আছে, যা আমার জানা নেই। আমি তৎক্ষণাৎ তার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমি এমন এক সময় তাঁর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলাম, যখন তিনি দুপুরের খাবার খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন তাকে না ডেকে তাঁর বাড়ির দরজায় চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। মরুভূমির দমকা বাতাসে আমার চাদরের উপর বালির স্তর পড়ে গেল। অথচ আমি যদি দ্বিপ্রহরের এই প্রচণ্ড গরমে তার বাসায় প্রবেশের অনুমতি চাইতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে তিনি আমাকে খোশ আমদেদ জানাতেন। আমি তার বিশ্রামকে আমার কষ্টের ওপর এ জন্যই প্রাধান্য দিয়েছিলাম, যেন তিনি দ্বিপ্রহরে খাওয়ার পর একটু অবসাদ দূর করে প্রশান্তি লাভ করতে পারেন।

তিনি ভিতর থেকে বেরিয়ে তাঁর বাড়ির দরজায় আমাকে এ অবস্থায় দেখতে পেয়ে বলেন :

> 'হে রাসূলুল্লাহর চাচাত ভাই! কী ব্যাপার? এ অবস্থায় আওয়াজ দেননি কেন? কী মনে করে এসেছেন? আমাকে ডেকে পাঠালে আমি নিজেই আপনার খিদমতে উপস্থিত হয়ে যেতাম।'

আমি তাঁকে উত্তরে বললাম :

> 'আপনার খিদমতে আমার উপস্থিতিটাই বেশি যুক্তিসঙ্গত। কারণ, ইলম শিক্ষা দেওয়া হয়, তা এমনিই আসে না। অতঃপর আশ্বস্ত হওয়ার পর তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্যা অর্জনের পথে যেমন নিজেকে অত্যন্ত নগণ্য মনে করতেন, কোনোরূপ গর্ব-অহংকার হৃদয়ে স্থান দিতেন না, তেমনি আলেমদেরকে অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করতেন। খিলাফাতে রাশিদার যুগে মদীনা মুনাওয়ারার শ্রেষ্ঠতম ফিক্‌হবিদ, বিচারশাস্ত্রের অন্যতম পারদর্শী ব্যক্তিত্ব, ইলমুল কিরাআত ও ফারায়েযশাস্ত্রের ইমাম এবং 'কাতিবে ওহী' বা রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের বাণীসমূহের সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধকারী যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে সংঘটিত একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

একদিন যায়েদ ইবনে সাবেত তাঁর অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করার জন্য প্রস্তুত। হাশেম গোত্রের এই বালক আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস যায়েদ ইবনে সাবেত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সামনে এক হাতে তাঁর ঘোড়ার লাগাম এবং অন্য হাতে পা দানী ধরে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যান, যেমন একজন ক্রীতদাস তার প্রভুর সম্মানে শ্রদ্ধাভরে দাঁড়িয়ে থাকে।

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাকে বললেন :

> 'হে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই। অনুগ্রহপূর্বক ঘোড়ার লাগাম ও রেকাব ছেড়ে দিন।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দিলেন :

> 'উলামায়ে ইসলামকে এভাবেই সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আমরা নির্দেশিত হয়েছি।'

যায়েদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তা শোনামাত্র ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

> 'আপনার হাতখানা একটু দেখি।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর উদ্দেশ্যে হাত বাড়ানো মাত্রই যায়েদ ইবনে সাবিত রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর হাতের দিকে ঝুঁকে পড়েন ও তাঁকে চুম্বন দিয়ে বলেন :

'আমরাও আমাদের নবীর আহলে বাইতের সদস্যদের সাথে এমনিভাবে সম্মান প্রদর্শন করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্যা অর্জনের জন্য এমনভাবে মনোনিবেশ করেন যে, তিনি সর্বশাস্ত্রে আশ্চর্যজনকভাবে গভীর ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য লাভ করেন। অন্যতম প্রসিদ্ধ 'তাবেঈ' মাসরূক ইবনে আল আজদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু[১] ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বলেন :

'যখন তাঁর দৈহিক কাঠামো ও অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম তখন বলতাম যে, একজন সুপুরুষ। যখন কথাবার্তা বলতেন, তখন বলতাম যে, একজন বিশুদ্ধভাষী। আর যখন কোনো আলোচনায় অংশ নিতেন তখন বলতাম, সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিজ্ঞ।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্যার্জনের তৃষ্ণা নিবারণের পর শিক্ষকতার পেশা বেছে নেন ও শিক্ষা বিস্তারের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর বাসগৃহ অল্প দিনের মধ্যেই একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। আধুনিক যুগে বিশ্ববিদ্যালয় বলতে যা বোঝায়, তার বাড়িও ছিল তা-ই। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই যে, আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিষয়ভিত্তিক বহুসংখ্যক অধ্যাপক থাকেন। যার সংখ্যা কোনো কোনো সময় শতাধিকও হয়ে থাকে। অথচ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিশ্ববিদ্যালয়ে সব শাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য মাত্র একজন অধ্যাপক ছিলেন, আর তিনিই হলেন ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কোনো এক অনুসারী বর্ণনা করেন যে :

'ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ইলমী মজলিসে এতই প্রশংসনীয় ও গর্বের ছিলেন যে, কুরাইশ গোত্রের সমস্ত লোক যদি তা নিয়ে

গর্ব করত তাহলে তা হতো যথার্থ। আমি দেখেছি, ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়ি অভিমুখে যাতায়াতের রাস্তাগুলোর দূরপ্রান্ত পর্যন্ত সারিবদ্ধ শিক্ষার্থীদের ভিড় থাকত। আমি ভিতরে গিয়ে বাড়ির দরজায় বিদ্যানুরাগীদের সমাগমের সংবাদ দিতাম।'

তিনি বলতেন :

'আমাকে ওযূর পানি দাও।'

পানি দিলে তিনি ওযূ করে নির্দিষ্ট স্থানে বসে আমাকে নির্দেশ দিতেন,

'বাইরে গিয়ে ঘোষণা দাও যে, যারা আল কুরআন ও ওহীর বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জানতে চান, তারা ভিতরে আসুন।'

আমি তাঁর নির্দেশানুযায়ী বাইরে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেওয়ামাত্রই তারা বৈঠকখানা ও তৎসংলগ্ন কক্ষে বসে যেতেন।

তিনি তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং এ বিষয়ে আরো অতিরিক্ত আলোচনা করতেন। আলোচনা শেষে তাদের উদ্দেশ্যে বলতেন :

'আপনাদের অন্য ভাইদের জন্য সুযোগ করে দিন।'

তখন তারা সবাই চলে যেতেন। অতঃপর আমাকে নির্দেশ দিতেন,

'বাইরে গিয়ে সমবেত লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দাও যে, যারা আল কুরআনের তাফসীর ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে জানতে চান, তারা প্রবেশ করুন।'

আমি বের হয়ে তাদের উদ্দেশ্যে এ ঘোষণা দেওয়া মাত্রই অপেক্ষমাণ লোকদের দ্বারা বৈঠকখানা ও কক্ষ অনুরূপভাবে ভরে যেত। তিনি তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতেন এবং এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত আলোকপাত করতেন।

অতঃপর তারা বেরিয়ে গেলে তিনি পুনরায় নির্দেশ দিতেন, বাইরে গিয়ে অপেক্ষমাণদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দাও :

'যারা হালাল ও হারাম এবং ফিক্‌হশাস্ত্রের ওপর প্রশ্ন করতে চান, তারা ভিতরে প্রবেশ করুন।'

আমি বাইরে এসে অপেক্ষমাণ লোকদের উদ্দেশ্যে ঘোষণা দেওয়া মাত্রই বৈঠকখানা ও কক্ষ অনুরূপভাবে ভরে যেত। তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর শেষে এতদবিষয়ে ও আনুষঙ্গিক আলোচনা করে বলতেন :

'আপনাদের অপেক্ষমাণ ভাইদের জন্য সুযোগ করে দিন।'

তারা বেরিয়ে গেলে, আমাকে নির্দেশ দিতেন :

'বাইরে গিয়ে ঘোষণা দাও, যারা ফারায়েয এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করতে চান, তারা ভিতরে প্রবেশ করুন।'

সাথে সাথে বৈঠকখানা ও কক্ষ ভরে যেত। তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর এতদবিষয়ে অতিরিক্ত আলোচনা করার পর তাদেরকেও বলতেন :

'আপনাদের ভাইদের জন্য রাস্তা ছেড়ে দিন।'

অতঃপর আমাকে নির্দেশ দিতেন :

'বাইরে গিয়ে ঘোষণা দাও, যারা আরবী সাহিত্য, কবিতা এবং আরবী ভাষার বিরল সাহিত্য সম্ভারের বিষয়ে প্রশ্ন করতে চান, তারা ভিতরে প্রবেশ করুন।'

অনুরূপভাবে তাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরের পর এতদ্‌বিষয়ে পূর্বের মতোই বিস্তারিত আলোচনা করতেন। বর্ণনাকারী বলেন যে, কুরাইশ গোত্রের সবাই যদি তার এ কাজের জন্য গৌরব করত, তাদের জন্য তা যথার্থ হতো।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বিদ্যানুরাগীদের এ অসাধারণ ভিড় লাঘবের উদ্দেশ্যে এক এক দিন এক এক বিষয়ে প্রশ্নোত্তর ও আলোচনা করার সময়সূচি নির্ধারণ করে দেন। যেমন সপ্তাহে একদিন শুধু তাফসীর বিষয়েই আলোচনা করতেন। অপর দিন শুধু ফিক্‌হ, তার পরের দিন মাগাযী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে সংঘটিত যুদ্ধসমূহের ওপর আলোচনা করতেন। অন্যদিন শুধু কবিতা, অপর দিন আরবদের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতেন। তাঁর ক্লাসে এমন কোনো আলেম বসতেন না, যিনি তাঁর আলোচনায় মুগ্ধ না হতেন এবং এমন কোনো প্রশ্নকারী ছিলেন না যে, তাঁর সন্তোষজনক উত্তরে সন্তুষ্ট না হতেন।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুবক হওয়া সত্ত্বেও তাঁর ইলম ও পাণ্ডিত্য এবং ব্যুৎপত্তির গুণে খিলাফতে রাশিদার একজন অন্যতম উপদেষ্টা পদে অধিষ্ঠিত হন। খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যদি কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখন তিনি পরামর্শের জন্য নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও গুণীজনসহ ইসলামের প্রথম যুগে ঈমান গ্রহণকারী শ্রদ্ধাভাজন সাহাবীদেরকে আহ্বান করতেন। তিনি তাদের সাথে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকেও আমন্ত্রণ জানাতেন। এসব মহতী পরামর্শ পরিষদের বৈঠকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উপস্থিত হলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে খুবই সম্মান করতেন, নিজের পাশে বসাতেন এবং বলতেন :

'আমরা কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। এ ব্যাপারে আপনার সুনির্দিষ্ট মতামত ও সুচিন্তিত পরামর্শ একান্তই কাম্য।'

যুবক সাহাবী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাকে মুরব্বী ও বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সমপর্যায়ের পদমর্যাদা ও সম্মান দেওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একদা প্রতিবাদ জানানো হলে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জবাব দেন :

إِنَّهُ فَتَى الْكُهُوْلُ، لَهُ لِسَانٌ سَؤُوْلٌ وَقَلْبٌ عَقُوْلٌ -

'নিঃসন্দেহে তিনি একজন তরুণ; কিন্তু তাঁর প্রজ্ঞা, জ্ঞান, দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতা, অভিজ্ঞ জ্ঞানবান বৃদ্ধের ন্যায়। তিনি যেমনি জ্ঞানপিপাসু তেমনি মহান।'

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জ্ঞানপিপাসু আলেম-ওলামা ও ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে গিয়ে সাধারণ মুসলমানদেরকে মোটেই ভুলে যাননি। তাদের জন্যও রীতিমতো ওয়ায-মাহফিল ও আলোচনাসভা ইত্যাদির আয়োজন করতেন। পথহারা, বিপথগামী গুনাহগারদের উদ্দেশ্যে দেওয়া তাঁর ভাষণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হলো :

'হে পথহারা বিপথগামী ভাইয়েরা! কখনোই আপনারা আপনাদের কৃত গুনাহের পরিণতি থেকে নিজেদেরকে ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে মনে করবেন না।

জেনে রাখুন, নাফস বা কুপ্রবৃত্তির দাসত্বই মানুষকে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপে লিপ্ত করে। আপনার ডানে ও বামে সার্বক্ষণিক দু'জন ফেরেশতার উপস্থিতিতে অপকর্মে লিপ্ত হওয়াতে লজ্জাবোধ না করা কিন্তু সাধারণ ও ছোট গুনাহ নয়।

গুনাহকে হাস্য ও তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উড়িয়ে দেওয়া নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ। যার পরিণতিতে আল্লাহ ভীষণ সাজা দিতে পারেন। কোনো অপকর্ম বা পাপ করে খুশি হওয়া বা আনন্দ করা যেমন মহাপাপ, তেমনি পাপাচারে বা গুনাহের কাজে কৃতকার্য না হয়ে দুঃখ প্রকাশ করাও মহাপাপ। আল্লাহ দেখছেন– এ অনুভূতিকে উপেক্ষা করে, গুনাহের কাজে লিপ্তাবস্থায় অন্তরে প্রকম্পন ও ভীতি অনুধাবন না করে, গোপনে কৃত পাপকার্যের সংবাদ বের হয়ে পড়ার আশঙ্কা করাও নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ বা মহাপাপ।

আপনারা কি জানেন? আইয়ুব আলাইহিস সালামের গোনাহ কী ছিল? যার কারণে আল্লাহ তাঁকে ধনসম্পত্তি ও দৈহিক শান্তির পরীক্ষায় ফেলেছিলেন? তাঁর ত্রুটি এতটুকুই ছিল যে, 'এক মিসকীন তাঁর ওপর কৃত অত্যাচার লাঘবের জন্য তাঁর নিকট সাহায্যের আবেদন করেছিল; কিন্তু তিনি তাঁকে সাহায্য করেননি বলেই তাঁর সে পরীক্ষা।'

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার কথাবার্তা কখনোই সাম স্যহীন লোকদের মতো ছিল না। যারা নিজেরা খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে অন্যদের তা থেকে বিরত থাকার উপদেশ প্রদান করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তিনি দিনের বেলায় রোযা রাখতেন এবং রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামাযে নিমগ্ন থাকতেন।

আবদুল্লাহ ইবনে মুলাইকা বর্ণনা করেন যে :

'আমি একবার ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার সাথে মক্কা থেকে মদীনায় যেতে সঙ্গী হয়েছিলাম। কাফেলা সারাদিন পথ অতিক্রম করার পর রাত্রি যাপনের জন্য যখন কোনো মনযিলে যাত্রাবিরতি করত, তখন দেখতাম অত্যন্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত সঙ্গী-সাথীরা অবসাদ দূরীকরণের জন্য গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হতো। অন্যদিকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মধ্যরাত থেকেই তাহাজ্জুদ ও নফল নামাযে নিমগ্ন হতেন।'

এ সফরের এক রাতের অবস্থা ছিল এই :

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ط ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ .

'অতঃপর এই মৃত্যু-যন্ত্রণা পরম সত্য হয়ে উপস্থিত হলো। এ সেই মৃত্যু যা থেকে তুমি পালিয়ে বেড়াতে।' (সূরা কাফ : ১৯)

এ আয়াত তিলাওয়াত করতে করতে তিনি ব্যাকুল হয়ে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করছিলেন। এমনকি এ অবস্থায়ই ফজর হয়ে যায়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ছিলেন সুশ্রী, সুপুরুষ ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী। রাতভর কান্নারত অবস্থায় অতিবাহিত করার কারণে তাঁর দু'চোখ দিয়ে ঝরে পড়া পানির দাগ এমন মনে হতো, যেন তাঁর দু'গালে চিকন দুটি কালো ফিতার মতো দাগ পড়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা সাহাবীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম হিসেবেই শুধু সুখ্যাতি অর্জন করেননি বরং অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি ছিলেন।

মুসলিম বিশ্বের খলীফা মুআবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার হজ্জ পালনে আসেন। অপরদিকে রাষ্ট্রীয় ছত্রছায়া ও সরকারি পদবিহীন সাধারণ জীবন যাপনকারী ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমাও সে বছর হজ্জে আসেন। সরকারি ব্যবস্থাপনায় সরকারি লোকজনের দ্বারা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর তাঁবুর শোভা বর্ধন করা হয়েছিল। অপরদিকে ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার তাঁবুতে সারা মুসলিম বিশ্ব থেকে আসা তাঁর অনুসারী এবং জ্ঞানপিপাসুদের বিরাটসংখ্যক উপস্থিতি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জাঁকজমকপূর্ণ অবস্থানকে ম্লান করে দেয়।

ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা ৭১ বছর বেঁচে ছিলেন। সাধনা, শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান, হিকমত ও তাকওয়ার শিক্ষায় তিনি তাঁর যুগকে উজ্জ্বল করে গিয়েছেন। তাঁর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিজ্ঞ ও বুযুর্গ সাহাবীদের মধ্যে যারা জীবিত ছিলেন, তাঁদের এবং প্রসিদ্ধ তাবেঈদের উপস্থিতিতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে মুহাম্মাদ আল হানাফিয়া

রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু[১] তার জানাযা নামাযের ইমামতি করেন। যখন তাঁকে কবরস্থ করা হচ্ছিল, তখন উপস্থিত বিশাল জনতা অদৃশ্য তিলাওয়াতকারীর উঁচু আওয়াজে আল কুরআনের এ আয়াতগুলোর তিলাওয়াত শুনতে পান।[২]

يَـٰٓأَيَّتُهَا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَئِنَّةُ ـ ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ـ فَٱدْخُلِى فِى عِبَـٰدِى ـ وَٱدْخُلِى جَنَّتِى ـ

'হে প্রশান্ত আত্মা! তোমার রবের দিকে উত্তম পরিণতির জন্য সন্তুষ্টচিত্তে প্রত্যাবর্তন করো। আমার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো।' (সূরা ফাজ্‌র : ২৭-৩০)

---

১. মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে আবী তালিবকে তাঁর মা হানাফিয়ার পরিচয়ে এ জন্য পরিচিত করানো হয়েছে, যেন ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্তান হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমা থেকে পার্থক্য বোঝা যায়। আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে মুহাম্মদ হলেন বনূ হানাফিয়া গোত্রের তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভের সন্তান।

২ মারবিয়াতে আল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ফী আত্ তাফীর গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ৩৪৮-৩৪৯ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে এ ঘটনাটি বর্ণনা করেছেন, যা নিম্নরূপ :

عن سعيد بن جبير قال : مات ابن عباس بالطائف فشهدت جنازته، فجاء طائرلم ير على خلقته حتى دخل في نعشه ثم لم يرخارجًا منه فلما دفن تليت هذه الاية على شفير القبر لايرى من تلاها....

'সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা) বর্ণনা করেন, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তায়েফে ইনতিকাল করেন। আমি তাঁর জানাযার নামাযে অংশগ্রহণ করি। হঠাৎ এমন একটি পাখি, যা কখনো প্রত্যক্ষ করা হয়নি, এসে তার কফিনে ঢুকে পড়ে। অতঃপর এ পাখীকে কেউ কফিন থেকে বের হতে দেখেনি। এমনিভাবে তাঁকে দাফন করা হলে কবর থেকে অদৃশ্য তিলাওয়াতকারীর উঁচু আওয়াজে এই আয়াত তিনটির তিলাওয়াত করতে শোনা যায়। –অনুবাদক

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুমার জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. জামেউল উসূল : ১০ম খণ্ড (ফাযায়েলুস সাহাবা অধ্যায়)।
২. আল ইসাবাহ : ৪৭৮১নং জীবনী।
৩. আল ইসতিয়াব : আল-হামেশে সাহাবা, ২য় খণ্ড, ৩৫০পৃ.।
৪. উসদুল গাবা : ৩য় খণ্ড, ১৯২ পৃ: ।
৫. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ৭৪৬ পৃ: (হালাব সংস্করণ)।
৬. হায়াতুস সাহাবাহ : ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৭. আল আ'লাম ও তার রেফারেন্সসমূহ।

# নু'মান ইবনে মুকাররিন আল মুযান্নী (রা)

*নিফাকের আশ্রয়ের জন্য যেমন ঘর বা পরিবারের প্রয়োজন, ঈমানের প্রতিপালনের জন্যও তেমনি ঘর বা পরিবারের প্রয়োজন। বনূ মুকাররিনের পরিবার ছিল নিঃসন্দেহে ঈমানের ঘর বা পরিবার।*

*–আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু*

মক্কা থেকে ইয়াসরিবগামী পথের পাশেই ছিল মুযাইনা গোত্রের আবাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় হিজরত করে এসেছেন, সে সংবাদ এবং এ পথে আসা-যাওয়া পথিকদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নানাবিধ প্রশংসার সংবাদাদি সর্বক্ষণই মুযাইনা গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছত। তাঁর সম্পর্কে কখনোই কোনো খারাপ সংবাদ তাদের নিকট পৌঁছেনি।

কোনো এক সন্ধ্যায় মুযাইনা গোত্রের সরদার নু'মান ইবনে মুকাররিন আল মুযান্নী নিজ গোত্রীয় অন্যান্য ছোট-বড় সরদারদের সাথে তার ক্লাবঘরে খোশগল্প করছিলেন। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে তিনি বললেন :

আমার গোত্রীয় ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ করে বলছি :

> 'মুহাম্মদ সম্পর্কে যা জেনেছি এবং তাঁর দাওয়াত সম্পর্কে যা শুনেছি, তাতে ন্যায়পরায়ণতা এবং অপরের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা ছাড়া তাঁর দাওয়াতে অন্য কিছু দেখছি না। আর তা-ই যদি হয়, তাহলে এ কল্যাণ ও শান্তির

ডাকে সাড়া দিতে আমরা কেন বিলম্ব করব? অথচ লোকজন এ আহ্বানে দ্রুত সাড়া দিচ্ছে। অতঃপর তিনি তার আলোচনা অব্যাহত রেখে বললেন :

'আমি নিজের ব্যাপারে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে, কাল প্রভাতেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে হাজির হব। তোমাদের কেউ যদি আমার সাথে যাওয়ার ইচ্ছা কর, তাহলে রাতেই প্রস্তুত হও।'

নু'মান ইবনে মুকাররিনের ভাষণ ও ঘোষণা উপস্থিত লোকদের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। ফজর হতে না হতেই দেখা গেল, নু'মান ইবনে মুকাররিনের ১০ ভাই এবং মুযাইনা গোত্রের ৪০০ অশ্বারোহী যোদ্ধা তাঁর নেতৃত্বে ইয়াসরিবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার জন্য তৈরি।

বলা বাহুল্য, তারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করে ইসলাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। নু'মান ইবনে মুকাররিন এই বিরাট কাফেলা নিয়ে কোনো হাদিয়া-উপঢৌকন ছাড়া হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হতে লজ্জাবোধ করছিলেন। এদিকে ক্রমাগত অনাবৃষ্টি ও ফসলহানি মুযাইনা গোত্রকে অত্যন্ত অভাবী করে তুলেছিল। অভাবের কারণে গোত্রের ঘরে ঘরে কোনো শস্যদানা ছিল না এবং গাভীর বাঁটেও ছিল না দুধ। তারপরও নু'মান ইবনে মুকাররিন নিজের ও অন্যান্য ভাইদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খাদ্য সামগ্রী ও বকরি পশুসমূহের যা কিছু অবশিষ্ট ছিল সেসব সংগ্রহ করে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে পেশ করার জন্য এই বিরাট কাফেলার আগে আগে চলতে থাকলেন। নু'মান ইবনে মুকাররিন আল মুযান্নী ও তাঁর বিপুলসংখ্যক সাথী-সঙ্গীদের আগমনের সংবাদ ইয়াসরিব শহরের আনাচে-কানাচে খুশির ঢেউ ছড়িয়ে দেয়। কারণ, এ পর্যন্ত আরবের কোনো গোত্র এ গৌরবের অধিকারী হতে পারেনি যে, একই পরিবারের ১১ জন সহোদর তাদের গোত্রের ৪০০ জন অশ্বারোহী যোদ্ধার সাথে একত্রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছেন।

নু'মান ইবনে মুকাররিন আল মুযান্নীর ইসলাম গ্রহণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনন্দের সীমা ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে নু'মানের হাদিয়া ও তাদের উপঢৌকন প্রেরণ আল্লাহর

পক্ষ থেকে গৃহীত হওয়ার ও ইসলাম গ্রহণের শুভ সংবাদে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় :

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبٰتٍ عِنْدَ اللّٰهِ وَصَلَوٰتِ الرَّسُوْلِ اَلَآ اِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

'মরুবাসীদের কেউ কেউ আল্লাহ্ ও আখিরাতে ঈমান রাখে এবং যা ব্যয় করে তা আল্লাহর সান্নিধ্য ও রাসূলের দু'আ লাভের উপায় মনে করে। বাস্তবিকই তা তাদের জন্য আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপায়, আল্লাহ তাদেরকে নিজ রহমতে দাখিল করবেন। আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (সূরা তাওবা : ৯৯)

নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাওহীদী ঝাণ্ডার নিচে আশ্রয় নেওয়ার পর থেকে বিভিন্ন জিহাদে অংশ নিতে থাকেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতের শুরুতে ফিতনায়ে মুনকিরীনে নবুওয়াত তথা ভণ্ড নবী দাবিদারদের ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মুযাইনা গোত্রের বীর মুজাহিদদের সাথে নিয়ে আমীরুল মুমিনীন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মূলশক্তি হিসেবে সুসংগঠিত হন। তাদের বিরুদ্ধে জিহাদে অংশ নিয়ে ফিতনা সৃষ্টিকারীদের পরাভূত করেন।

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিলাফতকালে তিনি এমন খিদমত পেশ করেন, যার কারণে তিনি ইসলামের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। কাদেসিয়ার যুদ্ধের পূর্ব মুহূর্তে মুসলিম সেনাপতি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কাদেসিয়া থেকে নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নেতৃত্বে কিসরা বা পারস্য সম্রাট ইয়াযদজুর্দের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য এক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। পারস্যের রাজধানী মাদায়েনে উপস্থিত হয়ে এই প্রতিনিধিদল কিসরা বা সম্রাট ইয়াযদজুর্দের সাক্ষাৎ কামনা করলে তার সাথে দেখা করার অনুমতি দেওয়া হলো।

অতঃপর দোভাষীকে ডেকে সম্রাট বলল :

'এই প্রতিনিধিদলকে জিজ্ঞাসা কর, তারা কী উদ্দেশ্যে আমাদের দেশে এসেছে এবং কী উদ্দেশ্যেই বা তারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে? তাদেরকে জানিয়ে দাও, হয়তো তোমরা আমাদের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করছ এবং আমাদের বিরুদ্ধে দুঃসাহস দেখাচ্ছ এ কারণে যে, আমরা অন্যত্র ব্যস্ত আছি এবং তোমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাতে চাইনি।'

সম্রাটের এ বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর প্রতিনিধিদলের সদস্যদের সম্বোধন করে বললেন :

'তোমরা কেউ ইচ্ছা করলে জবাব দিতে পার। আর যদি তোমরা ভালো মনে কর, তাহলে তোমাদের পক্ষ থেকে আমি এর উত্তর দিতে প্রস্তুত।'

তারা বললেন :

'বরং আপনিই এর উত্তর দিন।'

তারা সম্রাটকে সম্বোধন করে বললেন :

'আমাদের মুখপাত্র হিসেবে তিনি বক্তব্য রাখবেন। অতএব তাঁর বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শুনুন।'

অতঃপর নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করে তাঁর বক্তব্যে বলেন :

'আল্লাহ্ আমাদের ওপর করুণা করেছেন এবং আমাদের জন্য তাঁর রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি আমাদের কল্যাণের পথের সন্ধান দেন এবং সে পথে চলার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। অকল্যাণ ও পাপাচারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন এবং তা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দেন। তিনি আমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তিনি যে পথে আহ্বান জানান, যদি আমরা সে পথের অনুসারী হই, তাহলে আল্লাহ্ আমাদের দীন ও দুনিয়ার সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গল দান করবেন। তাঁর এ আহ্বানে সাড়া দেওয়ায় অতি দ্রুত আল্লাহ্ আমাদের দারিদ্র্যকে প্রাচুর্যে পরিণত করেছেন। নীচতা, হীনতা, অসম্মানের বদলে ইজ্জত ও সম্মান দিয়েছেন। পরস্পরের শত্রুতা ও হানাহানিকে ভ্রাতৃত্ব ও আন্তরিকতায় রূপান্তরিত করেছেন। তিনি আমাদের আরও নির্দেশ দেন :

'আমরা যেন মানুষকে কল্যাণের পথে আহ্বান জানাই এবং আমাদের প্রতিবেশীদের থেকে তা আরম্ভ করি।'

অতএব আমরা আপনাদেরকেও আমাদের আদর্শ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাচ্ছি। ইসলাম এমন এক জীবন বিধান, যা মানবকল্যাণের সমস্ত কর্মকাণ্ডকে কল্যাণ ও সম্মানের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার প্রেরণা দেয়। ইসলাম মানবতার অকল্যাণ ও ক্ষতিকর সমস্ত মত ও পথকে ঘৃণা করে এবং তা থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোর নির্দেশ দান করে। ইসলাম তার অনুসারীদের মিথ্যা ও কুফরীর শৃঙ্খল হতে মুক্তি দিয়ে ন্যায়, মানবতা ও ঈমানের আলোর পথে পরিচালিত করে। আপনারা যদি আমাদের এ আহ্বানে সাড়া দিয়ে তা গ্রহণ করেন, তাহলে জীবনবিধান হিসেবে আপনাদের জন্য আল কুরআনকে রেখে যাব এবং আল কুরআন বোঝার ও তা অনুসরণ করার জন্য এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেব যেন এর নির্দেশমতো রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারেন।

অতঃপর পরকালের জবাবদিহিতা ও খোদাভীতির ওপর আপনাদের ন্যস্ত করে আমরা প্রত্যাবর্তন করব। আর যদি আপনারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন, তাহলে আমরা আপনাদের থেকে 'জিযিয়া'[১] গ্রহণ করব এবং আপনাদের নিরাপত্তা বিধান করব। আর যদি 'জিযিয়া' প্রদানে অস্বীকৃতি জানান, তাহলে আমরা আপনাদের বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব।

এ কথা শুনে সম্রাট ইয়ায্‌দ্‌জুর্দ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে বলল :

'তোমাদের চেয়ে নিকৃষ্টতম, দুর্দশাগ্রস্ত, আত্মকলহে লিপ্ত ও ঘৃণিত ক্ষুদ্র কোনো জাতি এ পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। আঞ্চলিক করদ রাজ্যপ্রধানদের দ্বারাই তোমাদের ওপর আমাদের প্রভাববলয় বিদ্যমান ছিল। তোমাদের করায়ত্ত ও অধীনস্থ রাখার জন্য তারাই যথেষ্ট।'

অতঃপর একটু শান্ত হয়ে আবার বলল :

'অভাবের তাড়নাই যদি তোমাদেরকে আমার দরবারে উপস্থিত হতে বাধ্য করে থাকে, তাহলে আমি আমার কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিচ্ছি, তারা তোমাদের প্রতিটি পরিবারের অভাব মেটানোর জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যসামগ্রী এবং

তোমাদের নেতৃবর্গ, সরদার ও গোত্রীয় প্রধানদের জন্য কাপড়-চোপড় ইত্যাদি পৌঁছে দেবে। এ ছাড়াও আমার পক্ষ থেকে তোমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য একজন শাসক নিযুক্ত করে দিচ্ছি, যিনি তোমাদের প্রতি অতিশয় নম্র ও যত্নবান হবেন।'

প্রতিনিধিদলের জনৈক সদস্য ঘৃণাভরে সম্রাট ইয়ায্দ্জুর্দের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে তার ক্রোধ আবার বেড়ে যায় এবং বলতে থাকে :

'যদি দূত হত্যা করার মতো কোনো প্রথা থাকত, তাহলে আমি তোমাদেরকে অবশ্যই হত্যা করতাম। তোমাদের সেনাপতিকে জানিয়ে দাও :

'আমি তাকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য আমার সেনাপতি রুস্তমকে পাঠাচ্ছি। সে সেনাপতিসহ তোমাদেরকে কাদেসিয়ার গর্তসমূহে পুঁতে ফেলবে।'

অতঃপর তাদেরকে মাটি বহন করে নেওয়ার মতো অপমানকর সাজা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে বলল :

'এই প্রতিনিধিদলের মধ্যে যে সবচেয়ে সম্মানী, তার মাথায় মাটির একটি ডালা উঠিয়ে দাও এবং এ অবস্থায় বিভিন্ন অলিগলিতে উপস্থিত জনগণের সম্মুখ দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রাজধানীর প্রধান ফটক দিয়ে এদের এমনভাবে বিদায় কর, যেন উচিত শিক্ষা নিয়ে যায়।'

তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করা হলো :

আপনাদের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানী ব্যক্তি কে?

আসেম বিন উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কালবিলম্ব না করে সামনে অগ্রসর হয়ে বললেন :

'আমি!'

অতঃপর তারা তাঁর মাথায় মাটির ডালা উঠিয়ে দিল। তিনি এ মাটির ডালা বহন করে এনে তাদের উটের কাছে পৌঁছলেন এবং বহন করে মুসলিম বাহিনীর সেনাপতি সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিকটে এলেন ও তাঁকে এ সুসংবাদ দিলেন যে :

'আল্লাহ অবশ্যই মুসলমানদেরকে পারস্য সাম্রাজ্য বিজয় করাবেন এবং তাদেরকে এ দেশের ভূমির মালিক বানিয়ে দেবেন।'

তারপর কাদেসিয়ায় পারস্য সম্রাটের বিশাল বাহিনীর সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ হয়। কাদেসিয়া প্রান্তরের গভীর গর্ত ও খালবিলগুলো পারস্য সম্রাটের সৈন্য বাহিনীর হাজার হাজার লাশের স্তূপে ভরাট হয়ে যায়। এ যুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানিতে মুহ্যমান পারস্য সম্রাট প্রতিশোধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ ও রণ-প্রস্তুতিতে উন্মাদ হয়ে উঠল। তার এ যুদ্ধবিধ্বস্ত বাহিনীকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করার সিদ্ধান্ত নিল। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সে দেড় লাখ সশস্ত্র সৈন্যের বিরাট বাহিনী যুদ্ধের জন্য সম্পূর্ণ তৈরি করে ফেলল। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে পারস্য সম্রাটের এ বিরাট বাহিনীর রণ-প্রস্তুতির সংবাদ পৌঁছল। তিনি নিজেই সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তার মোকাবেলা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন; কিন্তু 'মজলিসে শূরা' তাঁর এ মুহূর্তে মদীনায় উপস্থিত থাকার গুরুত্ব অনুভব করে তাঁকে সে ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে অনুরোধ জানালেন যে :

'এ গুরু দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়ার জন্য এমন একজন যোগ্য সেনাপতি খুঁজে বের করুন, যার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মজলিসে শূরার অনুরোধ মেনে নিয়ে বললেন :

'তাহলে আপনারাই পরামর্শ দিন যে, এমন কে হতে পারে, যাকে এ বিরাট দায়িত্বে নিয়োজিত করা যেতে পারে?'

তাঁরা বললেন :

'আমীরুল মু'মিনীন! আপনিই তো আপনার সেনাবাহিনীর ব্যাপারে ভালো জানেন যে, তাদের মধ্যে কাকে এ গুরুত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য নিযুক্ত করা যেতে পারে!'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চিন্তা-ভাবনার পর বললেন :

'আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি এমন একজনকে এ অভিযানের জন্য সেনাপতি নিযুক্ত করতে চাই, যিনি শত্রুবাহিনীকে পরাস্ত করে বিজয় ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হবেন। অতীতের যে কোনো সেনাপতির চেয়ে তার সাফল্যই হবে সর্বোত্তম। তিনি হলেন :

'আন নু'মান ইবনে মুকাররিন আল মুযান্নী।'

সবাই বলে উঠলেন :

'হ্যাঁ, এ কাজের জন্য তিনিই উপযুক্ত।'

জিহাদরত নু'মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর প্রতি আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নির্দেশ পাঠালেন এই ভাষায় :

'সালামান্তে

আমি অবগত হয়েছি যে, সুসজ্জিত বিপুলসংখ্যক পারস্য সৈন্য আপনাদের তথা ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে 'নাহাওয়ান্দে' সমবেত হয়েছে। আমার এ নির্দেশনামা পাওয়া মাত্রই আপনি আপনার বাহিনীসহ আল্লাহর নির্দেশ পালনার্থে ও তাঁরই ওপর ভরসা করে তাঁরই সাহায্যের আশায় শত্রুবাহিনীর মোকাবেলা করার জন্য রওয়ানা হোন। মনে রাখবেন, আপনার বাহিনীকে নিয়ে অসাধ্য ঝুঁকিপূর্ণ এমন কোনো পথে রওয়ানা হবেন না, যা অতিক্রম করা তাদের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। কারণ, এক লক্ষাধিক স্বর্ণমুদ্রার চেয়েও একজন মুসলমানের জীবন আমার নিকট শ্রেয়। ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহ।'

নির্দেশ পাওয়া মাত্র নু'মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাহিনীকে নিয়ে বিশাল শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার জন্য রওয়ানা হলেন। যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে অশ্বারোহীর একটি ক্ষুদ্র দলকে 'নাহাওয়ান্দ' শহরে প্রবেশের পথঘাটসমূহ এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করলেন। 'নাহাওয়ান্দ' শহরের অদূরে তাদের ঘোড়া হঠাৎ থমকে গেল। তারা জোরে চাবুক মারার পরও ঘোড়াগুলো সামনে অগ্রসর হতে পারছিল না। রণক্ষেত্রের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এই খ্যাতনামা তেজী ঘোড়াগুলো কেন সম্মুখে অগ্রসর হতে পারছে না, তা জানার জন্য ঘোড়ার পিঠ থেকে অশ্বারোহীরা নেমে পড়লেন। তারা দেখতে পেলেন বিশেষ ধরনের তৈরী লোহার পাত-পেরেক যা বিটুমিন-এর সাথে কার্পেটিংয়ের মতো রাস্তায় বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেসব ঘোড়াগুলোর পায়ে বিঁধে যাচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও ঘোড়াগুলো তা অতিক্রম করতে সক্ষম হচ্ছে না। পারস্য বাহিনী তাদের নিরাপত্তার জন্য 'নাহাওয়ান্দ' শহরে পৌঁছার সমস্ত পথে লোহার এসব পাতজাতীয় পেরেক বিছিয়ে রেখেছে, যেন পদাতিক বা অশ্বারোহী বাহিনীর যে কোনো অভিযান ব্যর্থ হয়ে যায়। অশ্বারোহী বাহিনী 'নাহাওয়ান্দ' শহরকে এ ধরনের দুর্ভেদ্য ও বহির্জগতের সাথে বিচ্ছিন্ন করে রাখার সংবাদ জানিয়ে নু'মান ইবনে মুকাররিনের নিকট পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন।

নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁদের সেখানেই অবস্থান নেওয়ার নির্দেশ দিলেন এবং প্রতি রাতে বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে আলোকিত করার উপদেশ দিলেন। 'নাহাওয়ান্দ' শহরে অবস্থানরত শত্রুবাহিনী তা যেন ভালো করে দেখতে পায়। মুসলিম বাহিনীকে এমন এক কৌশল গ্রহণ করতেও নির্দেশ দিলেন যাতে শত্রু বাহিনী মনে করে :

'বেশ কিছুদিন অবস্থানের পর আমাদের বিছানো পেরেকের দুর্ভেদ্য সীমা অতিক্রম করতে না পেরে এবং 'নাহাওয়ান্দ' শহরে প্রবেশে ব্যর্থ হয়ে মুসলিম সৈন্যরা পালিয়ে যাচ্ছে।' মুসলিম অশ্বারোহী বাহিনীর পরাজয় ও পলায়ন সংবাদে নিশ্চিত হয়ে যেন তারা মুসলিম বাহিনীকে পিছন থেকে আক্রমণের লক্ষ্যে নিজেরাই নিজেদের রাস্তা পরিষ্কার করতে বাধ্য হয়।'

নু'মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ কৌশল সফল হলো। যখন পারস্য বাহিনী দেখল যে, বেশ কিছুদিন অবস্থান নেওয়ার পর অশ্বারোহী মুসলিম বাহিনী পরাজিত ও ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নের পথ বেছে নিয়েছে, তখন তারা নিজেরাই নাহাওয়ান্দে পৌঁছার রাস্তায় বিছানো পেরক পরিষ্কার করে ফেলে। তাদের পথগুলো তারা নিজেরাই পেরেকমুক্ত করামাত্রই নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শত্রুবাহিনীর ওপর হঠাৎ আক্রমণের সিদ্ধান্ত নেন ও সংকেতস্বরূপ তিনবার আল্লাহু আকবার ধ্বনি উচ্চারণ নির্ধারণ করে বলেন :

'আমি যখন প্রথম তাকবীরধ্বনি উচ্চারণ করব, তখন তোমাদের যারা তখনো পর্যন্ত অপ্রস্তুত তারা দ্রুত প্রস্তুতি গ্রহণ করবে। দ্বিতীয় তাকবীরধ্বনির সাথে সাথে প্রত্যেকেই তার হাতিয়ার আক্রমণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুত করে নেবে এবং তৃতীয় তাকবীরধ্বনির সাথে সাথেই আমি আল্লাহর দুশমনদের ওপর আক্রমণের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ব, আমার সাথে তোমরা সবাই আক্রমণ চালাবে।'

সিদ্ধান্ত মোতাবেক পর্যায়ক্রমে তিন বার তাকবীরধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে শত্রুবাহিনীর ওপর বজ্রপাতের ন্যায় বীরবিক্রমে আক্রমণ চালালেন। দেখতে না দেখতেই তাঁর পেছনে মুসলিম বাহিনী ঝড়ের বেগে শত্রুবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। উভয় বাহিনীর মধ্যে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। যুদ্ধের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ যুদ্ধ খুব কমই হয়েছে। মুসলিম বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ পারস্য বাহিনীকে

ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। অগণিত পারস্য সৈন্য মুসলিম বাহিনীর হাতে প্রাণ হারাল। পারস্য বাহিনীর লাশে শহরের পাহাড়ি টিলা থেকে সমতল ভূমি, পুকুর, ডোবা ও নালা-নর্দমা সব একাকার হয়ে গেল। পথঘাট, অলিগলি ও রাজপথ শত্রুদের রক্তের স্রোতে পিচ্ছিল হয়ে গেল।

আক্রমণের চরম এক পর্যায়ে মুসলিম সেনাপতি নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘোড়ার পা প্রবাহিত রক্তের পিচ্ছিল পথে সটকে গেলে শত্রুবাহিনীর আক্রমণের মুখে তিনি মারাত্মকভাবে আহত হয়ে শাহাদাত বরণ করলেন। তৎক্ষণাৎ মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ভাই তাঁর হাত থেকে সেনাপতির ঝাণ্ডা নিজ হাতে নিয়ে তাঁরই চাদর দিয়ে তাঁর মৃতদেহকে ঢেকে দিলেন। যুদ্ধরত মুসলিম সৈন্য বাহিনীকে তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর শাহাদাতের সংবাদ প্রচার থেকে বিরত থাকলেন। মুসলিম সৈন্য বাহিনীর এই বিরাট সাফল্য ও বিরাট বিজয় ইসলামের ইতিহাসে 'মহাবিজয়' নামে খ্যাতি লাভ করে।

বিজয়ের পর মুসলিম বাহিনী তাদের প্রাণপ্রিয় সেনাপতি নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ধন্যবাদ জানাতে এলে তাঁকে না দেখে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। তাঁর ভাই তখন নু'মান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লাশের ওপর থেকে তাঁর চাদরখানা তুলে নিয়ে বললেন :

> 'ইনিই তোমাদের আমীর ও সেনাপতি।'
>
> আল্লাহ বিজয় দানের মাধ্যমে তাঁর চক্ষুদ্বয়কে শীতল করে দিয়েছেন এবং শাহাদাতের মাধ্যমে তাঁর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তাঁকে ধন্য করেছেন।'

---

নু'মান ইবনে মুকাররিন রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ : ৮৭৪৫ নং জীবনী দ্রষ্টব্য।
২. ইবনুল আছীর : ২য় খণ্ড, ২১১ পৃ : ৩য় খণ্ড, ৭ পৃ :।
৩. তাহযীবুত তাহযীব : ১০ম খণ্ড, ৪৫৬ পৃ :।
৪. ফুতুহুল বুলদান : ৩১১ পৃ :।
৫. শারহে আলফিয়াতুল ইরাকী : ৩য় খণ্ড, ৭৬ পৃ:।
৬. আল ইলাম : ৯ম খণ্ড, ৯ পৃ :।
৭. আল কাদেসিয়া : ৬৬-৭৩ পৃ : দারুন নাফায়েস, বৈরূত।

# সুহাইব আর রূমী (রা)

*'হে আবূ ইয়াহ্ইয়া! কী সর্বোত্তম লাভেই না বিক্রি করেছ .....!*
*কী সর্বোত্তম লাভেই না তোমার বিক্রি!' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

সুহাইব আর রূমী...

ইসলামী দুনিয়ায় মুসলমানদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে সুহাইব আর রূমীর পরিচয় জানে না এবং তাঁর জীবনের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে কিছুই শোনেনি! আমাদের অনেকেই যে বিষয়টি জানে না তা হলো, সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রকৃতপক্ষে রোমান নন; বরং তিনি ছিলেন আরব বংশোদ্ভূত। তাঁর পিতা ছিলেন নুমাইর গোত্রের এবং মাতা ছিলেন তামীম গোত্রের সদস্যা। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে রোমান হিসেবে সম্বোধন করার পিছনে একটি ঘটনা বিদ্যমান, যা যুগ যুগ ধরে ইতিহাসের পাতা ধারণ করে আসছে। বহু পুস্তকেও এ ঘটনা বিধৃত। ঘটনাটি হলো :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতপ্রাপ্তির প্রায় দুই দশক পূর্বের কথা। পারস্য সম্রাট কিসরার পক্ষ থেকে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পিতা সিনান ইবনে মালেক আন নুমাইরিকে আল উবুল্লার গভর্নর নিযুক্ত করেন। তার সন্তানদের মধ্যে পাঁচ বছরের শিশু সুহাইব ছিল তাঁর অত্যধিক প্রিয়। সুহাইবের চেহারা ছিল হাস্যোজ্জ্বল, মাথার চুল লাল, স্বভাব ছিল বুদ্ধিদীপ্ত ও চটপটে। তাঁর দুটি চোখ যেন বুদ্ধিমত্তা ও আভিজাত্যের জ্যোতি ছড়াত। সন্তানের এই সুন্দর ও নিষ্পাপ চেহারার দিকে তাঁর পিতা যখন তাকাতেন, তখন তিনি যে

কোনো দুশ্চিন্তামুক্ত হতেন। একদা কোলের এই সন্তান সুহাইবকে নিয়ে তাঁর মা নিকটাত্মীয় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের পরিবার ও খাদেমদের সঙ্গে ইরাকের 'আসসানিয়া' গ্রামে বিনোদনের উদ্দেশ্যে যান। রাতে সে গ্রামেই রোমান সৈন্যদের একটি দল আক্রমণ করে। তারা গ্রামের নিরাপত্তারক্ষীদের হত্যা করে সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং গ্রামবাসীদের বন্দী করে দাসে পরিণত করে। তারা সুহাইবকেও বন্দী করে নিয়ে যায় এবং রোম সাম্রাজ্যে দাস ক্রয়-বিক্রয়ের বাজারে নিয়ে তাকে বিক্রি করে। এভাবেই এই শিশুর বেচাকেনা চলতে থাকে এবং একের পর এক মালিক পরিবর্তন হতে থাকে। অন্যান্য ক্রীতদাসের মতো এক মনিবের খিদমত থেকে অন্য মনিবের খিদমতে সে নিয়োজিত হতে থাকল। মনিবের হাত পরিবর্তনের কারণে সুহাইব আর রূমীর সে সমাজব্যবস্থার রন্ধ্রে রন্ধ্রে কী ঘটছে তা দেখার এবং এর ভেতরে কী ঘটছে তা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ হয়।

রোমান সম্রাট ও তাঁর অমাত্যবর্গের বালাখানা ও চিত্তবিনোদন কেন্দ্রসমূহে কী ধরনের নৈতিকতাবিরোধী কার্যকলাপের মহড়া হতো, তিনি তা খুব ভালো করেই প্রত্যক্ষ করেন এবং স্বীয় কানে শুনতেন অমানবিক ও অনৈতিক নানা কাহিনী। সুহাইব আর রূমী সে সমাজব্যবস্থার প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করতেন ও ধিক্কার দিতেন। সে সমাজব্যবস্থা থেকে লব্ধ তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর মনকে দারুণভাবে বিষিয়ে তোলে। তিনি মনে মনে বলতেন :

> 'মানবতাবিরোধী, রোগাক্রান্ত, বিধ্বস্ত আমাদের এ সমাজ কোনো তুফান ছাড়া সংশোধন হওয়ার নয়।'

সুহাইব আর রূমী রোম সাম্রাজ্যের বালাখানাসমূহে প্রতিপালিত হন। সে সমাজের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির মাঝে বেড়ে ওঠেন। এমনকি তিনি তাঁর মাতৃভাষাও প্রায় ভুলে যান। কিন্তু তিনি ভুলে যাননি যে, তিনি আরব সন্তান ও মরুভূমির অধিবাসী। তিনি একথাও ভুলে যাননি যে, তিনি ধন-সম্পদের মতো লুণ্ঠিত এক মানুষ, যাকে ক্রয়-বিক্রয়ের মাধ্যমে বালাখানা পর্যন্ত পৌছানো হয়েছে। তিনি প্রতি মুহূর্তেই দাসত্বমুক্তির চিন্তা করতেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় থাকতেন। সর্বদা তিনি আত্মীয়-স্বজনদের সাথে মিলিত হওয়ার আশায় ব্যাকুল ছিলেন। আরবের মরুভূমির দিকে প্রত্যাবর্তন করার আগ্রহ তাঁর প্রবল থেকে প্রবলতর

হতে থাকে। একদিন তিনি রোমান এক পাদ্রিকে অপর এক খ্রিস্টান গোত্রপতিকে উদ্দেশ্য করে বলতে শোনেন :

'সে সময় নিকটবর্তী হচ্ছে, যখন আরব ভূখণ্ডের মক্কা নগরীতে এমন একজন নবীর আবির্ভাব হবে, যিনি ঈসা আলাইহিস সালামের রিসালাতের সত্যতার সাক্ষ্য দেবেন এবং বিশ্ববাসীকে অন্ধকার থেকে আলো ও হেদায়াতের দিকে নিয়ে আসবেন।'

সুযোগ বুঝে একদিন সুহাইব তাঁর মনিবের শৃঙ্খল ছিন্ন করে গোটা পৃথিবীর আশ্রয় কেন্দ্র, নবীর আবির্ভাবস্থল মক্কা বা 'উম্মুল কুরা'র উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন।

মক্কায় পৌঁছে সেখানেই বসবাস করতে থাকলেন। রোমানদের মতো ভাঙা ভাঙা আরবী উচ্চারণে কথা বলতে এবং মাথায় ফুরফুরে লাল চুল দেখে তাঁকে অনেকে সুহাইব আর রূমী নামে ডাকত। সুহাইব আর রূমী মক্কায় পৌঁছে মক্কার এক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে জুদআনের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ব্যবসায়-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করে প্রচুর ধন-দৌলতের মালিক হন। ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যস্ততা ও দৈনন্দিন নানা পেরেশানী থাকা সত্ত্বেও সেই খ্রিস্টান পাদ্রির ভবিষ্যদ্বাণীর কথা তিনি মোটেও ভুলে যাননি। যখনই সে কথা তাঁর স্মরণ হতো, তখনই তাঁর মন নবীর সন্ধানে সক্রিয় হয়ে উঠত। সেই নবীর আবির্ভাব কবে হবে? এ প্রশ্নের উত্তর নিজের মাঝেই খুঁজতেন। তাঁকে আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে হলো না। তাঁর মন দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল।

বিদেশে লম্বা বাণিজ্য সফরশেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে তিনি শুনতে পেলেন :

'মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহকে নবী হিসেবে আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। তিনি মানুষকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার আহ্বান জানাচ্ছেন। তাদের ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন এবং অশ্লীল ব্যভিচার ও অন্যায় কাজ করতে নিষেধ করছেন।'

সুহাইব আর রূমী তাদের জিজ্ঞাসা করলেন :

'তিনি কি 'আল আমীন' নামে খ্যাত সেই ব্যক্তি নন ?'

তারা বলল :

'হ্যাঁ, তিনিই সেই ব্যক্তি।'

সুহাইব তাদের জিজ্ঞাসা করলেন :

'তার বাড়ি কোন্ স্থানে?'

তারা তাঁকে জানাল :

'সাফা পর্বতের পাদদেশে আরকাম ইবনে আবিল আরকামে।'

সাথে সাথে তারা সুহাইবকে এ বলেও সতর্ক করে দিল :

'সাবধান! কুরাইশদের কেউ যেন তোমাকে দেখে না ফেলে। যদি তাদের কেউ তাঁর সাথে কথা বলতেও দেখে ফেলে, তাহলে কিন্তু তোমাকে ভীষণ নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হবে। যেহেতু তুমি একজন অসহায় বিদেশি লোক, তাদের অত্যাচার থেকে এখানে তোমাকে সাহায্য করার বা আশ্রয় দেওয়ার কেউ নেই। তাই পরিণাম সম্পর্কে সজাগ থেকো।'

তারপর কোনো এক প্রত্যুষে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে এদিক-সেদিক দেখতে দেখতে সুহাইব 'দারুল আরকামে' গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে পৌঁছে দরজায় আম্মার ইবনে ইয়াসারকে দেখতে পান। পূর্ব থেকেই তার সাথে পরিচয় ছিল, তা সত্ত্বেও আতঙ্কিত হলেন, একটু ইতস্তত করে তার কাছে পৌঁছে প্রশ্ন করলেন :

'আম্মার! তুমি এখানে কী উদ্দেশ্যে? আম্মার ইবনে ইয়াসার তাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন। আমি এখানে কী চাই সেটা পরের কথা, আগে তুমিই বল যে, তুমি এখানে কী উদ্দেশ্যে এসেছ?'

সুহাইব উত্তর দিলেন :

'এ ব্যক্তি কী বলেন তা শোনার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।'

আম্মার বললেন :

'আমিও একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছি।'

সুহাইব তাঁকে প্রস্তাব দিলেন :

'তাহলে আল্লাহর রহমতে আমরা এক সাথে তাঁর সাথে দেখা করতে ভেতরে প্রবেশ করি।'

আম্মার ইবনে ইয়াসার ও সুহাইব ইবনে সিনান আর রূমী একত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য 'দারুল আরকামে' প্রবেশ করলেন।

উভয়েই তাঁর কথাবার্তা মনোযোগ সহকারে শুনলেন। তাঁর আলোচনায় উভয়েই সকল জিজ্ঞাসার উত্তর পেলেন। হৃদয় ঈমানী নূরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উভয়েই একত্রে তাদের দু'হাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে সম্প্রসারণ করলেন এবং এক সঙ্গে বলে উঠলেন :

> 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।'

অতঃপর উভয়েই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে সারাদিন কাটালেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াতে, ঈমানী বলে বলীয়ান হলেন। রাত ঘনিয়ে এল, ধীরে ধীরে চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রাতের আঁধারে উভয়েই নবীজীর তাওহীদী তা'লীমে ঈমানের আলোকবর্তিকায় পরিতৃপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমত থেকে নিজ নিজ গৃহে ফিরে এলেন।

বেলাল, আম্মার, সুমাইয়া, খাব্বাবসহ অন্যান্য সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহুমের মতো সুহাইব আর রূমীকেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনার অপরাধে কুরাইশদের নির্মম ও অমানবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সবকিছু অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে সহ্য করেন। এ কথা তিনি ভালো করেই জানতেন যে, আখেরী মানযিল যাদের জান্নাত, তাদের জন্য নির্যাতন অবধারিত। এ মানযিলে পৌঁছতে হলে আঘাতের পর আঘাত, নির্যাতনের পর নির্যাতন আসবেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের মদীনায় হিজরত করার অনুমতি দিলে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সাথে মদীনায় হিজরত করে আসার মনস্থ করেন। কিন্তু কুরাইশরা তাঁর হিজরতের এই মনোবাসনা আঁচ করতে পেরে তাঁর পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরা সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর

সার্বক্ষণিক পাহারা নিযুক্ত করে, যেন তিনি তার উপার্জিত সোনা-দানা ও ধনসম্পদ নিয়ে হিজরত করার সুযোগ না পান।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথী আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর হিজরতের পর সর্বদাই তিনি হিজরতের অপেক্ষায় থাকেন। কিন্তু কোনো ক্রমেই তাঁর জন্য হিজরত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। কারণ, তাঁর জন্য নিয়োগকৃত গুপ্তচরদের বিনিদ্র সতর্ক দৃষ্টি এবং পাহারাদারদের নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী এড়িয়ে হিজরত করা সম্ভব ছিল না। প্রচণ্ড শীতের এক গভীর রাতে সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আমাশয়ে আক্রান্ত রোগীর ন্যায় বারবার বাইরে যেতে থাকলেন এবং খামাখা সেখানে কালক্ষেপণ করতে লাগলেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁকে খুঁজতে না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত সেখানেই বসে থাকতে লাগলেন। তাঁকে আমাশয় আক্রান্ত অবস্থায় দেখে পাহারাদারগণ পরস্পর বলাবলি করতে লাগল যে :

'তোমরা নিশ্চিত থাক, সে নিশ্চিয়ই লাত ও উযযা দেবতার অভিশাপের শিকার হয়েছে।'

অতঃপর তাঁকে ডেকে আনার পরিবর্তে এ অবস্থায় রেখে নিজ নিজ বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। এ সুযোগে সুহাইব তাদের হাত থেকে সটকে পড়েন এবং মদীনার উদ্দেশ্যে দৌড়াতে থাকেন; কিন্তু কিছুদূর যেতে না যেতেই হঠাৎ তাদের ঘুম ভেঙে যায় এবং তাঁকে খোঁজাখুঁজি করে না পেয়ে তারা সবচেয়ে দ্রুতগামী ঘোড়া নিয়ে তাঁর অনুসরণ করতে থাকে। এমনকি শেষ পর্যন্ত পাহারাদারগণ তাঁকে ঘিরে ফেলে। তিনি এমতাবস্থায় পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়িয়ে তীরের থলি থেকে তীরগুলো বের করে অবস্থানুয়ায়ী তা মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েই একটি ধনুকে স্থাপন করে তাদের দিকে তাক করে ধরে তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চৈঃস্বরে বলতে থাকেন :

'হে কুরাইশ সম্প্রদায়ের লোকেরা! তোমরা আমার তীর চালনা সম্পর্কে খুব ভালো করেই জান এবং আমিও আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি লক্ষ্যে আঘাত হানতে পারদর্শী একজন শ্রেষ্ঠ তীরন্দাজ। আল্লাহর কসম! তোমরা কখনো আমার কাছে আসতে চেষ্টা করবে না, আমার থলির প্রতিটি তীর দ্বারা তোমাদের এক একজনকে হত্যা করব। তার পর যারা অবশিষ্ট থাকবে তাদেরকে তরবারি দ্বারা খতম করব।'

তার মরণপণ চ্যালেঞ্জ শুনে একজন বলে ফেলল :

'হে সুহাইব! তুমি নিঃসহায় কপর্দকহীন অবস্থায় মক্কায় এসে অঢেল সম্পদের মালিক হয়েছ, আমরাও কসম করে বলছি, আজ তোমাকে বীরের মতো জান ও মাল নিয়ে আমাদের হাত থেকে যেতে দেব না।'

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাদের মনোভাব টের পেয়ে তৎক্ষণাৎ বললেন :

'আমি যদি আমার অর্থ-সম্পদ তোমাদের দিয়ে দেই, তাহলে কি আমাকে যেতে দেবে?'

তারা উত্তর দিল :

'হ্যাঁ, তাহলে তুমি যেতে পারবে।'

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মক্কায় তাঁর বাড়িতে সোনা-দানা গচ্ছিত রাখার স্থানের কথা তাদের বলে দিলেন। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন মক্কায় চলে গেল। নির্দিষ্ট স্থানে তারা সম্পদ পেয়ে গেল এবং তাকে নির্বিঘ্নে চলে যেতে দিল। সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর জীবনের কষ্টার্জিত অগাধ সম্পদ পেছনে ফেলে নিশ্চিন্তে ও নির্বিঘ্নে এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাঁর দীন নিয়ে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের লক্ষ্যে মদীনার দিকে রওয়ানা হলেন। দীর্ঘপথ চলতে চলতে যখনই ক্লান্ত ও নিস্তেজ হয়ে পড়তেন, তখনই তাঁর মনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও তাঁর সাথে মিলিত হওয়ার কথা চিন্তা করে তাঁর নিস্তেজ দেহে সতেজতা ফিরে পেতেন এবং নব-উদ্যমে আবার পথ চলা আরম্ভ করতেন

মদীনার প্রবেশপথ 'কুবায়' পৌঁছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আগমন করতে দেখে অত্যন্ত খুশি হন এবং বলেন :

رَبِحَ الْبَيْعُ يَا اَبَايَحْيى رَبِحَ الْبَيْعُ -

'হে আবূ ইয়াহ্ইয়া! কী সর্বোত্তম লাভেই না বিক্রি করেছ? কী সর্বোত্তম লাভে তোমার বিক্রি।'

পরপর তিন বার তিনি তা পুনরাবৃত্তি করেন। এ কথা শুনে ক্লান্ত সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। অতঃপর সুহাইব রাদিয়াল্লাহু

তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন :

'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার আগে মক্কা থেকে না কেউ আপনার খিদমতে এসেছে, আর না এ সংবাদ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ছাড়া অন্য কেউ আপনাকে দিয়েছে।'

নিঃসন্দেহে আল্লাহর পথে তাঁর জান ও মালের বিক্রি সত্য ও ন্যায়ের পথে এক নজিরবিহীন উদাহরণ। যার সত্যতা আল্লাহ ওহী অবতীর্ণ করে নিশ্চিত করেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম সাক্ষ্য প্রদান করে তার গুরুত্বকে আরো বাড়িয়ে দেন।

সুহাইব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর শানে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে মাজীদে বলেন :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَءُوْفٌ بِالْعِبَادِ ـ

'এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নিজেকে বিক্রি করে থাকে। আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি বড়ই সদয়।' (সূরা বাকারা : ২০৭)

সুহাইব বিন সিনান আর রূমী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর নিজেকে সর্বোত্তম দামে আল্লাহর কাছে বিক্রি করার জন্য তাঁকে হাজার সালাম।'

---

সুহাইব বিন সিনান আর রূমী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. আল ইসাবাহ : ৪১০৪ নং জীবনী দ্রষ্টব্য।
২. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৩য় খণ্ড, ২২৬ পৃঃ।
৩. উসদুল গাবাহ : ৩য় খণ্ড, ৩০ পৃঃ।
৪. আল ইসতিআব (হামেশে ইসাবা) ২য় খণ্ড, ১৭৪ পৃঃ।
৫. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ১৬৯ পৃঃ।
৬. আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৭ম খণ্ড, ৩১৮-৩১৯ পৃঃ।
৭. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৮. আল-আ'লাম ও তার সংস্করণসমূহ।

# আবূ দারদা’ (রা)

*আবূ দারদা’ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মনে-প্রাণেই দুনিয়ার ভোগবিলাস ও লোভ-লালসা পরিত্যাগ করেছিলেন।*

*–আবদুর রহমান বিন আওফ (রা)*

অতি প্রত্যুষে নিদ্রা থেকে জেগে বাড়ির প্রবেশপথে বিশেষভাবে সংরক্ষিত মূর্তিকে পূজা করা ছিল আবূ দারদা’ নামে খ্যাত উয়াইমার ইবনে মালেক আল খাযরাজীর নিত্যদিনের অবশ্য পালনীয় অভ্যাস। অভ্যাসের এই ধারাবাহিকতা থেকে সেদিনও বাদ পড়েনি, যে দিনের কথা এখানে বলা হচ্ছে। সেদিনও সে অভিজাত আতর বাজার থেকে আনা মূল্যবান সুগন্ধি দিয়ে চন্দনকাঠে তৈরি মূর্তিকে সুগন্ধময় করে তোলে। ইয়ামেনের বাজারের সর্বোৎকৃষ্ট রেশমি চাদর দিয়ে মূর্তিকে আবৃত করে। যে মূল্যবান চাদরটি ইয়ামেন থেকে আগমনকারী এক বণিক গতকালই তাকে উপহার দিয়েছিল।

সূর্য বেশ উপরে ওঠার পর আবূ দারদা’ বাড়ি থেকে বের হয়ে ব্যবসায় কেন্দ্রে রওয়ানা হওয়ার সময় দেখতে পায় মদীনার ছোট-বড় সবাই রাস্তায়, সকল বয়সের লোকজনের সমাগম খুব বেশি। কারণ কী? জানতে পারল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসারী মুসলমানরা বদর যুদ্ধ থেকে বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে আসছে। তাদের বিজয়কে অভিনন্দিত করার জন্য এতো লোকের সমাগম। কিছুক্ষণ পরই দেখতে পেল বিজয়ীরা শহরে প্রবেশ করছে এবং কুরাইশ বন্দীদের দলবদ্ধভাবে শৃঙ্খলিত করে আনা হচ্ছে। মুসলমানদের

এই বিজয় আর কুরাইশদের এই করুণ দৃশ্য দেখে আবূ দারদা' কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত না করে পাশ কাটিয়ে অগ্রসর হতেই খাযরাজ গোত্রের এক যুবক তার নজরে পড়ে। আবূ দারদা' সেই যুবকের দিকে অগ্রসর হয়ে তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। খাযরাজ গোত্রের সেই যুবক আবূ দারদা'কে সংবাদ দেয় যে,

> 'বদর প্রান্তরে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে চরম বিপদের সম্মুখীন হন। পরিশেষে খুব বাহাদুরী ও নৈপুণ্যের সাথেই যুদ্ধ করে শুধু বীরত্বের পরিচয়ই দেননি; বরং প্রচুর গনীমতের মালসহ নিরাপদেই ফিরে এসেছেন। তার সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।'

খাযরাজ গোত্রের সেই যুবক আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সম্পর্কে আবূ দারদা'র জিজ্ঞাসায় মোটেই অবাক হয়নি। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ও আবূ দারদা'র মধ্যে গভীর বন্ধুত্বের কারণে পরস্পরের ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কথা সবাই জানত। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছলে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ইসলাম গ্রহণ করেন, আর আবূ দারদা' তা প্রত্যাখ্যান করে; কিন্তু এ দুই বন্ধুর পারস্পরিক সম্পর্কের কোনো অবনতি হয়নি। কারণ, আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা ইসলাম গ্রহণ সত্ত্বেও আবূ দারদা'র সাথে সাক্ষাৎ ও তার বাড়িতে যাতায়াত অব্যাহত রাখেন। তাকে ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার প্রচেষ্টা চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। আবূ দারদা'র কুফরী জীবন যাপনের জন্য তার এই বন্ধু খুবই ব্যথিত হতেন।

আবূ দারদা' নিজের ব্যবসায় কেন্দ্রে পৌঁছে তার উঁচু আসনে বসে যথারীতি ব্যবসায়ের কাজ শুরু করে। কর্মচারীদের আদেশ-নিষেধ পূর্বের ন্যায়ই দিতে থাকে। ব্যবসায়ের রুটিনের কোনো পরিবর্তন নেই। কিন্তু সে মোটেই জানত না যে, আজ তার বাড়িতে কী তুলকালাম কাণ্ডই না ঘটে গেছে।

আজ বিশেষ উদ্দেশ্যে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা তার বন্ধু আবূ দারদা'র বাড়ি গেলেন। তিনি জানতেন, এ সময় আবূ দারদা' বাড়িতে নেই। ভাবখানা দেখালেন এই, বিশেষ জরুরি কাজ। তার বাড়িতে পৌঁছে দেখেন, ঘরের দরজা খোলা এবং তার মা বাড়ির আঙিনায় সাংসারিক কাজে ব্যস্ত। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা সেখানে পৌঁছে বলেন :

> 'হে আল্লাহর প্রিয় বান্দী! আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।'

উত্তরে আবূ দারদা'র মা বললেন :

'হে আবূ দারদা'র ভাই, তোমার প্রতিও শান্তি বর্ষিত হোক।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা জিজ্ঞাসা করেন :

'আমার বন্ধু আবূ দারদা' কোথায়?'

আবূ দারদা'র মা উত্তরে বলেন :

'সে তার ব্যবসায় কেন্দ্রে। খুব শীঘ্রই বাড়ি ফিরে আসবে।'

আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা আবূ দারদা'র স্ত্রীকে বললেন :

'আবূ দারদা'র সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে এখানে অপেক্ষা করার অনুমতি দেবেন কি?'

তার স্ত্রী উত্তরে বলল :

'অবশ্যই!'

অতঃপর তাকে প্রবেশের সুযোগ দিল। ঘরের দরজা খুলে দিয়ে তার স্ত্রী ভিতরে সাংসারিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কখনো বা ঘর-বাড়ির কাজে মাথা ঘামাচ্ছে, আবার কখনো বা সন্তানদের দেখাশোনা ও যত্নে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। এই ফাঁকে আবদুল্লাহ্ ইবনে রাওয়াহা আবূ দারদা'র মূর্তির ঘরে প্রবেশ করেন এবং সাথে বহন করে আনা কুড়াল বের করে আবূ দারদা'র মূর্তির কাছে গিয়ে ইচ্ছেমতো সেটিকে টুকরো টুকরো করতে থাকেন। আর বলতে থাকেন :

أَلَا كُلُّ مَا يُدْعى مَعَ اللّٰهِ بَاطِلٌ ...

أَلَا كُلُّ مَا يُدْعى مَعَ اللّٰهِ بَاطِلٌ

'সাবধান! আল্লাহর সাথে অন্য যাকেই ডাকা হোক না কেন, সবই মিথ্যা। সাবধান! আল্লাহর সাথে অন্য যাকেই ডাকা হোক না কেন, সবই মিথ্যা।'

মূর্তিকে ইচ্ছেমতো টুকরো টুকরো করা শেষ হলে তিনি বিদায় নিয়ে চলে আসেন। আবূ দারদা'র স্ত্রী বিশেষ কারণে মূর্তির ঘরে প্রবেশ করতেই মূর্তিকে টুকরো টুকরো ও তার হাত-পা, কান-গলা, মাথা-মোট কথা প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্নভিন্ন দেখে যেন তড়িতাহত হয় এবং দুই হাত চাপড়িয়ে বলতে থাকে :

'হে ইবনে রাওয়াহা! তুমি আমাকে ধ্বংস করে ফেলেছ! তুমি আমাকে ধ্বংস করে ফেলেছ।'

কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই আবূ দারদা' বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে মূর্তিঘরের দরজায় বসে চিৎকার করে কাঁদতে দেখে। সে আরো দেখতে পায় যে, তার চেহারায় ভীতিভাব সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে।

আবূ দারদা' তার কাছে পৌঁছে জিজ্ঞাসা করে :

'কী হয়েছে তোমার ?'

উত্তরে সে বলল :

'তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার বন্ধু আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা আসে এবং তোমার মূর্তির কী দুরবস্থা করেছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ।'

আবূ দারদা' মূর্তিঘরের ভিতরে নজর দিয়েই দেখে যে, মূর্তিকে এমনভাবে টুকরো টুকরো করা হয়েছে যে, তা জ্বালানির কাজে ব্যবহার করা ছাড়া আর কোনো কাজে আসবে না। সে রাগে ফেটে পড়ে এবং এই কাজের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়; কিন্তু পরক্ষণেই সে একটু শান্ত হয়ে পড়লে তার প্রতিশোধস্পৃহা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ক্রোধ প্রশমিত হয়। এবার সে চিন্তা করতে লাগল, কেন এমন হলো। অতঃপর নিজে নিজেই বলে উঠল :

'যদি ওই মূর্তিতে কোনো কল্যাণ থাকত, তাহলে সে নিজেই নিজেকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারত।'

সে নিজের বিবেকের কাছেই উত্তর পেয়ে তৎক্ষণাৎ আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার কাছে চলে গেল এবং তাকে সাথে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হয়ে ইসলাম গ্রহণ করল। তিনিই ছিলেন এ মহল্লার ইসলাম গ্রহণকারী সর্বশেষ ব্যক্তি। ঈমান আনার সেই শুভক্ষণ থেকে আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি যে মহব্বত জন্মেছিল, তার মধ্যে সামান্যতম খাদও ছিল না। ঈমান আনার পর থেকেই তিনি তাঁর অতীত জীবনের জন্য বড়ই অনুতপ্ত হতে থাকেন। তাঁর অনুতাপের কারণ ছিল এই যে, তাঁর আগে যেসব সাহাবী ইসলাম গ্রহণ করেছেন, তাঁরা ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেছেন। তাঁরা কুরআন হিফ্য করেছেন, তার মর্মার্থ উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা ইবাদত করেছেন বেশি। তাকওয়া ও খোদাভীতির কারণে তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টিও হাসিল করেছেন। আমি তো তাদের থেকে বহু পেছনে আছি। জিহাদের ক্ষেত্রেও

আমি পিছিয়ে আছি। এ অনুতাপ তাঁকে প্রতি মুহূর্তে আহত করত। তিনি এ নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সিদ্ধান্ত নিলেন :

> 'যেভাবেই হোক এই ব্যবধান অবশ্যই দূর করতে হবে। এজন্য আমাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সময়কে বেশি করে কাজে লাগাতে হবে।'

এ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুরু হলো তাঁর সাধনা তথা কঠোর অধ্যবসায়। ইসলামী জ্ঞানার্জনে এবং ইসলামের কাজে তিনি নিজেকে পুরোপুরি নিয়োজিত করলেন। আল কুরআনের হিফ্য ও প্রতিটি শব্দের অর্থ এবং এর মর্ম উপলব্ধিতে নিষ্ঠার সাথে আত্মনিয়োগ করেন। যখন তিনি মনে করলেন ইবাদত-বন্দেগীতে একাগ্রতা সৃষ্টিতে তাঁর ব্যবসায়-বাণিজ্যই বাধা সৃষ্টি করছে, তখন থেকেই তিনি কোনো ইতস্তত না করে ব্যবসায়-বাণিজ্য ছেড়ে দিলেন। কেউ তাঁকে ব্যবসায়-বাণিজ্য ছেড়ে দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন :

> 'রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর ঈমান আনার পূর্বে আমি নিছক একজন ব্যবসায়ী ছিলাম। ইসলাম গ্রহণের পর চেষ্টা করছিলাম ইবাদত ও ব্যবসায়ের মধ্যে সমন্বয় করি; কিন্তু আমি যা চেয়েছিলাম তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ কারণে ব্যবসায় ছেড়ে দিয়ে ইবাদত-বন্দেগীতে নিমগ্ন হয়েছি। তিনি আল্লাহর শপথ করে বলেন : মসজিদে নববীর দরজায় আমার দোকান হোক এবং আমি মসজিদে প্রতি ওয়াক্ত নামায জামাআতের সাথে আদায় করার পরও ক্রয়-বিক্রয়ে এমনভাবে লাভবান হই যে, দৈনিক তার পরিমাণ ৩০০ স্বর্ণমুদ্রা পর্যন্ত পৌছাক, বিদ্যাচর্চা ও ইবাদত-বন্দেগীর পরিবর্তে আজ আমি এটাও পছন্দ করি না।'

অতঃপর তিনি প্রশ্নকারীর দিকে তাকিয়ে বলেন :

> আমি একথা বলি না যে, আল্লাহ্ তাআলা ব্যবসা হারাম করেছেন, কিন্তু আমি অবশ্যই তাদের মতো হতে চাই :
>
> أُحِبُّ أَنْ أَكُوْنَ مِنَ الَّذِيْنَ لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ـ
>
> 'যাদেরকে ব্যবসায়-বাণিজ্য আল্লাহর স্মরণকে ভুলিয়ে রাখে না বা গাফেল করে না।'

এর অর্থ এটা নয় যে, আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যবসায়-বাণিজ্যকে ইবাদতের অন্তরায় মনে করেছেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি দুনিয়ার

মোহ, লোভ-লালসা ও বিলাসিতাকে পরিত্যাগ করেছিলেন। জীবন ধারণের জন্য যতটুকু দরকার, এর উপরই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন।

প্রচণ্ড শীতের কোনো এক রাতে তাঁর বাড়িতে বেশ কয়েকজন মেহমান আসেন। তাদের জন্য গরম গরম খাদ্য পরিবেশন করা হয়; কিন্তু শীত নিবারণের জন্য বিছানাপত্রের কোনো ব্যবস্থা না করায় মেহমানরা নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করতে থাকেন। তাদেরই একজন আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে এ প্রয়োজনের কথা বলার জন্য উদ্যোগী হলে অপর একজন তাকে নিবৃত্ত করে বললেন :

আরে রাখো, এভাবেই রাতটা কাটিয়ে দাও; কিন্তু তা উপেক্ষা করে তিনি তাঁর কক্ষের দরজায় পৌঁছে দেখেন, আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শুয়ে এবং তাঁর স্ত্রী তাঁর কাছেই বসে আছেন। তাঁদের উভয়ের গায়েই পাতলা একখানা চাদর, যা কোনো অবস্থাতেই শীত নিবারণ করতে পারে না। সেই মেহমান আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গিয়ে বললেন :

> 'কী ব্যাপার, আমরা যেভাবে শীতবস্ত্রহীন অবস্থায় রাত কাটাচ্ছি, আপনিও দেখছি একইভাবে রাত কাটাচ্ছেন। আপনাদের শীতবস্ত্র কোথায়?'

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

> 'আমাদের আরো একটি বাড়ি আছে, সেই বাড়িতে সব পাঠিয়ে দিয়েছি। সামান্য আসবাবপত্রও যদি বাড়িতে থাকত, তাহলে তা অবশ্যই আপনাদের জন্য পাঠিয়ে দিতাম। দ্বিতীয়ত, সে বাড়িতে পৌঁছতে যে রাস্তা অতিক্রম করতে হয়, সে পথ খুবই দুর্গম। সে পথের পথিকদের মধ্যে যারা বেশি বেশি সাজ-সরঞ্জামের অধিকারী, তাদের চেয়ে যারা সামান্য ও হালকা সাজ-সামানের অধিকারী, তারাই শ্রেয়। আমরা অত্যধিক সাজ-সরঞ্জামের ওপর হালকা সাজ-সামানকে প্রাধান্য দিয়েছি, যেন সহজেই সে পথ অতিক্রম করতে পারি।'

অতঃপর মেহমানকে জিজ্ঞাসা করলেন :

> 'আমার কথার মর্মার্থ কি বুঝেছেন?'

মেহমান উত্তরে বললেন :

> 'জী, খুব ভালো করেই বুঝেছি, আমাকে উত্তম নসীহতের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।'

খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সিরিয়ার গভর্নর নিয়োগের প্রস্তাব দিলে তিনি এ প্রস্তাব বিনয়ের সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁকে রাজি করানো কঠিন হয়ে পড়ে। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ প্রস্তাবের ওপর অনুরোধের চাপ সৃষ্টি করলে তিনি শর্ত সাপেক্ষে রাজি হন এবং বলেন :

'আমাকে যদি কুরআনের এবং শরীআর শিক্ষা প্রদানসহ নামাযে ইমামতি করার অনুমতি দেন, তবেই আমি এ দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারি।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ শর্ত তিনটি মেনে নিলেন। অতঃপর আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু আনহু সিরিয়ার রাজধানী দামেশকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। সেখানে পৌঁছে তিনি দেখতে পান, দামেশকের সর্বস্তরের মানুষ ভোগবিলাসে লিপ্ত এবং ধন-দৌলতের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। তাদের এ অবস্থা দেখে আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভীষণভাবে বিচলিত ও শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তিনি জনসাধারণকে দামেশকের মসজিদে সমবেত হতে বললেন। তার আহ্বানে সবাই মসজিদে সমবেত হলে তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন :

'হে দামেশকবাসী! আমরা ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ পরস্পরে দীনী ভাই। ইসলামের শত্রুদের মোকাবেলায় আপনারাই আমার সাহায্যকারী। আমার সাথে আপনাদের হৃদ্যতা ও ভালোবাসা গড়ে তুলতে এবং আমার নসীহত গ্রহণ করতে আপনাদেরকে কে বাধা দিতে পারে? আপনাদের প্রতি আমার ওয়া'য-নসীহত অব্যাহত থাকবে সেজন্য আপনাদেরকে কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না। কেননা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকেই আমাকে ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে। আপনাদের মধ্যে যারা নির্ভরযোগ্য আলেম ছিলেন, তাদের অনেকেই ইনতিকাল করেছেন। যারা আছেন তারাও একে একে চিরতরে চলে যাবেন। আমি দেখছি, তাদের শূন্যস্থান পূরণ হবে না। কারণ, আপনারা বিদ্যাচর্চা ও ইসলামের জ্ঞান আহরণে আগ্রহী হচ্ছেন না। আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজে যে দায়িত্ব নিয়েছেন, আপনারা তা-ই পাওয়ার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করছেন। যে বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে আল্লাহ আপনাদের নির্দেশ দিয়েছেন, আপনারা সে গুরুদায়িত্বই ভুলে গিয়েছেন।

আপনাদের হলো কী? অল্পে তুষ্টির পরিবর্তে আপনারা খাবার টেবিলে এত অধিক আয়োজন করে থাকেন, যার সামান্য খেয়ে থাকতে পারেন। আপনারা এমনসব অট্টালিকা তৈরির প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, যেসব অট্টালিকায় আপনারা চিরদিন বসবাস করবেন না। এবং এমনসব উচ্চাশার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন, যার বাস্তবায়ন কখনো সম্ভব নয়। আপনাদের পূর্বে যেসব লোকেরা অঢেল সম্পদ অর্জন করেছিল এবং প্রাচুর্যের অন্বেষণে ও প্রতিযোগিতায় নেমেছিল, তাদের সম্পদের ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের অট্টালিকাসমূহ আজ বিরান ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

হে দামেশকবাসী ভাইয়েরা!

আপনাদের অতি নিকটেই হূদ আলাইহিস সালামের উম্মত 'আদ' জাতির ধ্বংসাবশেষ, যে জাতি জনবল, ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যে পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ সভ্য ও উন্নত জাতি হিসেবে পরিচিত ছিল। আজ কে এমন আছে যে, আমার নিকট থেকে মাত্র দু'দিরহামের বিনিময়ে তাদের ধ্বংসাবশেষ ক্রয় করতে প্রস্তুত?'

উপস্থিত জনগণ তার এ হৃদয়গ্রাহী আলোচনা শুনে শুধু বিমুগ্ধই হয়নি, বরং ব্যাকুল হয়ে কাঁদতে থাকে। এ কান্নার আওয়াজ মসজিদের বাইরের লোকজন পর্যন্ত শুনতে পায়।

এরপর থেকে আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দামেশকের সাধারণ সভা-সমাবেশে যোগ দিতে থাকেন। হাট-বাজারে চলাফেরা ও যাতায়াত অব্যাহত রাখেন। কেউ প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন, অজ্ঞ ও নিরক্ষরদের জ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে এবং গাফিলদের দায়িত্বসচেতন করে তুলতে বিভিন্ন মজলিস-মাহফিলে যোগ দিতেন।

একবার চলার পথে তিনি দেখতে পান, একদল লোক জড়ো হয়ে এক ব্যক্তিকে গালমন্দ ও বেদম বেত্রাঘাত করছে। তিনি তাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন :

'ব্যাপার কী?'

তারা বলল : 'সে ব্যক্তি মহা অপরাধে অপরাধী।'

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'যদি কেউ কোনো কূপে পড়ে যায়, তাহলে তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করবে না?'

তারা বলল :

'অবশ্যই।'

তিনি বললেন :

'তাহলে তাকে আর গালমন্দ ও মারধর করো না, বরং সৎ পরামর্শ দাও এবং সুন্দর জীবন যাপনের পথ দেখাও। আর আল্লাহ যে তোমাদেরকে গুনাহ থেকে রক্ষা করেছেন, তার জন্য শুকরিয়া আদায় কর।'

উত্তেজিত ব্যক্তিরা আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বলল :

'তাহলে কি আপনি তাকে ঘৃণা করেন না?'

তিনি উত্তর দিলেন :

'প্রকৃতপক্ষে সে কাজকে আমি অবশ্যই ঘৃণা করি; কিন্তু যখন সে ঐ কাজ থেকে বিরত হবে, তখন থেকেই সে আমার ভাই।'

সেই অপরাধী ব্যক্তিটি আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথাবার্তা শুনে এতই বিমুগ্ধ হল যে, তৎক্ষণাৎ তাওবা করে নতুন এক মানুষে পরিণত হলো।

এক যুবক আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খিদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করল :

'হে রাসূলুল্লাহর সাথী, আমাকে কিছু উপদেশ দিন।'

তিনি সে যুবককে বললেন :

'হে প্রিয় বৎস! গোপনে গোপনে আল্লাহকে স্মরণ কর, আল্লাহ তোমাকে তোমার বিপদ ও কঠিন মুহূর্তে স্মরণ করবেন। হে প্রিয় বৎস, তুমি পারলে আলেম হও, নচেৎ শিক্ষার্থী। তা না পারলে কমপক্ষে শ্রবণকারী হও; কিন্তু মূর্খ অজ্ঞ হয়ে থেকো না। তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রিয় বৎস, মসজিদই যেন তোমার বাড়ি হয়। কারণ, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

'মসজিদ হলো প্রত্যেক খোদাভীরু লোকের বাড়ি, যারা মসজিদকে তাদের বাড়ি বানাবে, মহান আল্লাহ তাদের প্রশান্তি ও রহমতের নিশ্চয়তা দান করবেন এবং তাদের ওপর তাঁর রহমত, অনুগ্রহ ও করুণা বর্ষণ করবেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলার নিশ্চয়তাও প্রদান করবেন।'

তিনি একদিন দেখলেন, একদল যুবক রাস্তার পাশে বসে খোশগল্প করছে এবং পথচারীদের দিকে তাকিয়ে আছে। তিনি তাদের কাছে গিয়ে বললেন :

'হে বৎসগণ! মুসলিম যুবকদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ ও পূত পবিত্র স্থান হলো তাদের নিজেদের বাসগৃহ। তাদের দৃষ্টিকে সংরক্ষণ ও নাফসকে নিয়ন্ত্রণ রাখার স্থান হলো নিজ নিজ গৃহ। তোমাদের নৈতিকতার জন্য সাংঘাতিক ধরনের অপরাধ হলো হাট-বাজার ও গমনাগমনের রাস্তায় বসে আড্ডা দেওয়া। কারণ, এ ধরনের বদ-অভ্যাস যুবকদের অকর্মণ্য করে তোলে ও তাদের নৈতিকতাকে ধ্বংস করে দেয়।'

তিনি দামেশকের গভর্নর থাকাকালীন মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর ও তাঁর স্ত্রীর কাছে এক বিশেষ দূত প্রেরণ করেন। সে দূতের মাধ্যমে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এ প্রস্তাব পেশ করেন যে, তাদের মেয়ে দারদা'কে তার ছেলে ইয়াযীদের সঙ্গে বিবাহ দিতে যেন রাজি হন। তারা মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে ইয়াযীদের সঙ্গে তাদের মেয়ে দারদা'কে বিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান এবং তার পরিবর্তে সাধারণ মুসলিম পরিবারের একজন উন্নত চরিত্রের অধিকারী দ্বীনদার আল্লাহভীরু যুবকের সঙ্গে বিয়ে দেন। আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর এ পদক্ষেপের কথা দামেশকবাসীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। সমাজের সর্বস্তরের লোকজন আলোচনা করতে থাকে যে, আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর মেয়েকে মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ছেলে ইয়াযীদের সাথে বিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সাধারণ মুসলিম পরিবারের এক ছেলের সাথে তাকে বিবাহ দিয়েছেন। কোনো এক ব্যক্তি তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তর দেন :

'আমি আমার মেয়েকে যে ধরনের ইসলামী ধ্যান-ধারণার আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলেছি, এ বিবাহ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে আমি ঠিক তার বিপরীত অবস্থা থেকে তাকে রক্ষা করেছি মাত্র।'

সে ব্যক্তি বলল :

'সেটা আবার কিভাবে?'

আবূ দারদা' তাকে পাল্টা প্রশ্ন করে বললেন :

'রাজপ্রাসাদে যখন তার সামনে সেবার জন্য ক্রীতদাসেরা সদা প্রস্তুত থাকবে এবং সে নিজেকে এমন প্রাসাদের মধ্যে দেখতে পাবে, যার ঝাড়বাতির চাকচিক্য দৃষ্টি কেড়ে নেবে, তখন তার দীন কোথায় থাকবে?'

তিনি সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন আমীরুল মুমিনীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু গোপনে তাঁর অবস্থা জানার জন্য কোনো রাতের আঁধারে গভর্নর আবূ দারদা'র বাড়িতে পৌঁছে তাঁর ঘরের কড়া নাড়লেন। ঘরের দারজা খোলা পেয়ে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়লেন। আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কারো প্রবেশের পদধ্বনি আঁচ করে উঠে দাঁড়ালে দেখেন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তাঁকে খোশ আমদেদ জানালেন এবং বসতে বললেন। মুসলিম বিশ্বের দুই মহান নেতা রাতের অন্ধকারেই একান্ত পরিবেশে পারস্পরিক আলোচনায় নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরে কুপি জ্বালানোর মতো তেল না থাকায় রাতের আঁধারে তারা একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিলেন না। এ গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার ফাঁকে উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু আনহুর 'বালিশ' কেমন, আরামদায়ক, না সাধারণ তা হাত বাড়িয়ে দেখেন। তিনি দেখতে পান যে, আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তার ঘোড়ার পিঠে ব্যবহৃত কাপড়টিকেই রাত্রিবেলা বালিশ হিসেবে ব্যবহার করছেন। উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবার আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বিছানার অবস্থা কেমন, তা হাত বাড়িয়ে দেখার চেষ্টা করেন। দেখেন, গুঁড়ো পাথর মিশ্রিত বালি সমতল করে নিয়ে একেই তিনি বিছানা বানিয়েছেন। এবার উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর লেপ-তোশকের অনুরূপভাবে খবর নিতে লাগলেন। দেখতে পেলেন যে, লেপ-তোশক বা কম্বল ইত্যাদি বলতে পাথর কণার বিছানায় তার একটি মাত্র পাতলা কম্বল যা দামেশকের প্রচণ্ড শীত প্রতিরোধের মোটেই উপযোগী নয়। এসব দেখে তিনি আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন :

'আমি কি আপনার প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য বাইতুলমাল থেকে উপযুক্ত ভাতার ব্যবস্থা করিনি? আমি কি আপনার মাসিক ভাতা যথাসময়ে আপনার কাছে প্রেরণ করিনি?

আপনার এ দুরবস্থায় আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।'

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু খালীফাতুল মুসলিমীনকে উত্তর দিলেন :

'হে খালীফাতুল মুসলিমীন! রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে হাদীসটি কি আপনার মনে পড়ে? যা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের শুনিয়েছিলেন?'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'কোন্‌টি?'

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমাদের একথা বলেননি?

لِيَكُنْ بلاغُ اَحَدِكُمْ مِّنَ الدُّنْيَا كَزَادِ رَاكِبٍ .

'দুনিয়ায় তোমাদের ধন-সম্পদ ও অর্থকড়ি যেন একজন মুসাফিরের সরঞ্জামাদির চেয়ে বেশি না হয়।'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উত্তর দিলেন :

'হ্যাঁ।'

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন :

'হে খালীফাতুল মুসলিমীন, এ সত্ত্বেও আমরা কী করছি?'

উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কথা শুনে কাঁদতে লাগলেন। তাঁর সাথে সাথে আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজেও কাঁদতে থাকলেন। অতঃপর তাদের উভয়ের কাঁদতে কাঁদতেই রাত ভোর হয়ে গেল ।

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত দামেশকবাসীদের হেদায়াতের জন্য ওয়ায-নসীহত জারি রাখেন। সর্বদাই তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক করেন। আল কুরআনের ইল্‌ম, ইসলামের চিন্তা ও দর্শন এবং

হিকমত-এর দীক্ষা দিতে থাকেন। জীবনের অন্তিম সময়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধব তাঁর শয্যাপাশে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন :

'আপনার অভিযোগ কী?'

তিনি বললেন :

'আমার গুনাহের ব্যাপারে আমি চিন্তিত।'

অতঃপর তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো :

'আপনার অন্তিম ইচ্ছা কী ?'

তিনি বললেন :

'আল্লাহর ক্ষমাই আমার অন্তিম ইচ্ছা।'

অতঃপর তাঁর আশপাশের উপস্থিত সবাইকে বললেন :

'আমাকে কালেমা তাইয়েবার তালকীন করতে থাক।

উপস্থিত লোকজন সমস্বরে কালেমা তাইয়েবার আবৃত্তি বা তালকীন করতে থাকেন। দেখতে পেলেন যে, তাঁর পবিত্র আত্মা এ দুনিয়া ত্যাগ করে ইল্লিয়্যীনের পথে রওয়ানা হয়ে গেছে।'

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইনতিকালের পর প্রখ্যাত তাবেঈ আওফ ইবনে মালিক আল আশজাঈ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু স্বপ্নে দেখেন যে :

'সুবিস্তীর্ণ সুন্দর সবুজ মাঠ, যেদিকে নজর যায় সেদিকেই শুধু সবুজ, আর সবুজ, যার মধ্যখানে চামড়া দিয়ে বিশেষভাবে তৈরি বিশালাকার একটি গম্বুজ। তার চারপাশে সাদা ও সম্মুখমুখী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো হাজার হাজার বকরির পাল, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি।'

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন :

'এসব কার?'

তাঁকে জানানো হলো :

'এসব আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর।'

অতঃপর আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেই গম্বুজ থেকে বেরিয়ে এসে তাঁকে বললেন :

'হে ইবনে মালেক, মহান আল্লাহ্ আমাদের আল কুরআনের বদৌলতে এসব দান করেছেন। তুমি যদি এ পথ ধরে আরো একটু এগিয়ে যাও, তাহলে এমন কিছু দেখতে পাবে, যা তোমার চোখ কোনো দিনই দেখেনি। এমন কিছু শুনতে পাবে, যা তোমার কান কোনো দিনই শোনেনি এবং এমন কিছু পাবে, যা কোনো দিন কল্পনাও করতে পারনি।'

ইবনে মালিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু জিজ্ঞাসা করলেন :

'হে আবূ মুহাম্মদ, এসব কার জন্য?'

তিনি বললেন :

'আল্লাহ এসব আবূ দারদা'র জন্য সজ্জিত করে রেখেছেন। কেননা, আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সত্যিকার অর্থেই এবং মনে-প্রাণেই দুনিয়ার ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসাকে পরিত্যাগ করেছিলেন এবং দুনিয়াকে তাঁর দু'হাত ও সীনা দ্বারা ধাক্কা দিয়ে দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছিলেন।'

---

আবূ দারদা' রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :


১. আল ইসাবাহ : ৬১১৭ নং জীবনী।
২. আল ইসতিআব (হামেশে ইসাবাহ) : ৩য় খণ্ড, ১৫ পৃ:, ৪র্থ খণ্ড, ১২৫৯ পৃ:।
৩. উসদুল গাবাহ : ৪র্থ খণ্ড, ১৫৯ পৃ:।
৪. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ৩০৮ পৃ:।
৫. হুসনুস সাহাবা : ২১৮ পৃ: ।
৬. সাফওয়াতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ২৫৭ পৃ:।
৭. তারীখুল ইসলাম লিযযাহাবী : ২য় খণ্ড, ১০৭ পৃ:।
৮. হায়াতুস সাহাবা : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৯. আল কাওয়াকিবুদ দুররিয়াহ : ১ম খণ্ড, ৪৫ পৃ: ।
১০. আল আ'লাম লিযিরিকলী : ৫ম খণ্ড, ২৮১পৃ:।

# যায়েদ ইবনে হারেসা (রা)

*'আল্লাহর শপথ! যায়েদ ইবনে হারেসা নেতৃত্বের জন্য অত্যন্ত যোগ্য ব্যক্তি। নিঃসন্দেহে সে আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিদের অন্যতম।' –মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)*

সু'দা বিনতে ছা'লাবা তাঁর শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয় বনূ মা'ন গোত্রে যাচ্ছিল। তাঁর সাথে ছিল শিশুপুত্র যায়েদ ইবনে হারেসা আল কা'বী। নিজ গোত্রের আবাসভূমিতে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্তে আলবাইন গোত্রের লুটতরাজকারী অশ্বারোহী বাহিনী তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। তারা তাদের অর্থ-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, উটসমূহ হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এবং লোকজনকে বন্দী করে। যাদেরকে তারা বন্দী করে নিয়ে যায়, শিশু যায়েদ ছিল তাদের অন্যতম। তারা তাকে বিক্রির জন্য উকাযের মেলায় নিয়ে আসে। সেখানে কুরাইশ বংশের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হাকিম ইবনে হাযাম ইবনে খুওয়াইলিদ চার শ' দিরহামের বিনিময়ে যায়েদ ইবনে হারেসাকে ক্রয় করে। তার সাথে সে আরো কতিপয় বালককেও ক্রয় করে তাদেরকে মক্কায় নিয়ে আসে।

হাকিম ইবনে হাযাম উকায মেলা থেকে ফিরে এলে তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য তার বাড়িতে আসেন। হাকিম ইবনে হাযাম তার ফুফু খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদকে বলেন :

> 'উকায মেলা থেকে বেশ কিছু বালক ক্রয় করে এনেছি। তাদের মধ্যে যাকে পছন্দ হয় আমার পক্ষ থেকে তাকে উপহার হিসেবে নিয়ে যান।'

খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ যায়েদ ইবনে হারেসার চেহারায় তার বুদ্ধিমত্তা ও চতুরতার নিদর্শন দেখে তাকেই নিজের জন্য পছন্দ করেন। তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বাড়িতে ফিরে আসেন। এর কিছুদিন পরেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদের বিয়ে হয়। খাদীজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মানজনক ও উত্তম একটি উপহার দেওয়ার চিন্তা করলেন। কিন্তু বালক যায়েদ ইবনে হারেসা ছাড়া তার কাছে আর কোনো উপহার পছন্দ হলো না। পরিশেষে, যায়েদকেই মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতের জন্য উপহার হিসেবে পেশ করলেন।

ভাগ্যবান বালক যায়েদ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানে ও তাঁর মহান সাহচর্যে সুন্দর ও উত্তম গুণাবলিতে সমৃদ্ধ হয়ে বেড়ে উঠতে থাকে।

এদিকে একমাত্র কলিজার টুকরা যায়েদকে হারিয়ে তার হতভাগ্য মা দারুণভাবে ব্যথিত ও অস্থির হয়ে পড়ে। সে সর্বদা অঝোরে কাঁদতে থাকে। হৃদয়ে দুঃখ-বেদনার পাহাড় ভেঙে পড়তে থাকে। এক মুহূর্তও সে শান্ত হতে পারল না। তার হতাশা ক্রমেই বাড়তে থাকে। কারণ, সে জানে না যায়েদ জীবিত না মৃত। জীবিত হলে আশায় বুক বাঁধত। আর মৃত হলে তাকে পাবার আশা ছেড়ে দিত।

অন্যদিকে যায়েদের পিতাও রাত-দিন ছেলেকে খুঁজতে থাকে, তারও অস্থির অবস্থা। যাকে ও যে কাফেলাকে পাচ্ছে তাকেই জিজ্ঞাসা করছে যায়েদের কথা। হয়তো লোকটির কাছে পুত্রের খবর থাকতেও পারে। ছেলের শোকে মুহ্যমান সে। পুত্রশোকে মুহ্যমান পিতা তার হারানো পুত্রকে নিয়ে যে শোকগাথা রচনা করে তার গদ্যরূপ হচ্ছে :

بَكَيْتُ عَلَى زَيْدٍ وَلَمْ أَدْرِ مَا فَعَلْ

أَحَيٌّ فَيُرْجَى أَمْ أَتَى دُوْنَه الأَجَلُ.

'যায়েদের সন্ধানে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছি, জানি না দিশেহারা অবস্থায় এখন কী করব! জানি না সে এখনও জীবিত নাকি দুনিয়া থেকে চিরবিদায় নিয়েছে? কেমন করে সিদ্ধান্ত নেব?'

فَوَاللّٰهِ مَاأَدْرِيْ وَاِنِّي لَسَائِلٌ

أَغَالَكَ بَعْدِيْ السَّهْلُ اَمْ غَالَكَ الْجَبَلُ

'জানি না, সে কোথায় ও কী অবস্থায় আছে; কিন্তু আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, আমি অব্যাহতভাবে তাকে খুঁজতেই থাকব। হে যায়েদ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে তোমাকে না জানি মরুভূমির কোন্ প্রান্তরে লুকিয়ে রেখেছে, অথবা কোন্ এক পাহাড়ের শৃঙ্গে তোমাকে বন্দী করে রেখেছে।'

تُذَكِّرُنِيْهِ الشَّمْسُ عِنْدَ طُلُوْعِهَا

وَتَعْرِضُ ذِكْرَاهُ اِذَا غَرْبُهَا أَفَلْ

'প্রত্যেক দিনের সূর্যোদয় থেকে সারাদিন তোমাকে স্মরণ করতে থাকি, দিনে তোমাকে পাওয়ার আশা করি, সূর্যাস্তের পর যে রাত আসে, সে রাতেও তোমাকে পাওয়ার আশায় বিনিদ্র রজনী যাপন করি।'

سَاَعْمِلُ نَصَّ الْعَيْسِ فِيْ الاَرْضِ جَاهِدًا

وَلَا اَسَامُ التَّطْوَافَ اَوْتَسَاَمُ الاِبْل

'দ্রুতগামী সর্বোৎকৃষ্ট উট নিয়ে আমি তোমাকে পৃথিবীব্যাপী খুঁজতে থাকব, আমার উট যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে বসে পড়বে, ততদিন আমি তোমাকে খুঁজবই, খুঁজব।'

حَيَاتِيَ، اَوْتَاتِيْ عَلَيَّ مَنِيَّتِي

فَكُلُّ اَمْرِئٍ فَانٍ وَاِنْ غَرَّهُ الاَمَلْ

'তোমার সন্ধান থেকে আমাকে বিরত রাখতে পারে একমাত্র মৃত্যু, অন্যথায় সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত সারা জীবনই আমি তোমাকে খুঁজে বেড়াব। নিঃসন্দেহে প্রত্যেকেই মরণশীল, কিন্তু আশা নামক কুহেলিকা ভ্রান্তিতে ডুবিয়ে রাখে।'

কোনো এক হজ্জ মওসুমে যায়েদের গোত্রের কিছু লোক হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে (উল্লেখ্য, ইসলাম-পূর্ব যুগেও বাইতুল্লাহর হজ্জ অব্যাহত ছিল।)। বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করার সময় তারা যায়েদের মুখোমুখি সাক্ষাৎ পেয়ে যায়

এবং তারা যায়েদকে চিনে ফেলে। সেও তার গোত্রের লোকজনকে চিনতে পারে। যায়েদকে তারা নানা কথা জিজ্ঞাসা করে জেনে নেয় তার অতীত ও বর্তমানকে। যায়েদও তার মা-বাবার কুশল জিজ্ঞাসা করে। তারা হজ্জ পালন শেষে দেশে ফিরে এসেই যায়েদের পিতা হারেসাকে তার হারানো ছেলের সন্ধান দেয় বিস্তারিতভাবে। যে সুসংবাদের জন্য এত দীর্ঘ প্রতীক্ষা, সে প্রতীক্ষার কি অবসান হলো? হয়তো হলো, যায়েদের পিতার খুশি দেখে কে? যায়েদের পিতা মুক্তিপণের অর্থ, বাহন উট ও পথের পাথেয় যোগাড় করল। তারপর তড়িৎগতিতে তার ভাই কা'বকে সাথে নিয়ে মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হলো।

মক্কায় পৌঁছেই তারা মুহাম্মদ বিন আবদুল্লাহর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছল এবং তাকে তাদের আগমনের কারণ জানাল। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সামনে এলে যায়েদের পিতা আবেগময় কণ্ঠে বলল :

'হে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান! আপনারা আল্লাহর ঘরের খাদেম, আপনারা সায়েলের সওয়াল, অভাবীর অভাব পূরণ করেন, ক্ষুধার্তকে অন্ন দান করেন, বিপদগ্রস্তকে বিপদ মুক্তিতে সহায়তা করেন। আপনারা অনেক গুণে গুণান্বিত। যায়েদ নামের ছেলেটি আপনার কাছে আছে। সে আমার ছেলে। মুক্তিপণ যা লাগে তা-ই আমি দেব। আমার ছেলেকে ফিরিয়ে দিন। বলুন, কী পরিমাণ মুক্তিপণ লাগবে? আপনার কাছে আমি তা-ই পেশ করব। আমাদের প্রতি আপনি করুণা করুন।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে বললেন :

'কে আপনাদের সন্তান, যাকে আমরা ক্রীতদাস বানিয়েছি?'

তারা উত্তর দিল :

'আপনার গোলাম যায়েদ ইবনে হারেসা।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'মুক্তিপণের চেয়েও উত্তম এক শর্ত আপনাদের কাছে রাখছি, সে শর্ত মানবেন কি?'

তারা জিজ্ঞাসা করল :

'সে শর্ত কী?'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

'আমি তাকে আপনাদের সামনে হাজির করছি। সে আপনাদের সাথে চলে যাবে, না আমার এখানেই থাকবে– এই দু'য়ের মধ্যে যেটি সে পছন্দ করবে, আপনারা কি তাতেই রাজি হবেন? তার স্বাধীন ইচ্ছাকে কি মূল্য দেবেন? যদি আপনাদের সাথে চলে যেতে চায়, তাহলে মুক্তিপণ বা কোনো অর্থ ছাড়াই আপনাদের সাথে চলে যাবে। আর যদি সে আমার এখানেই থাকতে চায়, তাহলে আমি তার স্বাধীন সিদ্ধান্তকে পরিবর্তন করতে পারব না।'

তারা উভয়েই সমস্বরে বলে উঠল :

'নিঃসন্দেহে আপনি ইনসাফপূর্ণ শর্তারোপ করেছেন। এর চেয়ে ভালো শর্ত আর কিছু হতে পারে না।'

অতঃপর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে ডেকে এনে তাদের সামনে হাজির করে বললেন : 'এঁরা দু'জন কে?

যায়েদ উত্তর দিল, 'ইনি আমার পিতা হারেসা ইবনে শুরাহিল এবং ইনি আমার চাচা কা'ব।'

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদকে বললেন :

'আমরা তোমাকে এই শর্তে স্বাধীনতা দিয়েছি যে, তুমি যদি চাও তাহলে এ দু'জনের সাথে চলে যেতে পার, আর যদি না চাও তাহলে আমার এখানেই থাকতে পার।'

যায়েদ তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল :

'আমি তাদের সাথে না গিয়ে বরং আপনার এখানেই থাকবো– এটাই আমার স্বাধীন সিদ্ধান্ত।'

তার পিতা হারেসা বলল :

'হে আমার হতভাগ্য সন্তান! তোমার জন্য আফসোস! পিতামাতার কোলে ফিরে যাওয়ার চেয়ে তুমি কি দাসত্বকেই প্রাধান্য দিচ্ছ?'

যায়েদ বললো :

'আমি এ ব্যক্তির চরিত্রে এমন গুণাবলি দেখেছি যে, কোনো কিছুই তাঁর থেকে আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।'

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের এই আচরণ ও মানসিকতা দেখে তার হাত ধরে সেই মুহূর্তেই বাইতুল্লায় নিয়ে গেলেন এবং কুরাইশ গোত্রের

একদল লোকের উপস্থিতিতে হাজারে আসওয়াদের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন :

'হে কুরাইশগণ! তোমরা সাক্ষী থেকো, এ বালক এখন থেকে আমার পুত্র। সে আমার উত্তরাধিকারী এবং আমি তার উত্তরাধিকারী।'

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، اِشْهَدُوْا اَنَّ هٰذَا اِبْنِى يَرِثُنِى وَاَرِثُهٗ ـ

এ দৃশ্য দেখে তার পিতা ও চাচা তাকে ফেরৎ পাওয়ার চেয়েও অধিক আনন্দিত হলো। তারা যায়েদকে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রেখে আনন্দিতচিত্তে স্বগৃহে রওয়ানা হলো।

সেদিন থেকেই যায়েদ ইবনে হারেসাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ বলে ডাকা শুরু হলো। ইসলামে পিতাপুত্রের মৌখিক সম্পর্ককে রহিত করার পূর্ব পর্যন্ত তাকে যায়েদ বিন মুহাম্মদ হিসেবেই ডাকা হতো। মৌখিক পিতাপুত্র সম্পর্ক রহিতের আয়াতে এভাবে আল্লাহ ঘোষণা দেন :

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَائِهِمْ ـ

'তোমরা তাদেরকে তাদের পিতার নামে ডাকো।' (সূরা আহযাব : ৫)

এই আয়াত নাযিলের মুহূর্ত থেকেই আবার তাকে যায়েদ ইবনে হারেসা নামে ডাকা শুরু হলো। পিতামাতার চেয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রাধান্য দেওয়ার মুহূর্তে যায়েদ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি যে, সে কী পুরস্কারে পুরস্কৃত হবে। সে এও বুঝতে পারেনি যে, সে যে মনিবকে পিতামাতা ও জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ওপর অগ্রাধিকার দিল, তিনি পূর্বাপর সকল মানুষের নেতা এবং সকল সৃষ্টির প্রতি প্রেরিত রাসূল। যায়েদ ভবিষ্যতে কী সুমহান উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হচ্ছে তা সে যেমন জানত না, তেমনি সে জানতো না যে, শীঘ্রই আসমানী শাসন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মানবতাবিনাশী ব্যাধিতে আক্রান্ত বিশ্বসমাজ শীঘ্রই ব্যাধিমুক্ত হবে ও সুস্থ সমাজব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা সারা পৃথিবীই আদল-ইনসাফের পরশ পাবে। সত্য ও ন্যায় এবং পুণ্যের সুবাতাস প্রবাহিত হবে এবং যায়েদ নিজেই হবে সেই সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন বিশ্বসমাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। এ ভবিষ্যৎ ছিল তার অজানা। আল্লাহ যাকে চান, তাকেই এ সৌভাগ্যের অধিকারী করেন। মহান আল্লাহ বড়ই সৌভাগ্য দানকারী।

অব্যাহত দাস জীবন যাপনের পরিবর্তে আপন মা-বাবার কোলে চলে যাওয়ার অপূর্ব সুযোগ পাওয়ার ঐতিহাসিক ঘটনার মাত্র কয়েক বছর পরেই আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসেবে ঘোষণা করলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের ওপর ঈমান গ্রহণকারী সর্বপ্রথম পুরুষ হলেন এই যায়েদ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে কত বড় সৌভাগ্য দান করেছিলেন, তা কি ভাবা যায়?

যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোপন সংবাদ সংরক্ষণকারী ছিলেন। বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রাকার অভিযান ও বিভিন্ন যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে নিযুক্ত সেনাপতি ছিলেন তিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় অনুপস্থিতিকালে তিনি রাসূলুল্লাহর স্থলাভিষিক্তদের অন্যতম খলীফা ছিলেন।

যায়েদ ইবনে হারেসা যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর পিতামাতার চেয়েও অধিক ভালোবাসতেন ও শ্রদ্ধা করতেন, অনুরূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাঁকে অপরিসীম ভালোবাসতেন এবং ভালোবাসার নিদর্শনস্বরূপ নবী পরিবারের সদস্যের মতোই 'আহলে বাইতের' সাথে খোলামেলাভাবে মেলামেশার অধিকার প্রদান করেন। যদি কখনো তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দূরে যেতেন তাহলে ফিরে না আসা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুবই উদ্বিগ্ন থাকতেন। ফিরে এলে আনন্দ প্রকাশ করতেন ও তাকে এমন আন্তরিকভাবে সাক্ষাৎ দিতেন যে, যায়েদ ছাড়া আর কেউ এমন একান্ত সাক্ষাৎ পাওয়ার সৌভাগ্য অর্জনে সমর্থ হয়নি।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের উপস্থিতিতে কেমন আনন্দিত হতেন, উম্মুল মুমিনীন আয়েশা সিদ্দীকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা সে ব্যাপারে একটি ঘটনার বর্ণনা দেন :

> 'একদা যায়েদ ইবনে হারেসা কোনো এক জরুরি কাজে শহরের বাইরে যান। ফিরতে দেরি হয়। মদীনায় এমন এক সময় ফিরে আসেন, যখন রাত গভীর। তিনি এসে দরজায় কড়া নাড়লেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন আমার কক্ষে অবস্থান করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যায়েদের আগমন টের পেয়ে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য কক্ষ থেকে বের হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর পরিধানে এমন এক খণ্ড চাদর

ছিল, যা দ্বারা কোনোক্রমে নাভি থেকে পায়ের হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা সম্ভত হতো, তা নিয়েই তিনি কক্ষ থেকে বেরিয়ে পড়লেন এবং যায়েদের সাথে গলা মিলালেন ও তার কপালে চুমু দিলেন।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন :

'আল্লাহর শপথ, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইতঃপূর্বে বা পরে আর কোনো দিন এমন খালি গায়ে আমি দেখিনি।'

যায়েদের প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসার ঘটনার সংবাদ মুসলমানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে সবাই তাঁকে 'যায়েদুল হুব্ব' বা আদরের যায়েদ বলে ডাকত। তাকে زَيْدُ الْحُبِّ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উপাধিতে ভূষিত করা হয়। যায়েদের পর তার ছেলে উসামাকেও حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَابْنُ حُبِّهِ বা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 'প্রিয়পাত্র' এবং 'প্রিয় পাত্রের প্রিয় পুত্র' উপাধিতে ভূষিত করেন।

আল্লাহর কী হিকমত! অষ্টম হিজরীতে আল্লাহ তাআলা তাঁর বন্ধুকে বন্ধুর বিচ্ছেদ-বেদনা দিয়ে পরীক্ষা করতে চাইলেন। ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দূত হিসেবে 'হারেস বিন উমাইর আল আযদী'কে বসরার বাদশাহর কাছে প্রেরণ করেন। হারেস বিন উমাইর আল আযদী পূর্ব জর্দানের 'মূতা' নামক স্থানে পৌঁছলে গাসসানদের এক নেতা শুরাহাবিল ইবনে আমর তাঁকে বসরার বাদশাহর কাছে পৌঁছতে বাধা দেয়, তাঁকে গ্রেফতার করে তার হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বাদশাহর সামনে পেশ করে। বাদশাহ পরে তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অত্যন্ত বেদনাদায়ক ছিল। এ ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন হাজার যোদ্ধার এক বাহিনী মূতার প্রান্তরে দূত হত্যার প্রতিশোধের জন্য প্রেরণ করেন এবং এই বাহিনীর সেনাপতি হিসেবে তাঁর প্রিয়পাত্র যায়েদ ইবনে হারেসাকে নিযুক্ত করে বলেন :

'যদি যায়েদ শহীদ হয়, তবে সেনাপতির দায়িত্ব অর্পিত হবে জা'ফর ইবনে আবী তালিবের ওপর এবং যদি জা'ফর শাহাদাত বরণ করে, তাহলে সে দায়িত্ব অর্পিত হবে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার ওপর। সেও যদি শাহাদাত বরণ করে, তখন সেনাবাহিনী পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে সেনাপতি হিসেবে বেছে নিবে।'

যথারীতি মুসলিম বাহিনী পূর্ব জর্দানের 'মাআন' নামক স্থানে পৌঁছলে রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস এক লাখ সৈন্য নিয়ে দ্রুতগতিতে তার গাসসানী গভর্নরের সাহায্যে এগিয়ে আসে। তাদের সাহায্যের জন্য আরো এক লাখ আরব গোত্রীয় মুশরিক সৈন্য প্রস্তুত থাকে। সর্বমোট দুই লাখ সুদক্ষ শত্রু সৈন্য মুসলিম বাহিনীর অদূরেই অবস্থান নেয়। মুসলিম বাহিনী ক্রমাগত দুই রাত 'মাআন' নামক স্থানেই অবস্থান নিয়ে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের পদক্ষেপের বিষয়ে পরামর্শ করেন। পরামর্শসভার এক সদস্য প্রস্তাব করলেন :

> 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পত্র দ্বারা শত্রুবাহিনীর সংখ্যা সম্পর্কে জানানো হোক।'

উত্তর না আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা দরকার। অন্য একজন বললেন :

> 'হে দীনী ভাইয়েরা! আল্লাহর শপথ। আমরা সংখ্যার আধিক্যে নির্ভর করে জিহাদ বা লড়াই করি না। শত্রুবাহিনীর শক্তি ও সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের বিজয় সূচিত হয় না। আমরা আল্লাহর দীনের জন্যই জিহাদ করি। অতএব যে উদ্দেশ্যে আপনারা এসেছেন, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শত্রুর মোকাবেলায় অগ্রসর হোন। আল্লাহ নিশ্চয়ই দুটির যে কোনো একটি আপনাদের প্রদান করবেন, হয় বিজয়, না হয় শাহাদাত।'

অতঃপর সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের এখানে সমাপ্তি ঘটল। 'মূতা' নামক স্থানে রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে মুসলিম বাহিনী যুদ্ধ ঘোষণা করল। মুসলিম বাহিনী এমন দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করতে থাকল যে, শত্রু-সৈন্যদের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল।

মাত্র তিন হাজার সৈন্যের এই মুসলিম বাহিনী উন্নত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও আরব যোদ্ধাদের সমন্বয়ে গঠিত দু'লক্ষাধিক সৈন্যের বিরাট বাহিনীর অন্তরে প্রচণ্ড ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো। ইসলামের পতাকাবাহী সেনাপতি যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এমন দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করেন যে, তৎকালীন বীর যোদ্ধাদের ইতিহাসে এমন বীরত্বের ঘটনা ছিল সত্যিই বিরল। কিন্তু শত্রুবাহিনীর আক্রমণের প্রচণ্ডতা এমনই ছিল যে, বর্শার শতাধিক আঘাত তার দেহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে এবং তার দেহ রক্তের স্রোতে ভাসতে থাকে। তিনি নিস্তেজ হয়ে আল্লাহর পথে শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর জা'ফর ইবনে আবী তালিব রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সেনাপতির ঝাণ্ডা হাতে নেন এবং বীরবিক্রমে লড়াই করতে করতে শাহাদাত বরণ করেন।

এরপর জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নেন আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। তিনিও বীরবিক্রমে ময়দান কাঁপিয়ে তোলেন এবং লড়াই করে পূর্বসূরীদের মতো শাহাদাত বরণ করেন। সবশেষে মুসলিম বাহিনী খালিদ ইবনে ওয়ালীদকে সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তিনি সবেমাত্র ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি মুসলিম বাহিনীকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়ে পিছনে সরে আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মূতা যুদ্ধের বিবরণ ও পরপর তিন সেনাপতির শাহাদাতের সংবাদ শুনে খুবই ব্যথিত হন। এর আগে কোনো দিন তাঁকে এত অধিক ব্যথিত হতে আর দেখা যায়নি। ব্যথিত মন নিয়ে তিনি শহীদদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সমবেদনা প্রকাশ করেন। যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর বাড়িতে পৌঁছলে তাঁর ছোট মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থিত হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার সাথে কাঁদতে থাকেন। এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চৈঃস্বরে কাঁদতে শুরু করলে সা'দ ইবনে উবাদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এভাবে কাঁদছেন?'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন :

'এটা হচ্ছে বন্ধুর জন্য বন্ধুর কান্না।'

---

যায়েদ ইবনে হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জীবনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. সহীহ মুসলিম : ৭ম খণ্ড, ১৩১ পৃ. সাহাবীদের ফযীলত অধ্যায়।
২. জামেউল উসূল মিন আহাদীসে রাসূল (স) : ১০ম খণ্ড, ২৫-২৬ পৃ।
৩. আল ইসাবাহ : ২৯০ নং জীবনী দ্রষ্টব্য।
৪. আল ইসতিআব (আল হামেশ সংস্করণ)ঃ ১ম খণ্ড, ৫৪৪ পৃ.।
৫. আস সিরাতুন নুবুবিয়া লি ইবনে হিশাম : ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।
৬. সিফাতুস সাফওয়া : ১ম খণ্ড, ১৪৭ পৃ.।
৭. খাযানাতুল আদাব লিল বাগদাদী : ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃ.।
৮. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৮ম হিজরীর ঘটনাবলি দ্রষ্টব্য।
৯. হায়াতুস সাহাবা : ৪র্থ খণ্ডের সূচি দ্রষ্টব্য।

# আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)

*'যা আল্লাহর রাস্তায় দান করেছ তাতেও আল্লাহ বরকত দান করুন। আর যা নিজের জন্য রেখেছ তাতেও আল্লাহ বরকত দান করুন।' –রাসূলুল্লাহ (স)-এর দু'আ*

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু প্রথম ইসলাম গ্রহণকারী আট সাহাবীর অন্যতম। জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ জনের একজন। খালীফাতুল মুসলিমীন উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর পর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য গঠিত ছয় সদস্যের পরামর্শসভার অন্যতম সদস্য। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় মদীনাতে যে ক'জন ব্যক্তি ফাতওয়া দান করতেন, তিনি তাদের একজন। জাহিলী যুগে তাঁর নাম ছিল 'আবদু আমর'। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে আবদুর রহমান বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল আরকাম ইবনে আবুল মান্নাফ আল মাখযুমীর বাড়িতে নিয়মিত দাওয়াতী বৈঠক আরম্ভ করার পূর্বেই আবদুর রহমান ইবনে আওফ ইসলাম গ্রহণ করেন। আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইসলাম গ্রহণের দু'দিন পর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রথম যুগের মুসলমানদের মতো তিনিও নানা কষ্ট ও নির্যাতনের শিকার হন। তাতে তিনি বিচলিত না হয়ে ধৈর্য অবলম্বন করেন। তিনি অন্যদের ধৈর্য ধারণের জন্য যেমন উদ্বুদ্ধ করতেন, তেমনি নিজেও সত্যের ওপর অবিচল ছিলেন। হাবশায় হিজরতকারী দলেরও অন্যতম সদস্য

ছিলেন তিনি। মদীনায় হিজরতকারীদের প্রথম কাফেলায়ও তিনি শরীক ছিলেন। মদীনা মুনাওয়ারায় নবগঠিত ইসলামী সমাজে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেসব মুহাজির ও আনসারকে ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেন, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাতেও শামিল ছিলেন।

সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর মুহাজির ভাই আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সম্বোধন করে বলেন :

> 'প্রিয় ভাই, মদীনাবাসীদের মধ্যে আমিই সর্বাধিক ধনাঢ্য। আমার রয়েছে দুটি খেজুর বাগান ও দু'জন স্ত্রী। আপনি আমার দুটি খেজুর বাগানই দেখুন। যে বাগানটি আপনার পছন্দ হয় সেই বাগানই আমি আপনাকে দিয়ে দেব। আমার দু' স্ত্রীকেই দেখে নিন, যে স্ত্রী আপনার পছন্দ হয়, সেই স্ত্রীকে তালাক দিতে চাই, যেন তাকে আপনি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর আনসার ভাই সা'দ বিন রাবীআকে এই প্রস্তাবের উত্তরে বললেন :

> 'আপনার ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনে আল্লাহ আরও অধিক বরকত দান করুন। আপনি বরং আমাকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিন।'

সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁকে বাজারের পথ দেখিয়ে দিলে তিনি ব্যবসা শুরু করেন। ক্রয়-বিক্রয়ে লাভবান হয়ে তিনি তা সঞ্চয়ও করে যাচ্ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে মোহরানা দেওয়ার মতো অর্থ সঞ্চিত হলে তিনি বিয়ে করলেন।

একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে উপস্থিত হলে বিবাহে ব্যবহৃত সুগন্ধি, জাফরান ইত্যাদি রং দেখে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

> 'কী ব্যাপার আবদুর রহমান?'

আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন :

> 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! গতরাতে বিবাহ করেছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে প্রশ্ন করলেন :

> 'স্ত্রীর মোহরানা হিসেবে কী দিয়েছ?'

তিনি বললেন :

'কয়েক রতি স্বর্ণ দিয়েছি।'

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন :

'ওয়ালীমার ব্যবস্থা করো একটা বকরি দিয়ে হলেও। আল্লাহ্ তোমার ধন-দৌলতে বরকত দান করবেন।'

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন :

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর বরকতে দুনিয়া আমার কাছে ধরা দিল। এমনকি আমি যদি কোনো পাথরখণ্ডও টেনে তুলতাম, তাহলে মনে হতো যে, এর নিচে স্বর্ণ বা রৌপ্য ভাণ্ডার পেয়ে যাব।'

বদরের যুদ্ধে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে শত্রু বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। আল্লাহর দুশমন মক্কার কুখ্যাত উমাইর ইবনে উসমান ইবনে কা'ব আত তায়মীকে তিনিই হত্যা করেন। উহুদের যুদ্ধে যখন মুসলিম বাহিনীর বিপর্যয় ঘটে তখন তাদের অনেকেই এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে থাকে। সে মুহূর্তে তিনি যুদ্ধের ময়দানে অটল ও অবিচল থাকেন। মুসলিম বাহিনী যখন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়নের পথ ধরে, সে মুহূর্তেও তিনি বীরবিক্রমে শত্রুবাহিনীর ওপর প্রচণ্ডভাবে আঘাতের পর আঘাত হানা অব্যাহত রাখেন। যুদ্ধশেষে দেখা গেল, তাঁর শরীরে তেইশ থেকে উনত্রিশটির মতো মারাত্মক যখম, যার মধ্যে কয়েকটি এত বেশি গভীর যে, তার ভিতর মানুষের হাত পর্যন্ত ঢুকে যেত। জিহাদের ময়দানে তাঁর এই নৈপুণ্য, সাহসিকতা ও বীরত্ব আল্লাহর পথে তাঁর ধন-সম্পদ ব্যয়ের তুলনায় নগণ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুশরিকদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান বা 'সারিয়্যা' পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলে জিহাদ তহবিল সংগ্রহ করার প্রয়োজন দেখা দেয়।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের আহবান জানালেন :

تَصَدَّقُوا فَإِنِّى أُرِيْدُ أَنْ أَبْعَثَ بَعْثًا ـ

'হে সাহাবীগণ! আমি মুশরিকদের বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে চাই। তোমরা যে যা পার জিহাদ ফান্ডে দান করো।'

এই আহ্বানের সাথে সাথেই আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাঁর বাড়ির দিকে রওয়ানা হলেন। দ্রুত বাড়ি থেকে ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন :

> 'আমার কাছে চার হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিল। এ থেকে দু' হাজার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য দান করলাম, আর দু'হাজার আমার পরিবারের জন্য রেখে এলাম।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এই উদার দানের ঘোষণা শুনে বললেন :

بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْمَا أَعْطَيْتَ وَبَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْمَا أَمْسَكْتَ۔

> 'তুমি যা দান করেছ, আল্লাহ তাতেও বরকত দান করুন। আর যা তোমার সন্তান ও পরিবার-পরিজনদের জন্য রেখে দিয়েছ, তাতেও আল্লাহ বরকত দান করুন।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাবুক যুদ্ধের জন্য সংকল্প করেন, তখন এ যুদ্ধে যোদ্ধাদের আধিক্যের প্রয়োজন যেমন ছিল, তেমনি তাদেরকে যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত করার প্রয়োজনও ছিল অপরিসীম। কারণ, রোমান সৈন্যবাহিনী সংখ্যায় ছিল যেমন বিশাল, তেমনি তাদের রণ-প্রস্তুতিও ছিল অত্যাধুনিক। অপরদিকে সে বছর মদীনায় ছিল অনাবৃষ্টি। যুদ্ধযাত্রার পথ ছিল যেমন সুদীর্ঘ ও দুর্গম, পথের সাজ-সরঞ্জামও ছিল তেমনি অপ্রতুল। কিছুসংখ্যক সাহাবী এমন ছিলেন যে, তাদের কোনো সমরাস্ত্র ও যানবাহন ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে তারা অস্ত্র ও যানবাহন সরবরাহের আবেদন জানান, কিন্তু তা সরবরাহের সঙ্গতি ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে তাদের জিহাদে অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। জিহাদে অংশগ্রহণে তারা বঞ্চিত হওয়ার কারণে মনে দুঃখ নিয়ে বাড়ি ফিরেন। বিরাজমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাবুক যুদ্ধে যোগদানে ব্যর্থ সাহাবীদের 'ক্রন্দনকারী' এবং এ সৈন্যবাহিনীকে 'কষ্টের বাহিনী' বলা হতো। এই চরম মুহূর্তে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একমাত্র আল্লাহর নিকট থেকে প্রতিদান পাওয়ার নিশ্চিত আশায় সাহাবীদের জিহাদ তহবিলে দান করার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ তাঁর

সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রত্যেকে সাধ্যমতো অর্থ জমা করতে থাকলেন। এ দানবীরদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ছিলেন অন্যতম। এই জিহাদে তিনি ২০০ আওকিয়া বা এক বস্তা স্বর্ণখণ্ড দান করেন।

তাঁর এ দানের পরিপ্রেক্ষিতে উমর ফারূক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন :

> 'আবদুর রহমান তাঁর পরিবারের জন্য কিছুই না রেখে সব কিছু দান করার জন্য তাঁকে গুনাহগার হতে হয় কি না সে আশঙ্কা করছি।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেন :

> 'আবদুর রহমান তোমার পরিবারের জন্য কি কিছু রেখে এসেছো? তিনি উত্তর দিলেন জী হ্যাঁ, যা কিছু দান করেছি তার চেয়ে অনেক বেশি বরং অনেক উত্তম জিনিস পরিবারের জন্য রেখে এসেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, কী পরিমাণ ?'

আবদুর রহমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তর দিলেন :

> 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূল দাতার উত্তম পুরস্কার, কল্যাণ ও রিযিকের যে ওয়াদা করেছেন, তা-ই।'

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই সৈন্যবাহিনী যথাসময়ে তাবুকে পৌঁছলে তাবুকে অবস্থানকালে আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহ এমন এক সম্মানে ভূষিত করেন, যা মুসলমানদের আর কাউকে দান করেননি।

সে সম্মান হলো কোনো এক ওয়াক্ত নামাযের পূর্বে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেনা ছাউনির বাইরে যাওয়ার কারণে যথাসময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইমামতিতে সৈন্যবাহিনী নামাযে দাঁড়িয়ে যান। প্রথম রাকআত শেষ হতে যাচ্ছে, এ অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামাআতে শরীক হলেন এবং আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিছনে ইক্তিদা

করে নামায আদায় করলেন। সৃষ্টিজগতের শ্রেষ্ঠ মানুষ নবীকুলের নেতা, ইমামুল মুরসালীন মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর ইমাম হওয়ার মতো সম্মান ও গৌরব এ পৃথিবীতে আর কিছু হতে পারে কি?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুনিয়া থেকে চিরবিদায়ের পর আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর সমস্ত 'উম্মাহাতুল মুমিনীন' বা তাঁর সম্মানিতা জীবনসঙ্গিনীদের দেখা-শোনার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উম্মাহাতুল মুমিনীনের সমস্ত প্রয়োজন ও অভাব-অভিযোগ পূরণের দায়দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে নেন। যখন তাঁরা বাইরে কোথাও যেতেন, তিনিও তাঁদের সঙ্গে যেতেন। তাঁরা হজ্জের উদ্দেশ্যে গমন করলে তিনিও হজ্জের কাফেলায় শরীক হতেন। হাওদা বা উটের পৃষ্ঠদেশের আসনকে পর্দাবেষ্টিত করতেন এবং তাতে উঠার এবং যাত্রা বিরতির সময় তাঁদেরকে উটের পৃষ্ঠ থেকে নামার ব্যাপারে সহযোগিতা করতেন। নিঃসন্দেহে এই খিদমত আবদুর রহমান ইবনে আওফের গৌরবময় জীবনের অসংখ্য গুণাবলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণ ও শ্রেষ্ঠ ফযীলত। সর্বোপরি তাঁর উপর উম্মাহাতুল মুমিনীনের অগাধ আস্থাই ছিল তাঁর গৌরবের জন্য যথেষ্ট।

উম্মাহাতুল মুমিনীন এবং অন্যান্য মুসলমানের কল্যাণ ও অভাব নিরসনে তিনি ছিলেন সর্বদাই তৎপর। একদা তিনি তাঁর একটি ভূ-সম্পত্তি চল্লিশ হাজার দিনার বা স্বর্ণমুদ্রায় বিক্রি করে সমুদয় অর্থই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মা আমিনা বিনতে ওহাবের গোত্র 'বনূ যোহরা,' আনসার ও মুহাজিরদের গরীব অসহায় পরিবার এবং উম্মাহাতুল মুমিনীনের মধ্যে বিতরণ করেন।

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খিদমতে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট অংশ প্রেরণ করলে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে এ অর্থ প্রেরণ করেছেন? তাঁকে জানানো হলো যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। আবদুর রহমান ইবনে আওফের নাম শোনামাত্রই তিনি তাঁর সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি ভবিষ্যদ্বাণী শোনান।

لَا يَحْنُو عَلَيْكُنَّ مِنْ بَعْدِي إِلَّا الصَّابِرُونَ -

'আমার মৃত্যুর পর একমাত্র সবর ও ধৈর্যধারণকারীগণ ছাড়া আর কেউ তোমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে না।'

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধন-প্রাচুর্যের দু'আ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত কার্যকর ছিল। তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক ধনশালী ব্যক্তি ছিলেন।

তাঁর ব্যবসা-বাণিজ্য শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছিল। তাঁর তেজারতী উটবহর বিভিন্ন শহর থেকে মদীনাবাসীদের জন্য গম, ময়দা, তেল, কাপড়, বাসনপত্র, সুগন্ধি দ্রব্যাদিসহ জন-জীবনের জন্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মদীনায় নিয়ে আসত এবং মদীনায় উৎপাদিত প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্যাদি বাইরে নিয়ে যেত।

একদিন আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর উটবহর মদীনায় ফিরে এলে দেখা গেল, সেই বহরে উটের সংখ্যা ছিল সাত শ'। হ্যাঁ, সাত শ' উট মদীনাবাসীদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বহন করে এনেছে। এ উটবহর মদীনায় প্রবেশ করলে মহল্লায় মহল্লায় হুলুস্থুল সৃষ্টি হলে এবং হৈচৈ পড়ে গেলে এ অবস্থায় উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিজ্ঞাসা করলেন, অলিতে-গলিতে এই হট্টগোল কিসের?

তাঁকে জানানো হলো :

> 'আবদুর রহমান ইবনে আওফের সাত শ' উটের বহর গম, আটা, ময়দা ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী নিয়ে মদীনায় প্রবেশ করেছে।'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন :

> 'আল্লাহ তাঁকে এ দুনিয়াতে যা কিছু ধন-সম্পদ দান করেছেন তাতে আল্লাহ বরকত দান করুন। আর পরকালের প্রতিদান হোক আরও সীমাহীন।'

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি :

> 'আবদুর রহমান ইবনে আওফ হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন।*'

---

* حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عبد الصمد بن حسان قال أنا عمارة عن ثابت عن أنس قال : بينما عائشة فى بيتها إذ سمعت صوتا فى المدينة فقالت ماهذا قالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشام تحمل من كل شئ قال فكانت سبعة مائة بعير قال فارتجت المدينة من الصوت فقالت عائشة

উটবহর থেকে আমদানীকৃত সামগ্রী খালাসের পূর্বেই আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার উক্তি শোনানো হলো এবং তাঁকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হলো।

---

سمعت رسول الله ﷺ يقول ." قد رايت عبد الرحمن ابن عوف يدخل الجنة حبوا." فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف فقال ان استطعت لادخلنها قائما فجعلها باقطاب أواحملها فى سبيل الله عزو جل.

مسند الا مام أحمد بن حنبل ج -٦/ص - ١١٦

সম্ভবত এই হাদীসটি "মাসনাদ আল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল" নামক প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় হাদীসটি উল্লেখ হয়েছে। কিন্তু বর্ণনা শেষে তার মান নির্ণয় করা হয়নি।

আল ইমাম ইবনুল জাওযী الموضوعات বা জাল হাদীস সংকলনের ২য় খন্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর এ আলোচনায় ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন যে ঃ

ونقل عن الامام أحمد "هذا حديث كذب منكر وعمارة فى سنده يروي أحاديث مناكير.

"এটি একটি মিথ্যা বা জাল হাদীস। এটি হাদীসের মর্যাদায় তো নয়ই বরং অবাঞ্ছিত বর্ণনাই বটে। কেননা, এর সনদে 'আম্মারা' নামক বর্ণনাকারী মিথ্যা ও অবাঞ্ছিত হাদীস বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত।

আল ইমাম জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান আস সুয়ূতী (র.) তাঁর اللالئ المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة নামক গ্রন্থের ১ম খন্ডের ৪১২ নং পৃষ্ঠায় مناقب الصحابة অধ্যায়ে তা জাল হাদীস হিসেবেই উল্লেখ করেছেন।

আল ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র.) তাঁর গ্রন্থ "আল কাওল আল মুসাদ্দাদ" القول المسدد নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, عمارة এর মতোই بزار নামক অপর এক জাল হাদীস বর্ণনাকারীও আগলাব বিন তামীম اغلب بن تميم-এর বরাত দিয়ে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

হাফিযে হাদীস ইমাম আল ইরাকী (র) তাঁর হাদীস সংকলনে তা মিথ্যা ও জাল হাদীস বর্ণনায় সপ্তম নাম্বারে উল্লেখ করেছেন। এমনি ভাবে আল্লামা আল ইমাম ইবনে হাজার (র.) তাঁর القول المسدد নামক গ্রন্থে জাল হাদীস হিসেবেই উল্লেখ করে বলেছেন ঃ এই জাল হাদীসটির ব্যাপারে বিশদ বর্ণনার কোন দাবীই রাখে না। কেননা, এই হাদীসটি অবাঞ্ছিত ও জাল হওয়ার জন্য فانه يكفنا شهادة الامام أحمد بانه كذب. ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের এ সাক্ষ্যই যথেষ্ট যে, এটি একটি মিথ্যা বর্ণনা মাত্র। প্রশ্ন হলো, তাহলে ঐ হাদীসটি কি করে তাঁর প্রসিদ্ধ হাদীস সংকলনে স্থান পেল? প্রকৃতপক্ষে তিনি এই হাদীসটি উল্লেখ করে তার পোস্টমর্টেম বা সানবিন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হতে পারে তার সানবিন করাটাই ভুলবশত বাদ পড়েছে অথবা তাঁর ছেলে

এ সংবাদ তাঁর কর্ণগোচর হতে না হতেই এই সংবাদের সত্যতা যাচাই করার জন্য তিনি এক দৌড়ে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার খিদমতে গিয়ে হাজির হন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহাকে আম্মাজান বলে সম্বোধন করে জিজ্ঞাসা করেন :

'আপনি কি আমার সম্পর্কে এই সুসংবাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছেন?'

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বললেন :

'হ্যাঁ, তাই।'

এ কথা শুনে পরম আনন্দে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। অতঃপর তিনি বললেন :

'যদি সম্ভব হয়, হেঁটে হেঁটেই জান্নাতে প্রবেশ করার আপ্রাণ চেষ্টা করব। আমার দুর্বলতার কাফফারা ও সাদকা হিসেবে আপনাকে সাক্ষী রেখে ঘোষণা করছি, এ উটবহরের সমস্ত উট এবং উটের পিঠের মালামাল বহনের জন্য বিশেষভাবে তৈরি ভ্যান ও বহন করে আনা সমস্ত পণ্য আমি আল্লাহর পথে দান করে দিলাম।'

প্রাচুর্যের পাহাড় গড়া এবং তা আল্লাহর পথে দান করার আনন্দের চেয়েও আবদুর রহমান ইবনে আওফকে দেওয়া জান্নাতের সুসংবাদ ছিল তাঁর জন্য অধিক আনন্দের ও সৌভাগ্যের।

---

মুহাদ্দিস আবদুল্লাহর নিকট থেকে পরবর্তীরা এর ছানবিন ছাড়াই বর্ণনা করেছেন এবং এভাবেই পরবর্তীতে উক্ত গ্রন্থের পাতায় আত্মগোপন হয়ে আছে। মূলত অন্যত্র ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এই হাদীসটি জাল ও মিথ্যা বা অবাঞ্ছিত বলে উল্লেখ করেন। যেহেতু এই হাদীসটি মাসনাদে আহমদে উল্লেখ আছে বলেই সম্মানিত লেখক হয়তো এটিকে একটি সহীহ হাদীস হিসেবে ধরে নিয়েছেন। একজন বিজ্ঞ হাদীসশাস্ত্র বিশারদ ব্যতীত অন্য যে কোন ইসলামী ব্যক্তিত্ব, তিনি যতই বিজ্ঞ হোন না কেন, তার পক্ষে হাদীসের সনদের ব্যাপারে এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি হওয়াটা স্বাভাবিক। দেখুন : ইমাম শামসুদ্দীন আবী আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আবী বকর আল হাম্বলী আদ দামেশকীর -- المنار المنيف فى الصحيح والضعيف. তাহকীক : আল্লামা শেখ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দা। - অনুবাদক।

এ হাদীসটির ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য পরিশিষ্ট দেখুন

তিনি প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে দু'হাতে রাত-দিন ঐসব সম্পদ দারিদ্র্য বিমোচনে বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে প্রায় চল্লিশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা বিতরণ করলেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে আরো চল্লিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা, তারপরে ২০০ আউকিয়া স্বর্ণটুকরা, অতঃপর ৫০০ (পাঁচশত) ঘোড়াকে যুদ্ধাস্ত্রসহ সুসজ্জিত করে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দিলেন। এখানেই শেষ নয়, আরো পনেরো শত যোদ্ধার জন্য উটের ব্যবস্থা করলেন। মৃত্যুর পূর্ব সময়ে তিনি বিপুলসংখ্যক দাস-দাসীকে মুক্ত করে দেন এবং বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী জীবিত সাহাবীদের প্রত্যককে চারশত করে স্বর্ণমুদ্রা দান করার ওসিয়ত করেন। তারাও প্রত্যেকেই তাঁর এ দান আনন্দে গ্রহণ করেন। তাদের সংখ্যাও ছিল একশত। উম্মাহাতুল মুমিনীনের প্রত্যেককে অঢেল সম্পদ দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা প্রায়ই তাঁর উদ্দেশ্যে এ দু'আ করতেন যে,

سَقَاهُ اللّٰهُ مِنْ مَاءِ السَّلْسَبِيْلِ -

'আল্লাহ যেন তাঁকে বেহেশতে 'সাল্‌সাবিল' ঝর্না থেকে পানি পান করান।'

এতকিছু আল্লাহর পথে দান করার পরও তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য যা কিছু রেখে যান তা গণনা করা কঠিন। যেমন এক হাজার উট, একশত ঘোড়া, তিন হাজার বকরি। তাঁর চার স্ত্রীর প্রত্যেকেই তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক অষ্টমাংশের এক-চতুর্থাংশ লাভ করেন, যার পরিমাণ ছিল আশি হাজার দিনার। তা ছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্য যা রেখে যান তা তাঁর উত্তরাধিকারীদের মাঝে কুড়াল দিয়ে কেটে কেটে বণ্টন করা হয়। এসব খণ্ড করতে গিয়ে শ্রমিকদের হাতে ফোস্কা পড়ে যায়। তাঁর এসব সম্পদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'আর ফল। কিন্তু বিপুল সম্পদের স্ফীত এই ভাণ্ডার আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে আল্লাহর পথ থেকে গাফেল করতে পারেনি। তাঁর সহজ-সরল জীবন যাপনের অবস্থা এই ছিল যে, অপরিচিত লোকজন যখন তাঁকে তাঁর দাস-দাসীদের সাথে দেখত, তখন মনিব ও দাস-দাসীদের মধ্যে পার্থক্য করতে পারত না।

কোনো এক রোযার দিনে তাঁর জন্য ইফতারী আনা হলে ইফতারী দেখে তিনি বলতে থাকেন :

'মুসআব ইবনে উমাইর শাহাদাত লাভ করেছেন। তিনি আমার চেয়ে উত্তম ছিলেন। তাঁর পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে কাফনের জন্য আমরা শুধু এমন একখণ্ড কাপড় পেয়েছি, যা দিয়ে মাথা ঢাকলে পা আর পা ঢাকলে মাথা উন্মুক্ত হয়ে যেত। অতঃপর আল্লাহ আমাদের জন্য দুনিয়ায় প্রাচুর্যের দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তিনি বলতে থাকেন, আমার ভয় হয় যে, আমাদের নেক আমলের প্রতিদান দুনিয়াতেই দেওয়া না হয়ে যায়। এরপর এমনভাবে কিছুক্ষণ কাঁদলেন যে, তাঁর জন্য আনীত গরম খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেল।'

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ওপর হাজার গিবতা বা তাঁর পূর্ণ মর্যাদা ও ষোলো আনা পুরস্কার অক্ষুণ্ন রেখে তাঁর মতোই পুরস্কার পাওয়ার বুকভরা আশা। মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে তাঁর জীবদ্দশায় জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন। তাঁর কাফন কাঁধে বহন করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মামা সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু। জানাযায় ইমামতি করেছেন যুন-নূরাইন উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এবং যাঁর জানাযার অনুগামী এবং বিদায় সাক্ষী ছিলেন আমীরুল মুমিনীন আলী কাররামাল্লাহু ওয়াজহাহু। আবেগজড়িত কণ্ঠে তিনি বলছিলেন :

'তুমি দুনিয়ার ভ্রান্ত ও মিথ্যার বেড়াজাল অতিক্রম করে মঙ্গল ও কল্যাণ পেতে সক্ষম হয়েছ। আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন।'

---

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সহায়ক গ্রন্থাবলি :

১. সিফাতুস সাফওয়াহ : ১ম খণ্ড, ১৩৫ পৃ.।
২. হুলিয়াতুল আওলিয়া : ১ম খণ্ড, ৯৮ পৃ.।
৩. তারীখুল খামীস : ২য় খণ্ড, ২৫৭ পৃ.।
৪. আল বাদউ ওয়াত তারীখু : ৫ম খণ্ড, ৮৬ পৃ.।
৫. আর রিয়াদুন নাযীরা : ২য় খণ্ড, ২৮১ পৃ.।
৬. আল জামউ বায়না রিজালিস সহীহাইন : ২৮১ পৃ.।
৭. আল ইসাবাহ : ৫১৭১ নং জীবনী।

৮. আসসীরাতুন নুবুবিয়া লিইবনি হিশাম : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
৯. হায়াতুস সাহাবা : সূচিপত্র দ্রষ্টব্য।
১০. আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১৬৩ পৃ.।
১১. আত্তাবাকাতুল কুবরা : ২য় খণ্ড, ৩৪০ পৃ.।
১২. তাহযীবুত তাহযীব : ৬ষ্ঠ খণ্ড, ২৪২ পৃ.।

পরিশিষ্ট

# আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা)-এর হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ প্রসঙ্গে

[আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সম্পর্কিত এ হাদীসের উপর আল ইমাম আল হাফিয জামাল উদ্দীন আবিল ফারাজ আবদুর রহমান ইবনুল জাওযী আল বাগদাদী (মৃত ৫৯৭ হি:) অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ পর্যালোচনা করেছেন। আরবী রেফারেন্স বইয়ের দুষ্প্রাপ্যতার কথা বিবেচনা করে জ্ঞান-পিপাসু পাঠকবৃন্দের জ্ঞাতার্থে এখানে হাদীসটির পক্ষে-বিপক্ষের দলীল-প্রমাণাদিসহ তাঁর দীর্ঘ পর্যালোচনাটি সংযোজন করা হলো :]

অনেকটা তাবেঈ আত্ তাবেঈনের যুগে মোহমুক্তির উদ্দেশ্যে তাসাউফপন্থীদের মধ্যে আত্মশুদ্ধির নামে রিয়াযত ও মোরাকাবা-মোশাহাদার চর্চা তুঙ্গে উঠে। তাসাউফপন্থী পীর-মোর্শেদগণ প্রথম দিকে সদুদ্দেশ্যেই তাঁদের ইজতিহাদী চিন্তা-ভাবনার আলোকে দুনিয়াত্যাগী জীবনযাপন বেছে নেন। ধন-সম্পত্তির ক্ষতিকর ও নৈতিকতাবিধ্বংসী দিকের প্রতি হয়ে উঠেন শঙ্কিত ও ভীত। ভোগ-বিলাসত্যাগী এ সূফী-সাধকগণ 'রিয়াযতে নাফ্স'-এর নামে ক্ষুধার্ত জীবনের অনুশীলন করতে ও নিজেদের ধন-সম্পত্তি অকাতরে বিলিয়ে দিতে থাকেন। পরবর্তীতে এ সূফী সাধকগণ আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও মানসিক দিক দিয়ে সে সময়কার হাদীসশাস্ত্র বিশারদ, ফিক্হবিদ, মুফাসসিরীন এবং মুহাক্কিক আলেম-উলামার প্রশ্নের সম্মুখীন হন। কেননা, রিয়াযতে নাফ্স-এর অনুশীলনের চেয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তাদের মতাদর্শকে প্রমাণ করা অধিক কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। যে কারণে বাধ্য হয়ে তাঁরা এমন নানাবিধ উদ্ধৃতির আশ্রয় নেন, যা নেহায়েতই ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর। তারা সম্পদ আহরণ ও ব্যবহারের ইসলামী নীতিমালার দিকে ফিরে না এসে কোনো কোনো সূফী-সাধকের ইচ্ছাপ্রণোদিত

কর্মকাণ্ডকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে। এতেও তাদের সৃষ্ট মতাদর্শকে সত্য বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়ে ভিত্তিহীন ও জাল হাদীসের উদ্ধৃতি পর্যন্ত পেশ করতে থাকে। তাদের অন্যতম ও শীর্ষ বর্ণনাকারী হলো 'হারেস আল মোহাসেবী' নামক জনৈক অর্ধমূর্খ সূফী।

তিনি তার বর্ণনায় উল্লেখ করেন :

> 'সম্পদের মোহ ত্যাগ করতে এখনো যারা বিভ্রান্তিতে ভুগছেন, তাদেরকে বলছি : 'আপনারা কী করে এ ধারণায় লিপ্ত আছেন যে, হালাল উপায়ে অর্থোপার্জন তার পরিত্যাগের চেয়ে উত্তম? নিঃসন্দেহে আপনারা এ ধারণার মাধ্যমে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও অন্যসব নবী ও রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছেন। কি করে এ ধারণা পোষণ করছেন যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদের ক্ষতিকর বিভীষিকা সম্পর্কে তাঁর উম্মতকে সতর্ক করেননি। তিনি কি এ কথা জানতেন না যে, সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণকর? আপনারা কি এ ধারণা করছেন যে, যখন তিনি সম্পদ আহরণে নিষেধ করেছেন তখন আল্লাহ তা অবলোকন করেননি? এবং এটি জানতেন না যে, এর সংগ্রহ তাদের জন্য কল্যাণকর? সাহাবীদের সম্পদ ছিল বলে তা সংগ্রহের বৈধতা খুঁজে বেড়াচ্ছেন? তাতে কোনোই লাভ হবে না। কেননা, আবদুর রহমান ইবনে আওফ কিয়ামতের দিন এটিই চাইবেন যে, কতই না ভালো হতো, যদি তাকে অঢেল সম্পদের পরিবর্তে শুধুমাত্র দুনিয়াতে এক মুষ্টি খাবার দেওয়া হতো!' হারেস আল মোহাসেবী তার বর্ণনা অব্যাহত রেখে আরও বলেন :
>
> 'আমি সন্দেহাতীতভাবে জানতে পেরেছি যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফের ইনতিকালের পর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবীগণ বলাবলি করেন যে, আমরা আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর পরিত্যক্ত ধন-সম্পত্তির আধিক্যের ব্যাপারে আতঙ্কিত। এটা, শুনে 'কা'ব' নামক এক ব্যক্তি বলেন :
>
> 'সুবহানাল্লাহ! তোমরা কেন আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর সম্পদের উপর আশঙ্কা বোধ করছ? কেননা, তিনি হালাল পন্থায় তা আহরণ করেছেন ও উত্তম পন্থায় তা খরচও করেছেন।'

কা'বের এ কথা শোনামাত্রই আবূ যর গিফারী ক্রোধান্বিত অবস্থায় কা'বকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য বের হয়ে পড়েন। আবূ যর-এর এ অবস্থা দেখে

কা'ব দ্রুততর উট নিয়ে প্রস্থানের চেষ্টা করলে তাকে ধরে ফেলা হয় এবং তাকে বলা হয় যে, আবূ যর তোমাকে খুঁজছে। এটি শোনামাত্রই কা'ব এক দৌড়ে উসমান (রা)-এর নিকট গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং ঘটনার বর্ণনা দেন। আবূ যর গিফারী কা'বকে বলেন : হে ইহুদী সন্তান এদিকে এসো। আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর ধন-সম্পদ ছেড়ে যাওয়াটা নাকি তোমার নিকট কোনোই ব্যাপার নয়; অথচ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে ঘোষণা দেন যে, ধনাঢ্যশালীরাই কিয়ামতের দিন হবে নিঃস্ব। শুধুমাত্র তারাই অব্যাহতি পাবে, যারা এই দু'আ পাঠ করবে। অতঃপর তিনি আবূ যরকে বলেন :

'হে আবূ যর! তুমি সম্পদের আধিক্য চাচ্ছ? আর আমি চাচ্ছি স্বল্পতা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাচ্ছেন স্বল্পতা, আর হে ইবনে ইহুদ তুমি বলছো যে, আবদুর রহমান ইবনে আওফ যা ছেড়ে গেছেন এতে কোনো অন্যায় হয়নি। তুমি মিথ্যা বলছ। তোমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে যারা একমত প্রকাশ করছে তারাও মিথ্যাবাদী।'

কা'ব আবূ যর গিফারীর কথার কোনো প্রতিবাদ না করে নীরবে বের হয়ে যান।

হারেস আল মোহাসেবী আরো বলেন যে :

'আবদুর রহমান ইবনে আওফ-এর সুউচ্চ মর্যাদার পর অত্যন্ত সহজ-সরল জীবন যাপন করার পরও শুধুমাত্র তার অর্জিত হালাল সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য কিয়ামতের দিন তাঁকে জবাবদিহি করতে হবে এবং মুহাজির ফকীর ও নিঃস্ব ব্যক্তিদের সাথে হেঁটে হেঁটে জান্নাতে প্রবেশ করা থেকে তাকে বিরত করা হবে, যার ফলে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবেন। সাহাবীদের অবস্থা ছিল– যখন তাদের নিকট কিছুই থাকত না তখন তারা আনন্দিত হতেন। আর তোমরা অভাব-অনটনের ভয়ে সম্পদ পুঞ্জীভূত করছ। এটাই হলো আল্লাহর উপর অনাস্থা ও তাওয়াক্কুল পরিপন্থী গর্হিত দুর্বল ইয়াকীন বা বিশ্বাসের পরিচায়ক। এর জন্য নিঃসন্দেহে তুমি গুনাহগার হবে। কতই না ভালো হতো যদি, তোমরা দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসে মত্ত না হতে। সে আরো বলে যে, আমরা অবগত হয়েছি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

দুনিয়ার বঞ্চিত সম্পদ ও না পাওয়া ভোগ-বিলাসের প্রতি যে শুধু আফসোস করবে তাকেও এক বছর পর্যন্ত জাহান্নামের আগুনে দগ্ধ করা হবে। আর তুমি প্রচেষ্টা ও কষ্টে যে সম্পদ পেয়েছ তার ওপর আল্লাহর গযবের ভয় করছ না? তোমার প্রতি হাজার আফসোস, সাহাবীদের যুগে যেমন হালাল ও পূত-পবিত্র সম্পদ ছিল, তেমন পূত-পবিত্র সম্পদ কি এখন সম্ভব যে, তুমি তা সংরক্ষণ করবে?

আফসোস ও ধিক্কার তোমাদের দুনিয়ার সম্পদ ও মোহের প্রতি। আমি তোমাদেরকে বিশেষভাবে নসীহত করছি যে, তোমরা শুধু তোমাদের একটি মাত্র গাধা বা ঘোড়াকে তোমাদের জন্য যথেষ্ট মনে করো। দান-খয়রাত বা পুণ্য কাজের উদ্দেশ্যেও সম্পদ আহরণে নিমগ্ন হয়ো না।'

সৎকাজে অর্থ ব্যয় করার স্বার্থে সম্পদ আহরণকারী জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে কোনো বিজ্ঞকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বলেন :

> 'সৎকাজে দান-খয়রাত করার স্বার্থে ধন-সম্পদ আহরণ না করাই শ্রেয়। সে আরও বলে, আমরা জানতে পেরেছি যে, কোনো বুযুর্গ তাবেঈর নিকট এমন দুই ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, যাদের একজন হালাল পন্থায় ধন উপার্জন করেছিল ও দীনের পথে খরচ করেছিল এবং অপরজন না হালাল পন্থায় উপার্জন করেছে আর না দীনের পথে খরচ করেছে। তাদের দু'জনের কে উত্তম? তিনি উত্তরে বললেন, যিনি বিরত ছিলেন তিনিই উত্তম। তাদের পরস্পরের ব্যবধান মাশরিক ও মাগরিবের পার্থক্যের সমতুল্য।'

এসব হলো– হারেস আল মোহাসেবীর উদ্ধৃতি। যা আবূ হামেদ আল গাযযালী সানন্দে গ্রহণ করে এবং নির্বিচারে ও খুবই গুরুত্বের সাথে প্রচার করেন এবং সা'লাবা নামক জনৈক ব্যক্তি অর্থ-সম্পদ পাওয়ার পর যে যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল তার উদাহরণ দিয়ে তাকে আরও শক্তিশালী করতে গিয়ে বলেন :

'যারাই নবী ও ওলীদের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ও তাদের নসীহত সম্পর্কে সজাগ, তারা অবশ্যই এ কথা বলতে বাধ্য হবে যে, অর্থ-সম্পদ আহরণের চেয়ে তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়। যদিও তা কল্যাণকর ও সৎকর্মে ব্যয় করা হোক। কেননা, স্বল্প পরিমাণ সম্পদও তার মালিককে আল্লাহর 'যিকির' থেকে বঞ্চিত রাখে। এ জন্যই প্রত্যেক মুরীদের উচিত, সম্পদ থেকে দূরে অবস্থান করা। এমনকি প্রয়োজনের অধিক একটি দিরহামও অবশিষ্ট না রাখা। তবেই সে আল্লাহর নিকট প্রিয় হতে পারবে।'

প্রকৃতপক্ষে হারেস আল মোহাসেবী ও আবূ হামেদ আল গাযযালীর এসব যুক্তি বিবেক ও শরীআতপরিপন্থী এবং সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে অজ্ঞতা ও ভ্রান্ত ধারণার ফসল।

## সম্পদের গুরুত্ব

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সম্পদের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। সম্পদ সংরক্ষণ করারও বিশেষ নির্দেশ দিয়েছেন। যেহেতু সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত ব্যক্তিকে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে বলেছেন, তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম।

আর এ গুরুত্ব ও দায়িত্ববোধ সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِىْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا .

'নির্বোধ ও অবুঝ ইয়াতীম সন্তানদের বোঝ না হওয়া পর্যন্ত তোমাদেরকে যে সম্পদ দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, তা তাদের হাতে সোপর্দ করো না।' (সূরা নিসা : ৫)

আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে নির্বোধ ও অবুঝ ইয়াতীমদের হাতে মীরাসের সম্পদ তুলে দিতে নিষেধ করে বলেছেন :

فَإِنْ اٰنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْٓا اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ .

'এবং যখন তাদের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধির পরিপক্বতা অনুভব করো ও তারা সম্পদের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, তখন তাদের সম্পদ তাদের হাতে সোপর্দ করো।' (সূরা নিসা : ৬)

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত যে, তিনি ধন-সম্পদের অপচয় করতে নিষেধ করেছেন।

তিনি সা'দ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নির্দেশ দিয়েছেন :

لان تترك ورثتك أغنياء خيرلك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ۔

'হে সা'দ! আমি চাই যে, তুমি তোমার সমস্ত সম্পদ না বিলিয়ে দিয়ে তোমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সম্পদশালী হিসেবে রেখে যাও। তোমার জন্য এটাই উত্তম। যেন তোমার অনুপস্থিতিতে তাদেরকে অন্যের নিকট হাত পাততে না হয়।'

অন্যত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

ما نفعنى مال كمال أبى بكر ۔

'আবূ বকর সিদ্দীক-এর সম্পদ আমাকে যে সাহায্য করেছে, অন্য কারো সম্পদ আমাকে এতটা সাহায্য করতে পারেনি।'

'শুধুমাত্র হিজরতের পথখরচ ও সম্ভাব্য আপদ-বিপদের হাত থেকে রক্ষার জন্যই আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সাড়ে ছয় হাজার দিরহাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাতে তুলে দেন।'

আমর ইবনুল আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে একটি হাদীসের উদ্ধৃতি হয়েছে :

عن عمرو ابن العاص قال : بعث الىّ رسول اللّٰه ﷺ فقال : خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم ائتنى، فأتيته فقال : إنى اريد أن اَبعثك على جيشٍ فيسلمك اللّٰه ويغنمك وأرغب لك من مال رغبة صالحة فقلت يارسول الله ما أسلمت من أجل المال ولكننى أسلمت رغبة فى الاسلام ۔ فقال يا عمرو نعم المال الصالح للرجل الصالح ۔

আমর ইবনুল আস (রা) বর্ণনা করেছেন যে,

'একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি তাঁর খিদমতে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে কাপড়-চোপড়সহ সশস্ত্র

হয়ে আসতে বলেন। তাঁর নির্দেশমতো যথাসময়ে উপস্থিত হলে তিনি আমাকে বললেন, আমি তোমাকে এই সেনাবাহিনীর প্রধান করে জিহাদে প্রেরণ করতে চাই। আমি আল্লাহর নিকট দু'আ করছি, আল্লাহ যেন তোমাকে সহীহ সালামতে রেখে এই অভিযানে গনীমতের সম্পদে ভূষিত করেন। আমি কল্যাণকর পন্থায় তা ব্যয় কামনা করি। প্রত্যুত্তরে আমি আরয করলাম :

হে রাসূলুল্লাহ! সম্পদের মোহে আমি ইসলাম গ্রহণ করিনি; বরং সত্যিকারার্থে ইসলামের মহব্বতেই তা গ্রহণ করেছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার উত্তরের প্রত্যুত্তরে বলেন :

'সৎ কর্মশীল ব্যক্তির জন্যই তো হালাল সম্পদ শোভনীয়।'

আনাস ইবনে মালেক (রা) সম্পর্কে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে,

أن رسول اللّٰه ﷺ دعاله بكل خير وكان فى أخر دعائه أن قال اللّٰهم اكثر ماله وولده وبارك له ـ

'একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনাস ইবনে মালেক-এর জন্য সমস্ত কল্যাণের দু'আ করেন। তাঁর দু'আর শেষাংশে তিনি বলেন : হে আল্লাহ্! তুমি তার ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্তুতি বাড়িয়ে দাও এবং তাতে বরকত দান করো।'

আবদুর রহমান ইবনে কা'ব বিন মালেক (রা) থেকে অন্য আর একটি হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে,

'কা'ব (রা)-এর ছেলে আবদুল্লাহ তাঁর পিতা কা'ব ইবনে মালেক-এর তাওবার ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন যে, আমি কা'ব ইবনে মালিককে তাঁর তাওবা করার ঘটনা বর্ণনা করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন যে, আমি ইসলাম গ্রহণকালে তাওবা ঘোষণায় বলেছিলাম :

ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার তাওবার অংশ হিসেবে আমার সমস্ত ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে বিলিয়ে দিতে চাই। একথা শুনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

امسك بعض مالك فهو خيرلك ـ

'তোমার সম্পদের একটা অংশ তোমার জন্য রেখে দাও। এটি তোমার জন্যই কল্যাণকর হবে।'

উপরোক্ত হাদীসসমূহ সহীহ হাদীসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে। তাসাউফপন্থীরা সম্পদ আহরণ ও তার সুষ্ঠু ব্যবহার সম্পর্কে তাদের মোহ ত্যাগের চর্চাকালে যার উদ্ধৃতি দিত তা বর্ণিত হাদীসসমূহের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তারা নিজেদের মনগড়া এই ধারণা পোষণ করতে থাকে যে, সম্পদের আধিক্য বেহেশতে প্রবেশের মহা অন্তরায় এবং শাস্তিমূলক অপরাধ। শুধু তাই নয়; বরং তা তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী কাজ।

ধন-সম্পদের আহরণ ও তার প্রাচুর্যের একটা ক্ষতিকর দিক অবশ্যই আছে, যা কেউই অস্বীকার করছে না। অনেকেই এর ক্ষতিকর দিক থেকে বেঁচেও থাকতে চান।

নিঃসন্দেহে সম্পদ উপার্জন করাটা কষ্টকর। তা অর্জনের আধিক্যের ধ্যানে নিমগ্ন থাকা যে পরকালের স্মরণ থেকে ব্যক্তিকে ভুলিয়ে রাখে, তাও সত্য। তাই এর ক্ষতিকর ও ভীতিকর দিকও অস্বীকার করার নয় বলেই অল্পে তুষ্টির প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কেউ যদি অল্পে তুষ্টির পথ অনুসরণ করে, নিঃসন্দেহে সেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু কেউ যদি হালাল পন্থায় আধিক্যের পথ বেছে নেয়, তখন আমরা তার উদ্দেশ্যকে দেখব, যদি উদ্দেশ্য প্রতিযোগিতামূলক, গর্ব ও অহংকারমূলক হয়, সে ক্ষেত্রে তার অর্জন নিঃসন্দেহে ঘৃণিত। আর যদি পরিবার-পরিজনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবন যাপন, আপৎকালীন সময়ের সহায়ক, গরীব আত্মীয়-স্বজনের ও নিঃস্ব, ইয়াতীম, মিসকীনদের সহযোগিতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং অভাব-অনটন মোকাবেলা ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক ও ইসলামী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়া উদ্দেশ্য হয়, তবে নিঃসন্দেহে সেটা বৈধ ও উপার্জন না করার চেয়ে উত্তম। সাহাবীদের (রা) মধ্যে অনেকেই এ উদ্দেশ্যে হালাল পন্থায় অর্থ সঞ্চয় করেছেন। আহরণের চেষ্টা চালিয়েছেন এবং আল্লাহর নিকট তার আধিক্যের জন্য দু'আও করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে :

عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال : أقطع لزبير حضر فرسه بارض يقال لها ثرثر فاجرى فرسه حتى قام، ثم رمى سوطه فقال : أعطوه حيث بلغ السوط .

'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ঘোষণায় বলেন যে, আমি যুবায়েরকে 'সারসার' নামক স্থানে ঘোড়দৌড় পরিমাণ জমি বরাদ্দ দিতে চাই। যুবায়ের তাঁর ঘোড়া দৌড়িয়ে সীমানা নির্ধারণের এক পর্যায়ে ঘোড়া দাঁড়িয়ে গেলে তাঁর 'চাবুক'টি সম্মুখ দিকে নিক্ষেপ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অতঃপর বললেন : যে পরিমাণ আওয়ায পৌঁছেছে সে পরিমাণ জমি তার জন্য বরাদ্দ দিয়ে দাও।'

সা'দ ইবনে উবাদা (রা) اللهم وسع علىّ। 'হে আল্লাহ আমাকে ধন-দৌলতের প্রাচুর্য দান করো' বলে দু'আ করতেন।

উপরোল্লিখিত প্রমাণাদির চেয়েও বলিষ্ঠ প্রমাণ ইয়াকুব আলাইহিস্ সালাম-এর ঘটনা থেকে আমরা পাচ্ছি। যখন তাঁর সন্তানেরা তাঁর সামনে প্রস্তাব দেয় যে,"نزداد كيل بعير" 'আমরা আরও এক উট বোঝাই রেশন পাব।' তিনি তাদের প্রস্তাবে রাজি হয়ে বিনইয়ামীনকে তাদের সাথে রেশনের জন্য পাঠান। তার পরেও সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু কী করে একথা বলতে পারেন যে, আমরা আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে শঙ্কিত?

হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জিত করার ওপর সাহাবীর যুগে কি ইজমায়ে উম্মাহ হয়নি? কোনো বিষয়ে 'ইজমা' বা সর্বসম্মত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরও কি তা শরীআতের চারটি ভিত্তির একটির মর্যাদা লাভ করেনি? তার পরও কেন সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সম্পদে শঙ্কিত হবেন?

শরীআত কি কোনো বিষয়ে অনুমতি প্রদান করার পরও সে বিষয়ের ওপর আমলকারীকে শাস্তি প্রদানের ধমক দেয়?

নিঃসন্দেহে এসব ধারণা শরীআত সম্পর্কে অজ্ঞতা ও মূর্খতার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে তারা সাহাবীদের কর্মপন্থা অনুসরণে ব্যর্থ।

প্রিয় পাঠক!

একথা গুরুত্বের সাথে প্রণিধানযোগ্য যে, দারিদ্র্য একটা ব্যাধি বা রোগ। এ রোগে যদি কাউকে আল্লাহ পরীক্ষা করতে চান, তাহলে তাকে সবর করতে হবে ও ধৈর্য ধারণ করতে হবে। 'দারিদ্র্য রোগে' আক্রান্ত ব্যক্তিকে আল্লাহ তার সবর অনুযায়ী পুরস্কৃত করবেন।

يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمس مائة لمكان صبرهم على البلاء.

'এ জন্যেই ফকীর বা দরিদ্র ব্যক্তিরা বিপদ-মুসীবতে শুধুমাত্র তাদের ধৈর্য ও সবরের কারণে ধনী ও বিত্তশালী ব্যক্তিদের তুলনায় ৫০০ (পাঁচ শত) বছর পূর্বে বেহেশতে প্রবেশ করবেন।'

অন্যদিকে অর্থ ও বিত্ত আল্লাহর নিয়ামত। এর দাবি হলো আল্লাহর কৃতজ্ঞতা ও শোকর করা। একজন মুফতী যেমন তার জ্ঞান বিতরণের দ্বারা অজ্ঞদের সমস্যা সমাধানে বাধ্য, একজন মুজাহিদ যেমন মরলে শহীদ ও বাঁচলে গাযীর চেতনায় জীবন বাজি রেখে জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহয় নিবেদিত, তেমনি একজন বিত্তশালীও তার কষ্টার্জিত সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে দায়মুক্ত হতে বাধ্য।

অপরদিকে দরিদ্র ও নিঃস্বরা হলো আল্লাহর পথে দান-খয়রাত ও সমাজ সেবামূলক জনহিতকর কার্যকলাপ থেকে দায়মুক্ত নির্ঝঞ্ঝাট ব্যক্তি।

حديث الذى مات من اهل الصفة وخلف دينارين فقال رسول الله ﷺ : كَيْتَانِ.

এ হাদীসকে যারা সম্পদ না রেখে যাওয়ার প্রমাণ হিসেবে পেশ করতে চান, তারা মূলত কোন্ প্রেক্ষাপটে এই হাদীস বর্ণনা করা হয়েছে সে সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অথচ সাধারণত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুম- এর অভ্যাস এমন ছিল যে, ক্ষুধার তাড়নায় হাত থেকে তরবারি পড়ে যেত, তবু খাবার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হতেন না।

অপরদিকে আলোচ্য ব্যক্তি আসহাবে সুফফার মিসকীনদের অন্তর্ভুক্ত থেকে দান-খয়রাত এলে পাওয়ার জন্য অন্যান্য মিসকীনকে ঠেলে জোরপূর্বক তা সংগ্রহ

করতে অভ্যস্ত ছিল। মিসকীনত্বকেই পেশা হিসেবে নিয়ে এ স্বর্ণমুদ্রা সঞ্চয় করে। সে নিজে খাবার না খেয়ে তা সঞ্চয় করত এবং যাকাত সংগ্রহের লক্ষ্যে সদা তৎপর থাকত। তার মৃত্যুর পর দেখা গেল যে, সে সাদকার অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে এই স্বর্ণমুদ্রা দুটি জমা করেছে। তার এ ঘৃণিত মনোভাব দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

'কিয়ামতের দিনে এই স্বর্ণমুদ্রা দুটি গরম করে তাকে তাপ দেওয়া হবে।'

বৈধ উপায়ে যদি সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ হতো, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতেন না যে,

انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أى تذرهم عالة يتكفون الناس -

'তোমার উচিত তোমার সন্তান-সন্ততিদেরকে সম্পদশালী হিসেবে রেখে যাওয়া। কেননা, নিঃস্ব হিসেবে মানুষের দ্বারে দ্বারে হাত পেতে জীবন যাপনের চেয়ে তা উত্তম।'

তারা কী করে এমন কথা বলতে পারে যে, কোনো সাহাবী রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্পদ রেখে যেতেন না। অথচ আমরা নবী-জীবনের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখতে পাই যে, ইবরাহীম ও শুআইব আলাইহিমাস সালাম কৃষি খামার ও বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিলেন। শুআইব আলাইহিস সালাম আধিক্যের প্রত্যাশা করেছিলেন। তাঁর ও তাঁর জামাতা মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে সংঘটিত পাওনানুসারে যা পাওয়ার তা ছাড়াও খুশি মনে অতিরিক্ত দিলে আপত্তি না থাকার কথা উল্লেখ করেছেন।

فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ -

'তুমি যদি তোমার নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণের পর দশ বছর পর্যন্ত থাক, তবে সেটা তোমার অনুগ্রহ।' (সূরা কাসাস : ২৭)

এমনিভাবে আইয়ুব আলাইহিস সালামের রোগমুক্তির পর তাঁকে স্বর্ণখণ্ড গ্রহণের প্রস্তাব দিলে তিনি তাঁর চাদরের আঁচল ভরে তা বেশি বেশি করে উঠাতে থাকেন। অতঃপর তিনি পরিতৃপ্ত হয়েছেন কি না জানতে চাওয়া হলে, উত্তরে বললেন :

ارب من يشبع من فضلك ـ

'হে রব! কে তোমার সম্পদের ব্যাপারে পরিতৃপ্ত হতে পারে?'

আধিক্যের আশা-আকাঙ্ক্ষা মানুষের ঐকান্তিক ইচ্ছা ও বাসনা। এটি যদি জনহিতকর ও কল্যাণকর উদ্দেশ্যে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তা মঙ্গলকর ও যুক্তিযুক্ত।

এতক্ষণে যেসব প্রমাণাদি পেশ করা হলো, তার আলোকে যাচাই-বাছাই করলে হারেস আল মোহাসেবীর ঐসব যুক্তি ও দাবি কুরআন, নবী-রাসূল প্রদত্ত অর্থনীতির পরিপন্থী। মুসলমানদেরকে সম্পদহীন করার অপকৌশল মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পদ আহরণ করতে নিষেধ করেননি; বরং যা নিষেধ করেছেন, তা হলো অবৈধ পন্থায়, অসৎ উদ্দেশ্যে সম্পদ আহরণ করাকে।

এ বিষয়টি শুধুমাত্র আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ব্যাপারে সংঘটিত হওয়াতে এটাই প্রমাণ করে যে, তারা অন্য সাহাবীদের জীবনী সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ।

তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু মীরাস হিসেবে ৩০০ (তিন শত) পিপা স্বর্ণ-রৌপ্য রেখে গিয়েছিলেন। তিনি কখনো বৈঠকখানায় রাখা পিপার মুখ ঢেকে রাখতেন না। পূর্ব অনুমতির ভিত্তিতেই প্রয়োজন মতো অভাবীগণ পিপা থেকে মুদ্রা নিয়ে যেতেন।

যুবায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিত্যক্ত সম্পদের পরিমাণ ছিল ৫,০২,০০,০০০ (পাঁচ কোটি দুই লাখ)। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিত্যক্ত মুদ্রার পরিমাণ ছিল ৯০,০০০ (নব্বই হাজার)। অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম অত্যধিক সম্পদ অর্জন করেছেন এবং সন্তানাদির জন্য রেখে গেছেন। এ ব্যাপারে কেউই কোনো আপত্তি করেননি।

আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহুর হামাগুড়ি দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা সম্পর্কে বর্ণনা প্রমাণ করে যে, বর্ণনাকারী হারেস আল মোহাসেবী 'হাদীস' সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ। অথবা সে এমন এক ঘুমন্ত ব্যক্তি, যাকে সজাগ করা যায় না। এ ধরনের বর্ণনার ওপর বিশ্বাস করা থেকে আমরা আল্লাহর আশ্রয়

চাচ্ছি। নিঃসন্দেহে এটি একটি মিথ্যা ধারণা। আবদুর রহমান ইবনে আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু জীবদ্দশায় জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদপ্রাপ্ত ১০ জন সাহাবীর একজন। তিনি একজন বদরী সাহাবী, যাদেরকে 'মাগফিরাত' প্রাপ্ত বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, তিনি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শূরা বা পরামর্শসভার সম্মানিত সদস্য। খায়বারের অভিযানে এক ওয়াক্ত নামাযে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইমাম। তিনি যদি জান্নাতে হামাগুড়ি দিয়ে প্রবেশ করেন, তাহলে জান্নাতে হেঁটে হেঁটে প্রবেশ করবেন কে? একদিকে তাঁর এ সুমহান মর্যাদা ও জান্নাতের সুসংবাদ, অপরদিকে তাঁর সম্পর্কে 'আম্মারা ইবনে যাযান' নামক অভিশপ্ত মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী ব্যক্তির বর্ণনা।

ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, এটি একটি বিভ্রান্ত বর্ণনা। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেছেন, সে আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর বরাত দিয়ে অনেক বিভ্রান্তিকর ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করেছে। আবূ হাতেম আর রাযী বলেছেন, এই বর্ণনা বা হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। ইমাম দারা কুতনী বলেছেন, দুর্বল বর্ণনা।

সাঈদ ইবনে মুসায়্যিব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন :

> 'যে সম্পদ আহরণে অনীহা প্রকাশ করে ও দীনের কাজে খরচ করতে অনাগ্রহী, সে নিজের ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতিও নির্দয়। সে পরোপকারে ভ্রূক্ষেপহীন, তার মৃত্যুর পর সন্তান-সন্ততির জন্য মীরাস রেখে যেতে অমনোযোগী হেতু তার মধ্যে কোনোই কল্যাণ বা মঙ্গল নেই। তিনি স্বয়ং নিজে মৃত্যুকালে ৪০০ (চারশত) স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান।'

সুফিয়ান আস সাওরী (র) ২০০ স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। তিনি বলতেন, 'অর্থ এ যুগের গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার'।

কা'ব ও আবূ যর গিফারীর হাদীসের যে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে, তার সত্যতাও একেবারেই অসম্ভব। যা অজ্ঞ ও মূর্খ লোকদের মনগড়া বর্ণনা করা বিষয়বস্তু, যা দ্বারা সাধারণ লোকরা বিভ্রান্ত হয়েছে। কেউ কেউ না জেনে না বুঝেই উক্ত উদ্ধৃতিটি বর্ণনা করে থাকেন। যা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মূল বর্ণনাটিই ভিত্তিহীন। তাদের অপর একটি উদ্ধৃতি হলো, মালেক ইবনে আবদুল্লাহ আল যিয়াদীর বর্ণনা। সে বর্ণনায় বলে, আবূ যর গিফারী (রা) লাঠি হাতে

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলে তিনি তাকে প্রবেশের অনুমতি দেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু কা'বকে বলেন, হে কা'ব! আবদুর রহমান ইবনে আওফ তো ইনতিকালই করেছেন, তুমি তার পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে কী মত পোষণ কর?

কা'ব উত্তরে বললেন, 'যদি আল্লাহর হক আদায় করে থাকেন, তবে তাতে ক্ষতির কী আছে?"

এ কথা শোনামাত্রই আবূ যর তার লাঠি দ্বারা কা'বকে আঘাত করেন এবং বলেন,

'আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট শুনেছি এই পাহাড়কেও যদি আমার জন্য স্বর্ণে পরিণত করে দেওয়া হতো, তবু তা আমি আল্লাহর পথে এমনভাবে বিলিয়ে দিতাম, যেন আমার নিকট ছয় রতি পরিমাণ স্বর্ণও অবশিষ্ট না থাকে।

হে উসমান! আপনি কি এটি শোনেননি বলে তিন তিন বার তার পুনরাবৃত্তি করেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহু উত্তরে বললেন, হ্যাঁ শুনেছি।'

প্রিয় পাঠক!

উপরোল্লিখিত হাদীসটিও জাল ও মনগড়া। তার সনদে ইবনে লুহাইয়া নামক রাবী জাল ও মিথ্যা হাদীস বর্ণনাকারী হিসেবে চিহ্নিত।

হাদীসবিশারদ ইমাম আল্লামা ইয়াহইয়া বলেন, তার বর্ণনাকৃত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

ইতিহাসের অকাট্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত যে, আবূ যর গিফারী (রা) ইনতিকাল করেন ২৫ হিজরীতে আর আবদুর রহমান ইবনে আওফ ইনতিকাল করেন ৩২ হিজরীতে। আবূ যর গিফারী (রা)-এর ইনতিকালের পরও আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) সাত বছর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

হাদীসটির ভাষা বিভ্রান্তিকর ও ভুল-ত্রুটিতে পরিপূর্ণ। যাতে প্রমাণ হয় যে, এই হাদীসটি জাল।

তাদের দাবি হলো যে,

> 'এমনকি মৃত্যুকালে এক-চতুর্থাংশ সম্পদের ওসিয়ত করে যাওয়ারও অনুমতি নেই।'

অথচ উমর ইবনে খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন :

حث رسول الله ﷺ على الصدقة فجئت بنصف مالى فقال رسول الله ﷺ : وما أبقيت لأهلك؟ فقلت مثله. فلم ينكر عليه رسول الله .

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আল্লাহর পথে দান করতে উদ্বুদ্ধ করলে আমি আমার অর্ধেক সম্পদ এনে উপস্থিত হই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার সন্তানদের জন্য কী পরিমাণ রেখে এসেছ?' উত্তরে আরয করলাম এই পরিমাণ, যে পরিমাণ এনেছি। আমার রেখে আসা সম্পদের পরিমাণ জেনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেননি।

ইবনে জারীর আত তাবারী (র) বলেন, এই হাদীস প্রমাণ করে যে, তাসাউফপন্থীরা বিত্তহীন থাকা সওয়াবের কাজ বলে যে দাবি করে আসলে তা সঠিক নয়। ইবনে জারীর (রা) আরো বলেন যে,

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন :

كذلك قوله عليه وسلم : اتخذوا ألغنم فانها بركة .

'তোমরা বকরি প্রতিপালন করো। কেননা, তা সম্পদ বৃদ্ধির পথ।'

আল্লামা ইবনে জারীর আরো বলেন, আগামীকালের জন্য যদি সঞ্চয় করাটা আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল পরিপন্থী হতো, তাহলে তোমরা এটা দেখছ না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রী-পরিজনের জন্য পুরো এক বছরের খোরাক সঞ্চয় করে রেখে দিতেন।

---

বি: দ্র: বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন ইমাম আল জাওযীর গ্রন্থ تلبيس ابليس ১৭০ পৃ: থেকে ১৭৬ পৃ: পর্যন্ত। –অনুবাদক

'وهاهن صباياالمدينة الصغيرات يخرجن فى أيديهن

الدفوف ....... أقبل بدرعلينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا ما دعا لله داع

অন্য বর্ণনায় রয়েছে :

لما قدم المدينة جعل النساء والصبيان والولدان يقلن :

طلع البدرعلينا　من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا مادعا لله داع

যুগশ্রেষ্ঠ মুহাক্কিক আল্লামা মুহাম্মদ নাসির উদ্দীন আলবানী (র) তাঁর :لسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة واثارها السيى فى الأمة নামক গ্রন্থে এই বর্ণনাকে সহীহ্ নয় বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এটি একটি দুর্বল বর্ণনা মাত্র।

তিনি এই হাদীসটির পরীক্ষা-নিরীক্ষায় বলেন, আবুল হাসান আল খালযী 'আল ফাওয়ায়েদ' الفوائد নামক গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ৫৯ পৃষ্ঠায় এবং ইমাম আল বায়হাকী দালায়েল আন নুবুয়্যাহ' دلائل النبوة গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৩৩ পৃষ্ঠায় আল ফযল ইবনে আল হাব্বাব-এর বরাত দিয়ে হাদীসটি উল্লেখ করেছেন এই বলে যে, আমি এ হাদীসটি আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আবূ আয়েশা থেকে শুনেছি। তিনি বলেছেন, এ হাদীসটির বর্ণনাকারীরা সবাই নির্ভরযোগ্য ثقة; কিন্তু সনদ দুর্বল। হাদীস শাস্ত্রের পরিভাষায় এটি معضل (মু'দাল) বা মাঝপথে তিন বা ততধিক বর্ণনাকারী পরম্পরায় বাদ পড়া হাদীস।

আবূ আয়েশা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদদের একজন। মধ্যপথে তিন বা ততধিক বর্ণনাকারী উল্লেখ না করে পরবর্তীরা এই হাদীস উল্লেখ করায় সত্যিই তিনি এই হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। ইমাম আল ইরাকী তাঁর تخريج الاحياء নামক গ্রন্থের বর্ণনায় এনেছেন। (২য় খণ্ড, ২৪৪ পৃ.)

তারীখে ইবনে কাসীরে ইমাম বাইহাকীর বরাত দিয়ে বলা হয়েছে :

هذا يذكره علماءنا عند مقدمة المدينة من مكمة لانه لما قدم المدينة من ثنيات الوداع من مقدمة من تبوك "

আমাদের আলেমগণ হিজরতের ঘটনায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের বর্ণনায় সানিয়াতুল বিদা হয়ে মদীনায় আগমনের কথা বলে থাকেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি তাবুক যুদ্ধের পর সিরিয়ার পথে সানিয়াতুল বিদা হয়ে মদীনায় ফিরে আসেন। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের কালে নয়।

ইমাম আল জাওযীর প্রসিদ্ধ 'তালবিসু ইবলীস' تلبيس ابليس গ্রন্থে এই বর্ণনাটি উদ্ধৃত হওয়ায় এই ভুল ধারণাটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। আল্লামা ইবনুল কাইয়েম তাঁর (আয্‌যাদ الزاد) নামক গ্রন্থের ৩য় খণ্ডের ১৩ পৃষ্ঠায় ইমাম আল জাওযী ও অন্যদের ভুল ধারণাকে খণ্ডন করে বলেন :

هو وهم ظاهر لأن ثنيات الوداع إنما هي ناحية الشام لايراداها القادم من مكة إلى المدينة ولايمر إلا اذا توجه الشام."

'এই ঘটনায় যারা এই মত পোষণ করেন তাদের উদ্দেশ্য সবার নিকটই স্পষ্ট। কেননা, 'সানিয়াতুল বিদা' হলো সিরিয়া থেকে মদীনায় আসার পথের একটি স্থান। সাধারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের সাথে জড়িত কোনো লোকই মক্কা থেকে মদীনায় আগমনের জন্যে 'সানিয়াতুল বিদা' হয়ে ঘুরে মদীনায় আসে না। আর হিজরতের প্রাক্কালে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম কর্তৃক মক্কা থেকে সিরিয়া হয়ে সানিয়াতুল বিদার পথে মদীনায় প্রবেশের প্রশ্নই উঠে না।

এই তাহকীক বা বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার পরও লোকেরা মনে করে থাকে যে, রাসূল (সা) সানিয়াতুল বিদা হয়ে মদীনায় প্রবেশ করেছেন। আল্লামা আলবানী (র) বলেন :

মজার ব্যাপার হলো, ইমাম গাযযালী (র) তাঁর নিজের পক্ষ থেকে بالدفوف والالحان, ছোট ছোট মেয়েরা দফ বা বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে নেচে-গেয়ে এই আবৃত্তি করার কথা উল্লেখ করেন। মূলত কোথাও এর কোনো ভিত্তি নেই।

হাফিয আল ইরাকী স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করেন :

ليس فيه ذكر للدف والا لحان.

ছোট ছোট মেয়েরা দফ বা বাদ্যযন্ত্র হাতে নিয়ে নেচে-গেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালামকে স্বাগত জানানোর কথা কোথাও উল্লেখ নেই।

মূলত ইমাম গাযযালী (র)-এর এই বর্ণনা থেকে জানা যায়, যারা তবলা-বেহালার মতো বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে গযল বা না'তে রাসূল পরিবেশন করার পক্ষপাতী, তাদের মতকে বৈধতা বা প্রাধান্য দেওয়ারই এটি একটি অপচেষ্টা মাত্র। —অনুবাদক